পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

প্রমাণ ও মুজিজার বিশ্বকোষ

মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ

বৈজ্ঞানিক মুজিজা · ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য · সত্য হয়ে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

তাওরাত ও ইনজিলের সুসংবাদ · জিন, জাদু ও অদৃশ্যের জগৎ

শিশুও বুঝতে পারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা · 157টি রঙিন চিত্র

157টি প্রমাণ, শক্তি অনুসারে সাজানো

শুরু করার আগে — এটি পড়ুন

এটি তর্কের বই নয়। এটি উপস্থাপনার বই: আমরা প্রমাণটি আপনার সামনে রাখি, যতটা সহজ করে সম্ভব বুঝিয়ে দিই, তারপর বিচারের ভার আপনার নিজের বুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিই।

প্রতিটি পৃষ্ঠা কীভাবে পড়বেন

- **সোনালি চৌকাঠের ভেতরের পাঠ** — কুরআনের একটি আয়াত, নবি ﷺ-এর একটি হাদিস, কিংবা কোনো প্রাচীন গ্রন্থের একটি পাঠ।
- **রঙিন চিত্র** — এমন একটি ছবি যা কথাটিকে কোনো শব্দ ছাড়াই বুঝিয়ে দেয়।
- **সহজ কথায়** — পুরো কথাটি দুই লাইনে, যেন আমরা দশ বছরের কোনো শিশুকে বোঝাচ্ছি।
- **তখন মানুষ কী মনে করত?** — এই পাঠ যেদিন নাজিল হলো, সেদিন গোটা দুনিয়ার অবস্থা।
- **আজ বিজ্ঞান কী বলে?** — তার শত শত বছর পরে গিয়ে যা আবিষ্কৃত হয়েছে।
- **এটি কেন নির্ণায়ক মুজিজা?** — সেই সিদ্ধান্ত, যা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই।

আপনি লক্ষ করবেন, আমরা "অমুক তাফসিরকার এমন বলেছেন" বলে কথা লম্বা করি না। কারণটি সহজ: প্রথম যুগের মুফাসসিরগণ — আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া করুন — পাঠটিকে নিজেদের যুগের উপকরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, আর তাঁদের কাছে না ছিল দূরবিন, না ছিল অণুবীক্ষণ। তাঁদের এক হাজার বছর পরে গিয়ে যে সূক্ষ্ম অর্থ আবিষ্কৃত হবে, সেখানে তাঁরা পৌঁছাননি — এটি পুরোপুরি স্বাভাবিক। এতে তাঁদের মর্যাদা এতটুকু কমে না — বরং **এটিই তো স্বয়ং প্রমাণ**: এই পাঠ যদি কোনো মানুষের কাছ থেকে আসত, তবে তাতে এমন অর্থ থাকত না যা তার নিজের যুগের সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষের নাগালের বাইরে।

"আমরা তাদের দেখাব আমাদের নিদর্শনাবলি দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের ভেতরেও, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য।"

“মুজিজা” শব্দের অর্থ আসলে কী?

মুজিজা কেবল অদ্ভুত কোনো ব্যাপার নয়। মুজিজা হলো এমন এক বিষয় যার মতো কিছু আনতে মানুষ অক্ষম, যা আসে কোনো নবির হাতে, এই নিদর্শন হিসেবে যে, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তিনিই এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা।

শিশুকে উদাহরণটি এভাবে দিন

কল্পনা করুন, প্রথম শ্রেণির একটি শিশু বোর্ডে এমন একটি সমীকরণ লিখল যা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাই বোঝেন — আর হাজার বছর পরে জানা গেল, সেটি পুরোপুরি সঠিক। আপনি বলবেন না “কী বুদ্ধিমান শিশু!” বরং আপনি বলবেন: **“এটি তাকে কে লিখিয়ে দিল?”** কুরআনের ব্যাপারটি ঠিক এটিই।

তিনটি শর্ত, যা আমরা প্রতিটি পৃষ্ঠায় মেনে চলি

- **পাঠটি আবিষ্কারের আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত।** কুরআন চৌদ্দ শতাব্দী ধরে লিখিত, সংরক্ষিত এবং মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়ে আসছে, আর আমাদের কাছে কার্বন-পরীক্ষায় তারিখ-নির্ধারিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে যা তা প্রমাণ করে। সুতরাং কেউ বলতে পারে না: “এটি আবিষ্কারের পরে লেখা হয়েছে”।
- **অর্থ শব্দের ভেতরেই স্পষ্ট।** আমরা কোনো শব্দের গলা মোচড়াই না; অভিধানে যে আরবি অর্থ পরিচিত, আমরা তা-ই গ্রহণ করি।
- **তখনকার মানুষ এর ঠিক উল্টোটাই বিশ্বাস করত।** আর এটিই এই অধ্যায়ের সবচেয়ে প্রবল দিক: পাঠটি তার যুগের সংস্কৃতির সঙ্গে মেলেনি, বরং তা **তার বিরোধিতা করেছে**, তারপর প্রমাণিত হয়েছে যে সঠিকটি এটিই।

“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে হতো, তবে তারা এতে বহু অসংগতি পেত।”

সূচিপত্র

1	মহান প্রমাণসমূহ	81 প্রমাণ	পৃ. 5
2	মুহাম্মদ ﷺ-এর যেসব ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে	19 প্রমাণ	পৃ. 87
3	তাওরাত ও ইনজিলের সুসংবাদসমূহ	11 প্রমাণ	পৃ. 107
4	নবি ﷺ-এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুজিজাসমূহ	16 প্রমাণ	পৃ. 119
5	জিন, জাদু ও গায়েবের জগৎ	18 প্রমাণ	পৃ. 136
6	ভাষার মুজিজা ও খোলা চ্যালেঞ্জ	12 প্রমাণ	পৃ. 155

মোট: 6 অংশে 157 প্রমাণ

প্রথম পর্ব

মহান প্রমাণসমূহ

বইয়ের হৃদয়: আকাশে, পৃথিবীতে, মানুষের দেহে আর ইতিহাসের নথিতে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনগুলো এক পর্বে একত্র করা এবং **সবচেয়ে প্রবল প্রমাণ থেকে সবচেয়ে হালকা প্রমাণ পর্যন্ত ক্রমে সাজানো**। সবার আগে যা পড়বেন সেটিই সেই প্রমাণ যা থেকে বেরোনোর কোনো পথ নেই; আর পর্বে যত এগিয়ে যাবেন, প্রমাণের ভার ততই কিছুটা হালকা হতে থাকবে।

৪১ প্রমাণ

ভ্রূণবিদ্যা

পাঁচটি স্তর — আর ঠিক সেই ক্রমেই

> অতঃপর আমি সেই শুক্রবিন্দুকে আলাকা বানালাম, তারপর আলাকাকে মুদগা বানালাম, তারপর মুদগাকে হাড় বানালাম, তারপর হাড়গুলোকে মাংস দিয়ে ঢেকে দিলাম।
>
> **সূরা আল-মুমিনুন — আয়াত 14**

কার্নেগি স্তর ও বাস্তব ভ্রূণের আলোকচিত্র থেকে আঁকা — একই অনুপাত, একই মাপ। স্তরগুলো নাম ধরে ও ক্রম অনুযায়ী, ঠিক যেমন আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ্যবই দেয়

সহজ কথায়

পাঁচটি স্তর, যাদের কুরআন চৌদ্দ শতাব্দী আগে নাম ধরে ডেকেছে: এক ফোঁটা পানি, তারপর **আলাকা** — এমন কিছু যা জরায়ুর দেয়ালে আটকে যায়, তারপর ডালে ঝোলা ফলের মতো তাতে ঝুলে থাকে; তারপর **মুদগা** — ছোট্ট এক টুকরা, যার গায়ে খাঁজ, **যেন দাঁতে চিবানো হয়েছে**; তারপর হাড়, যা গড়ে তোলা হয়; তারপর মাংস, যা হাড়কে ঢেকে দেয়। উপরের ছবিটি **খোদ ভ্রূণের আলোকচিত্র থেকে নেওয়া** — নিজের চোখে দেখুন, তারপর ফিরে গিয়ে আয়াতটি আরেকবার পড়ুন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জরায়ুর ভেতরে কী ঘটে, তার কিছুই জানা ছিল না। প্রচলিত মত — অ্যারিস্টটলের, আর তাঁর পরে সবার — ছিল এই যে ভ্রূণ গঠিত হয় **জমাট বাঁধা মাসিকের রক্ত** থেকে। গ্যালেন ভ্রূণ গঠনকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মাংস **হাড়ের উপরে ও তার চারপাশে গজায়** — কিন্তু তিনি কখনো কোনো মানুষের জরায়ু খোলেননি; এসব তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন পশুর ব্যবচ্ছেদ আর তাত্ত্বিক অনুমানের উপরে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আলাকা — মোটামুটি প্রথম দুই সপ্তাহ: তিনটি প্রমাণিত ঘটনা একসঙ্গে ঘটে: ভ্রূণ-থলিটি **জরায়ুর দেয়ালে আটকে যায় ও তাতে ঢুকে পড়ে**, যতক্ষণ না টিস্যুর ভেতরে পুরোপুরি ডুবে যায়; তারপর তা **নিজের থলির ভেতরে একটি সংযোগকারী বৃন্ত ধরে ঝুলে থাকে** — উপরের ছবিতে আপনি এটিই দেখছেন; আর তার চারপাশে **ফাঁকা জায়গা খুলে যায়, যা মায়ের রক্তে ভরে ওঠে**, ফলে সে রক্তে ঘেরা হয়ে পড়ে।

মুদগা — মোটামুটি চতুর্থ সপ্তাহ: ভ্রূণের পিঠে **সোমাইট** নামের খণ্ডগুলো ফুটে ওঠে, একটির পর একটি যুক্ত হতে থাকে প্রায় চল্লিশ জোড়া পর্যন্ত, আর তাদের মাঝে গভীর খাঁজ, ফলে তার পিঠ দেখায় খাঁজকাটা — আর তখন তার দৈর্ঘ্য তিন মিলিমিটার, বিবর্ধন ছাড়া যা চোখেই পড়ে না।

তারপর হাড়, তারপর মাংস: কঙ্কাল প্রথমে তরুণাস্থির ছাঁচ হিসেবে গড়ে ওঠে, তারপর পেশি তার চারপাশে জড়িয়ে যায় আর তার থেকেই নিজের আকার নেয় — আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো কিছুর উপরে পোশাক, ঠিক যেমনটি তিনি বলেছেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই দুটি শব্দের কাছে একটু থামুন, হালকাভাবে পেরিয়ে যাবেন না। **মাত্র দুটি শব্দ** — "আলাকা" আর "মুদগা" — এমন কিছু বর্ণনা করেছে, যার উপরে চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো মানুষের চোখ পড়েনি; আর তারপর পড়েছে কেবল অণুবীক্ষণ ও ক্যামেরার মাধ্যমে।

প্রথমটি: "আলাকা"। এটি আমার কাছ থেকে নেবেন না — অভিধান থেকেই নিন। জাওহারি, যিনি মারা গেছেন **এক হাজার বছর আগে**, তাঁর আস-সিহাহ গ্রন্থে লিখেছেন: "**আর আলাকা হলো পানির সেই কীট, যা রক্ত চুষে খায়**।" হুবহু একই কথা আছে লিসানুল আরবেও। আর মূল ধাতুটি নিজেই ঘোরে **আটকে যাওয়া ও লেগে থাকার** অর্থে, আর **ঝুলে থাকা ও লটকে থাকার** অর্থে।

এবার চোখ তুলুন পাতার উপরের ছবিটির দিকে। কী দেখছেন? দেখছেন এমন এক সন্তাকে, যে জরায়ুর দেয়ালে **আটকে গেছে** আর তাতে ঢুকে গেছে, যতক্ষণ না তার মাংসে ডুবে যায়; তারপর নিজের থলির ভেতরে একটি বৃন্ত ধরে **ঝুলে আছে**, যেমন ডাল থেকে ঝোলে ফল; আর **তার মায়ের রক্ত তাকে ঘিরে রেখেছে** সব দিক থেকে। একটি নাম তিনটিকেই ছুঁয়ে গেল। **তাহলে কে তাঁকে জানাল?**

দ্বিতীয়টি: "মুদগা"। এটি এসেছে **চিবানো** থেকে। লিসানুল আরবে উদ্ধৃত খালিদ ইবনে জানবার কথা: "**মাংসের মুদগা হলো মানুষ নিজের মুখে যতটুকু দেয় ততটুকু**" — এক গ্রাস, যা চিবানো হয়। তারপর চৌদ্দ শতাব্দী পরে আসে অণুবীক্ষণ, আর চতুর্থ সপ্তাহের ভ্রূণের ছবি তোলে; আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান বলে, এই খণ্ডগুলো তার পিঠ বরাবর **বাইরে থেকে পুঁতির মতো উঁচু দেখায়**, আর তাদের মাঝে গভীর খাঁজ। ছবিটির দিকে তাকান: যেন দুই চোয়ালের মাঝে চেপে ধরা হয়েছে! আর মনে রাখুন, তখন তার দৈর্ঘ্য **তিন মিলিমিটার** — চোখে দেখা যায় না, আর সেদিন যা সৃষ্টিই হয়নি, সেই বিবর্ধন ছাড়া তার আকার জানারও উপায় নেই।

আর তৃতীয়টি: হাড়, তারপর মাংস। কোন মানুষ এক নরম পিণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলবে: হাড় আগে?! বুদ্ধি তো উল্টোটাই বলে। কিন্তু বিজ্ঞান বলে: কঙ্কালই আগে গড়া হয়, তারপর পেশি তার চারপাশে জড়িয়ে যায় আর তার থেকেই আকার নেয়। আর এ তো হুবহু তাঁরই কথা: "**তারপর হাড়গুলোকে মাংস দিয়ে ঢেকে দিলাম**" — আর ঢাকা তো কেবল আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা কিছুর উপরেই হয়!

একটি আয়াতে পরপর চারটি শব্দ। **পরপর চারটি আঘাত।** এর যেকোনো একটি ভুল হলেই তা একাই এই গ্রন্থ ভেঙে ফেলার জন্য যথেষ্ট ছিল — অথচ একটিও ভুল হয়নি। মরুভূমির এক নিরক্ষর মানুষ, যিনি পড়তে জানেন না লিখতেও জানেন না, চোখে দেখা যায় না এমন স্তরগুলোর নাম বলছেন... আর একটি একটি করে প্রতিটিতেই ঠিক লাগছেন। **তাহলে কে তাঁকে শেখাল?**

সূত্র Moore & Persaud — *The Developing Human*; O'Rahilly & Müller — *Developmental Stages in Human Embryos*, 1987

গভীর সমুদ্র

2 অন্ধকার, একটির উপরে আরেকটি

অথবা যেন গভীর সমুদ্রের অন্ধকার, যাকে ঢেকে রেখেছে এক ঢেউ, তার উপরে আরেক ঢেউ, তার উপরে মেঘ — অন্ধকার, একটির উপরে আরেকটি।

সূরা আন-নূর — আয়াত 40

আলো স্তরে স্তরে গ্রাস হয়ে যায়, আর এক হাজার মিটারের নিচে তা পুরোপুরি মিলিয়ে যায়

সহজ কথায়

সমুদ্রের গভীরে অন্ধকারের উপরে অন্ধকার: আগে মেঘ আড়াল করে, তারপর ঢেউ আড়াল করে, তারপর পানি রঙগুলোকে একটি একটি করে গিলে নেয়, শেষে এতটুকু আলোও আর থাকে না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

নিঃশ্বাস আটকে কোনো মানুষ কয়েক মিটারের বেশি গভীরে নামেনি। সমুদ্রের গভীর ছিল সম্পূর্ণ অজানা। সেখানকার অন্ধকার যে **স্তরে স্তরে সাজানো**, তা কেউ জানত না; দৃশ্যমান ঢেউয়ের নিচে যে চোখে না-পড়া আরেকটি ঢেউ আছে, তা-ও কেউ জানত না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পানিতে আলো ধাপে ধাপে শোষিত হয়: লাল মিলিয়ে যায় প্রায় 15 মিটারে, তারপর কমলা, তারপর হলুদ, তারপর সবুজ; কেবল ক্ষীণ নীল টিকে থাকে, প্রায় 200 মিটারে সেটিও নিভে যায়। এক হাজার মিটারের নিচে **নিরেট অন্ধকার, একটি ফোটনও নেই**। বিজ্ঞান **অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ**ও আবিষ্কার করেছে, যা ভিন্ন ঘনত্বের পানির স্তরগুলোর সীমানা বরাবর চলে — ঢেউয়ের নিচের ঢেউ।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি তিনটি পর্দাকে উপর থেকে নিচে সঠিক ক্রমে সাজিয়েছে: মেঘ, তারপর ঢেউ, তারপর **তার নিচে আরেকটি ঢেউ**। সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে দ্বিতীয় একটি ঢেউয়ের অস্তিত্ব এমন সত্য, যা বিশ শতকের আগে জানাই ছিল না। এরপর তা শেষ হয় সর্বব্যাপী বর্ণনায়: "অন্ধকার, একটির উপরে আরেকটি" — অর্থাৎ **স্তরে স্তরে চাপানো অন্ধকার**, একক কোনো অন্ধকার নয়। পানিতে আলোর শোষণের ঠিক এটিই নিখুঁত ভৌত বর্ণনা।

সূত্র Sverdrup, Johnson & Fleming — *The Oceans*, 1942 · NOAA — light in the ocean

আবহাওয়াবিজ্ঞান

3 বৃষ্টি তৈরির তিন ধাপ

আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ মেঘকে সঞ্চালিত করেন, তারপর তাদের পরস্পর জোড়া লাগান, তারপর তাকে স্তূপীকৃত করেন, অতঃপর আপনি দেখতে পান তার ফাঁক থেকে বৃষ্টি বেরিয়ে আসছে?

সূরা আন-নূর — আয়াত 43

সঞ্চালন, তারপর সংযোজন, তারপর খাড়া স্তূপীকরণ — আর তখনই বৃষ্টি নামে

সহজ কথায়

বৃষ্টি হুট করে নেমে আসে না। তার তিনটি ধাপ আছে, ক্রম মেনে: বাতাস ছোট ছোট মেঘখণ্ডকে **হাঁকিয়ে আনে**, তারপর সেগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে **জুড়ে দেয়**, তারপর একটির উপরে আরেকটি পাহাড়ের মতো **স্তূপ করে** — আর তখনই বৃষ্টি হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বৃষ্টি ছিল একটিমাত্র ঘটনা: মেঘ, তারপর পানি। মেঘের যে **পর্যায়ক্রমিক গঠন-ধাপ** আছে, তা কেউ জানত না; বর্ষণকারী মেঘ যে গড়নে অ-বর্ষণকারী মেঘ থেকে আলাদা, তা-ও জানত না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কিউমুলোনিম্বাস মেঘের জন্ম নিয়ে আবহাওয়াবিজ্ঞান ঠিক এটিই শেখায়: বায়ুপ্রবাহ ছোট ছোট মেঘকোষকে হাঁকিয়ে এক করে আনে, তারপর কোষগুলো মিশে এক হয়ে যায়, তারপর সেই পিণ্ড স্তরে স্তরে খাড়াভাবে বাড়তে থাকে, যা 15 কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে। **কেবল এই ধাপে এসেই** ফোঁটাগুলো পড়ার মতো যথেষ্ট বড় হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ক্রম ও ব্যবধান বোঝানো অব্যয় দিয়ে জোড়া তিনটি পরপর ক্রিয়া: "সঞ্চালিত করেন" (আলতো করে হাঁকিয়ে নেন) → "পরস্পর জোড়া লাগান" (খণ্ডগুলো মেলান) → "স্তূপীকৃত করেন" (খাড়াভাবে থাকে থাকে সাজান)। এ এমন এক ক্রম, যাকে **না উল্টানো যায়, না সংক্ষিপ্ত করা যায়**, আর এটিই হুবহু বৈজ্ঞানিক ক্রম। এরপর আসে শেষ সূক্ষ্মতা: বৃষ্টি বেরোয় **"তার ফাঁক থেকে"** — অর্থাৎ পিণ্ডের ভেতরের ফাঁকফোকর ও ভাঁজ থেকে, তার নিচ থেকে নয়। রাডারের ছবি ঠিক তা-ই দেখায়।

সূত্র World Meteorological Organization – *International Cloud Atlas* · NOAA – thunderstorm basics

জ্যোতির্বিজ্ঞান

4 “পুরোনো খেজুর-ডাঁটার মতো” — চাঁদের জন্য দেওয়া সবচেয়ে নিখুঁত উপমা

> আর চাঁদ — আমি তার জন্য মনযিল নির্ধারণ করেছি, শেষে সে পুরোনো খেজুর-ডাঁটার মতো হয়ে ফিরে আসে।
>
> **সূরা ইয়াসিন — আয়াত 39**

দুই শব্দে চারটি বৈশিষ্ট্য: বাঁকা, সরু, হলুদ, আর চক্রের শেষে

সহজ কথায়

উরজুন হলো সেই ডাঁটা, যাতে খেজুরের কাঁদি ঝোলে। পুরোনো হলে তা **শুকিয়ে যায়, সরু হয়ে যায়, বেঁকে যায় আর হলদে হয়ে পড়ে**। মাসের শেষের চাঁদকে কুরআন এরই সঙ্গে তুলনা করেছে — আর ঠিক তখনই সে হয়ে ওঠে সরু, বাঁকা, ফ্যাকাশে এক সুতো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

চাঁদের দশা তো সবাই দেখে, তাই প্রশ্নটা এই নয় যে চাঁদ ক্ষয়ে যায় তা তিনি জানতেন। প্রশ্নটা **বর্ণনার সূক্ষ্মতা আর উপমার বস্তুটি বেছে নেওয়ার**। আরবরা তাদের কবিতায় বাঁকা চাঁদকে বহু কিছুর সঙ্গে তুলনা করেছে — কাস্তের সঙ্গে, ছোট নৌকার সঙ্গে, নখের কাটা টুকরোর সঙ্গে — আর এদের প্রত্যেকটি ধরতে পারে কেবল একটি বৈশিষ্ট্য: **বাঁক**। রং ধরতে পারে না, শুষ্কতাও নয়, চক্রের কোন জায়গায় দশাটি পড়ছে তাও নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

চান্দ্রমাস **29.5 দিনের**, আর চাঁদ তা পার হয় গোনা কয়েকটি মনযিলে, যেগুলো থেকে সে কখনো সরে না; প্রতি রাতে তার আকৃতি **তার অবস্থানেরই** ফল, তার ভিতরের কোনো কিছুর নয়। আর মাসের শেষে তার আলোকিত অংশ নেমে আসে **1%-এরও নিচে**, তখন সে হয়ে যায় অতি সরু এক চাপ, যার দুই প্রান্ত সরু হতে হতে মিলিয়ে যায়।

এরপর এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা কেবল পর্যবেক্ষকের চোখেই ধরা পড়ে: মাসের শেষের বাঁকা চাঁদ **ভোরের ঠিক আগে পূর্ব দিগন্তের কাছাকাছি ছাড়া দেখাই যায় না** — আকাশের মাঝখানে কখনোই নয়। আর দিগন্তের কাছ থেকে আসা আলো বাতাসের এক পুরু স্তর পেরোয়, যা নীলকে আটকে দেয় আর হলুদ ও লালকে যেতে দেয় — **তাই তাকে দেখায় ফ্যাকাশে হলুদ**। আর সেটিই শুকনো খেজুর-ডাঁটার রং, হুবহু।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উপমাটির ভিতরে যত শর্ত ভরা আছে, সব একসঙ্গে সাজান: **বাঁকা**, **সরু, দুই প্রান্ত সরু হয়ে আসা**, **ফ্যাকাশে হলুদ**, আর **চক্রের শেষে, শুরুতে নয়**। দুই শব্দে চারটি শর্ত, আর প্রতিটিই লেগে যায়।

চতুর্থটিই সবচেয়ে সূক্ষ্ম। কুরআন *হিলাল* বলেনি — যা মাসের শুরুর বাঁকা চাঁদের চলতি নাম — বরং বলেছে **“ফিরে এলো”**, অর্থাৎ আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই ফিরে এলো; আর উপমার বস্তুটিকে বলেছে **“পুরোনো”**। ফলে পুরোনোর সঙ্গে মিলল পুরোনো, আর ফিরে আসার সঙ্গে মিলল চক্র। এ কারণেই তাফসিরকারগণ, যখন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কিছুই জানা ছিল না, বলেছেন: এ হলো মাসের শেষের চাঁদ, **তার লুকিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে**।

আর উপমার বস্তুটি কারও থেকে দূরে ছিল না: **মদিনার প্রতিটি ঘরে একটি করে খেজুর-ডাঁটা**। উপমাটি গোটা আরবের প্রতিটি চোখের সামনে খোলা পড়ে ছিল, আর একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যেও যদি ভুল হতো, বিরোধীদের কবিরা সেদিনই তা লুফে নিত — তারা এর চেয়ে হালকা জিনিস নিয়েও খোঁটা দিয়েছে। তাদের কারও কাছ থেকে এই একটি অক্ষর নিয়েও কোনো আপত্তি বর্ণিত হয়নি।

আর একটি সীমায় থামুন: আমরা দাবি করছি না যে আয়াতটি দশা বদলের *কারণ* শেখাচ্ছে; অ্যানাক্সাগোরাস খ্রিষ্টপূর্ব চার শতাব্দী আগেই স্থির করেছিলেন যে চাঁদ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। আমরা যা বলছি তা আরও সংকীর্ণ ও আরও মজবুত: **দুই শব্দের একটি বর্ণনা চারটি ভিন্ন ভিন্ন ভৌত বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে ধরেছে** — আকৃতি, রং, সরুতা আর চক্রে অবস্থান — আর প্রতিটিতেই লেগে গেছে। এ কাজ ভাগ্যের জোরে হয় না।

সূত্র تفسير ابن كثير – سورة يس ٣٩ · تفسير الطبري – سورة يس ٣٩ · NASA Science – *Moon Phases* · FAO – *Botanical Description of the Date Palm* · Stanford Encyclopedia of Philosophy – *Anaxagoras*

শারীরস্থান

5 তিনশ ষাটটি অস্থিসন্ধি — ব্যবচ্ছেদের আগেই গোনা

বনি আদমের প্রত্যেক মানুষকে তিনশ ষাটটি অস্থিসন্ধির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আয়েশা থেকে — সহিহ · বুরাইদা থেকে সহিহ সমর্থক বর্ণনাসহ

যেখানেই দুটি হাড় মিলিত হয়... গোনা ও নাম দেওয়া

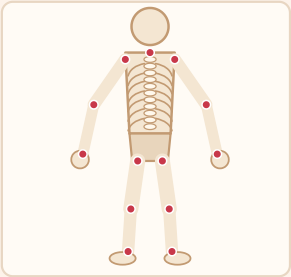

147	মেরুদণ্ড
24	বক্ষপিঞ্জর
86	দুই উর্ধ্বাঙ্গ
88	দুই নিম্নাঙ্গ
15	শ্রোণি
360 অস্থিসন্ধি	

স্পষ্ট এক সংখ্যা, যার কোনো ব্যাখ্যান্তর চলে না — প্রথম নির্ভুল শারীরস্থান-মানচিত্রের নয় শতাব্দী আগে বলা

সহজ কথায়

আপনার শরীরে আছে **তিনশ ষাটটি অস্থিসন্ধি** — এটিই মূল সংখ্যা, মানুষভেদে যা সামান্য বাড়ে বা কমে। নবী ﷺ চৌদ্দ শতাব্দী আগে এ কথা বলেছেন, আর তার প্রতিটি সন্ধির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন **প্রতিদিন আদায় করার মতো একটি সদকা**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরব উপদ্বীপে ব্যবচ্ছেদও ছিল না, চিকিৎসাবিদ্যার কোনো পাঠশালাও ছিল না; আর অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতায় মানুষের দেহ ব্যবচ্ছেদ করা ছিল নিষিদ্ধ — এতটাই যে **গ্যালেন** তাঁর শারীরস্থান দাঁড় করিয়েছিলেন বানর ও শূকরের উপর।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

শরীরের সন্ধিগুলো একটি একটি করে গোনা হয়েছে — যেখানেই দুটি হাড় মিলিত হয়, তা নড়ুক বা না নড়ুক — ডা. **হামিদ আহমাদ হামিদ**-এর দেওয়া বিভাজন অনুযায়ী: **মেরুদণ্ড 147**, **বক্ষপিঞ্জর 24**, **দুই ঊর্ধ্বাঙ্গ 86**, **দুই নিম্নাঙ্গ 88**, আর **শ্রোণিচক্র 15**। সব মিলিয়ে: **তিনশ ষাট**।

গণনা নির্ভর করে দুটি জিনিসের উপর: সংজ্ঞা আর দেহ। যিনি কেবল নড়নশীল সন্ধিগুলো গুনবেন, তাঁর সংখ্যা কম পড়বে। আবার দেহগুলোও পরস্পর থেকে সামান্য আলাদা: প্রায় 26% মানুষের থাকে **অতিরিক্ত ক্ষুদ্রাস্থি**, 15%-এর **অন্তর্বর্তী কশেরুকা**, আর 8%-এর **তিলাস্থি**। তাই **সুস্থ দেহে তিনশ ষাটই মূল সংখ্যা**, প্রতিটি মানুষে অভিন্ন কোনো অনড় গণনা নয়। আর প্রথম নির্ভুল শারীরস্থান-মানচিত্র এসেছে 1543 সালে, **ভেসালিয়াস**-এর হাতে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, এই সংবাদটি কোন ধরনের: এটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ কোনো বর্ণনা নয়, কোনো উপমাও নয় — এটি একটি **সংখ্যা**; হয় তা মিলবে, নয় তা ভেঙে পড়বে। নিরাপদ থাকতে চাইলে তিনি বলতে পারতেন "অনেক সন্ধি"। কিন্তু তিনি বললেন: **তিনশ ষাট** — এমন এক দেহ সম্পর্কে যা কখনো খোলা হয়নি, এমন এক উপদ্বীপে যেখানে ছুরিও নেই, চিকিৎসার পাঠশালাও নেই।

আর সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, সংখ্যাটি নিজের জন্য বলা হয়নি, বলা হয়েছে এক বিধানের প্রসঙ্গে: এর প্রতিটি সন্ধির উপর **প্রতিদিন একটি করে সদকা** রয়েছে। সংখ্যাটি বিধানের ভার বহন করছে, বাক্যের অলংকার নয়; ভুল হলে বিধানও তার সঙ্গে ভেঙে পড়ত।

বলা হতে পারে: হয়তো উদ্দেশ্য আঙুলের হাড়, কেননা ভাষায় *সুলামা*-র মূল অর্থ তো তা-ই। হাদিসটি নিজেই এর মীমাংসা করে দেয়: তিনি ﷺ বলেছেন, তিনশ ষাটটি **মাফসিল**-এর উপর — অর্থাৎ সন্ধি — তারপর সেই একই বাক্যে সেই একই সংখ্যাকে বললেন **"সুলামা"**। একটিমাত্র পাঠে একই গণনার জন্য দুটি শব্দ — **সুতরাং হাদিসই *সুলামা*-কে সন্ধি বলে ব্যাখ্যা করেছে**। আর মাফসিল মানে দুটি হাড়ের মিলনস্থল, এতে কোনো মতভেদ নেই; এ কারণেই সহিহ মুসলিমের ইংরেজি অনুবাদগুলো একে *joints* — দেহের সন্ধি — বলেই অনুবাদ করে, আঙুলের হাড় নয়।

এরপর বলা হতে পারে: হয়তো তা তাঁর কাছে পৌঁছেছে চীনা চিকিৎসা থেকে। আমরা কথাটি যেমন আছে তেমনই বলি: হ্যাঁ, সংখ্যাটি চীনের প্রাচীন গ্রন্থে আছে — *লিংশু* বলে: "বছরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন, আর দেহে তিনশ ষাটটি সন্ধি।" আর গ্রন্থটি নিজেই বলে দেয় সংখ্যাটি কোথা থেকে এসেছে: **পঞ্জিকা** থেকে, দেহ থেকে নয়। তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়: এসব **আরব মরুভূমির এক নিরক্ষর মানুষের** কাছে পৌঁছাবে কী করে? পৌঁছানোর কোনো পথই ছিল না — মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি বাধা:

1 — কোনো পথ নেই। চীনে পৌঁছানো প্রথম মুসলিম দূতদল যায় 651 খ্রিস্টাব্দে — নবী ﷺ-এর ওফাতের উনিশ বছর পর।

2 — কোনো অনুবাদও নেই। চীনা চিকিৎসার প্রথম যে গ্রন্থ কোনো ভাষায় বেরোয়, তা হলো *তানসুকনামা*, 1313 খ্রিস্টাব্দে — হাদিসের সাত শতাব্দী পরে।

3 — আর গ্রন্থটি নিজেই হারিয়ে গিয়েছিল। *লিংশু* চীন থেকেই হারিয়ে যায়, শেষে সং রাজদরবার 1091 খ্রিস্টাব্দে কোরিয়ার কাছে তার একটি প্রতিলিপি চেয়ে পাঠায় এবং 1093 সালে তা হাতে পায় — অর্থাৎ হাদিসের **সাড়ে চার শতাব্দী পরে**।

এক নিরক্ষর মানুষ, যিনি কোনোদিন কোনো দেহ খোলেননি, তাঁর উম্মাহকে দিয়ে গেলেন একটি শারীরস্থানগত সংখ্যা এবং তার উপর দাঁড় করালেন একটি ইবাদত... তারপর নয় শতাব্দী পরে আধুনিক ব্যবচ্ছেদ গুনে দেখল সংখ্যাটি ঠিক সেটিই। **তাহলে কে তাঁর হয়ে সেগুলো গুনে দিয়েছিল?**

সূত্র صحيح مسلم ١٠٠٧ – «فَقصل» و«سُلامى» في نصٍّ واحد · Cleveland Clinic – *Joints* · Stanford Encyclopedia of Philosophy – *Chinese Philosophy and Chinese Medicine* · د. حامد أحمد حامد – «رحلةُ الإيمان في جسم الإنسان» · Köstenbauer, *ANZ J. Surg.* 2017 · رشيد الدين – «تنكسوق نامه»، ١٣١٣م

ভ্রূণবিজ্ঞান

6 লেজের হাড় — এ থেকেই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে

আদম-সন্তানের সবকিছুই মাটি খেয়ে ফেলে, শুধু লেজের হাড়টুকু ছাড়া; তা থেকেই সে সৃষ্টি হয়েছে এবং তা থেকেই তাকে পুনরায় গড়া হবে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

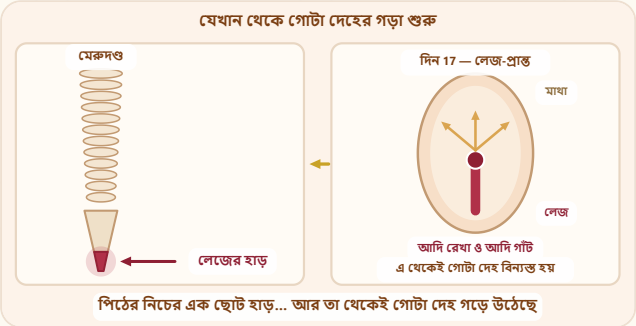

আদি রেখা ফুটে ওঠে ভ্রূণের লেজ-প্রান্তে, আর তা থেকেই গড়ে ওঠে সব অক্ষ ও সব স্তর

সহজ কথায়

লেজের হাড় হলো **মেরুদণ্ডের একেবারে নিচের ছোট্ট হাড়টি**। নবী ﷺ বলেছেন, মানুষ **তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে**। আর ভ্রূণবিজ্ঞান আজ বলে: গোটা দেহের নির্মাণ শুরু হয় **ভ্রূণের লেজ-প্রান্তে ফুটে ওঠা একটি রেখা** থেকে, যার শীর্ষে থাকে **অর্গানাইজার** নামে একটি গাঁট — সেখান থেকেই বিন্যস্ত হয় তিনটি জননস্তর ও দেহের সব অক্ষ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ভ্রূণের প্রথম পর্যায় সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না; তা দুই মিলিমিটারেরও ছোট, কোনো চোখ তা ধরতে পারে না। আর কক্কিক্স বা লেজের হাড়কে দেখা হতো **কাজহীন এক উদ্‌বৃত্ত** হিসেবে — সংকুচিত একটি লেজ; এতটাই যে ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীরা একে ঠাঁই দিয়েছিলেন অকেজো "অবশেষ অঙ্গের" তালিকায়। ঠিক এই জায়গাটিকেই **সৃষ্টির উৎস** বলা সাধারণ বোধের বিরুদ্ধে যায়: বুদ্ধি তো শুরু করে মাথা কিংবা হৃৎপিণ্ড দিয়ে, পিঠের নিচের প্রান্ত দিয়ে নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সপ্তদশ দিনে ভ্রূণ-চাকতিতে ফুটে ওঠে একটি রেখা, যার নাম **আদি রেখা**, আর তার অবস্থান ভ্রূণের **লেজ-প্রান্ত**। তার শীর্ষে থাকে **আদি গাঁট**, ভ্রূণবিজ্ঞানে যাকে বলা হয় **অর্গানাইজার**: এটিই দুই পাশের প্রতিসাম্য দাঁড় করায়, গ্যাস্ট্রুলেশন কোথায় ঘটবে তা নির্ধারণ করে, তিনটি জননস্তরের সূচনা ঘটায় এবং দেহের অক্ষগুলো এঁকে দেয় — মাথা থেকে লেজ, ডান থেকে বাম।

স্পেমান ও মানগোল্ড 1924 সালে প্রমাণ করেন, সালামান্ডারের ভ্রূণে এই গাঁটের সমতুল্য **ব্লাস্টোপোরের পৃষ্ঠীয় ঠোঁট**টুকু আলাদা করে অন্য একটি ভ্রূণে বসিয়ে দিলে গ্রহীতা ভ্রূণের নিজের কোষগুলোই গড়ে তোলে **দ্বিতীয় একটি ভ্রূণ-অক্ষ** — তার স্নায়ুনালি, পৃষ্ঠরজ্জু ও সোমাইটসহ — আর এর জন্যই স্পেমান 1935 সালে নোবেল পান।

এরপর রেখাটি গুটিয়ে আসে এবং বিংশ দিনে তার অবশিষ্টাংশ হয়ে যায় **লেজ-কুঁড়ি**। আর তার একটি পরিচিত চিকিৎসাগত সম্পর্ক থেকে যায়: **স্যাক্রোককসিজিয়াল টেরাটোমা** নামের টিউমারটিকে আদি রেখার অবশেষের সঙ্গেই সম্পর্কিত করা হয়, আর তার অস্ত্রোপচারে কেবল টিউমার কেটে ফেলাই যথেষ্ট নয় — **কক্কিক্সটিও তার সঙ্গে কেটে বাদ দেওয়া হয়**, কারণ ওটি রেখে দিলেই টিউমার ফিরে আসে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

শুধু অব্যয়টির দিকে তাকান। বলা হয়নি "তার মধ্যে সে সৃষ্টি হয়েছে", বলা হয়নি "তা অন্যদের আগে সৃষ্টি হয়েছে", বলা হয়েছে **"তা থেকেই সে সৃষ্টি হয়েছে"** — অর্থাৎ জায়গাটিকে করা হয়েছে এমন এক **উৎস**, যা থেকে নির্মাণ বেরিয়ে আসে। আর অর্গানাইজারের বর্ণনা ঠিক এটিই: এটি প্রথম গড়ে ওঠা অঙ্গ নয়, বরং সেই জায়গা **যেখান থেকে** বাকি অঙ্গগুলো বিন্যস্ত হয়।

এবার যে জায়গাটি বেছে নেওয়া হলো তার দিকে তাকান: পিঠের নিচের প্রান্ত। সপ্তম শতাব্দীর পর্যবেক্ষণে এমন কিছুই নেই যা একে সৃষ্টির উৎস বলতে উদ্‌বুদ্ধ করে, বরং সবকিছুই মনকে এখান থেকে সরিয়ে নেয়। আর কারও পক্ষে তা দেখা সম্ভবও ছিল না: সপ্তদশ দিনের ভ্রূণ খালি চোখে ধরার পক্ষে অনেক ছোট।

আর এখানে আমরা এমন এক সীমায় থামছি, যা বলে দেওয়া উচিত। হাদিসের দ্বিতীয় অংশ — "**এবং তা থেকেই তাকে পুনরায় গড়া হবে**" — পুনরুত্থান সম্পর্কে সংবাদ, যা গায়েবের বিষয়; কোনো পরীক্ষা সেখানে পৌঁছায় না, আর আমরা এখানে তার উপর কিছুই দাঁড় করাচ্ছি না। আর বিজ্ঞান নাকি "প্রমাণ করেছে কক্কিক্স ধ্বংস হয় না" বলে যে কথা প্রচলিত, তার সমর্থনে পিয়ার-রিভিউ করা কোনো প্রকাশিত গবেষণা আমাদের জানা নেই — **আর যার প্রমাণ নেই তা বাদ দেওয়াই যুক্তির জন্য বেশি উপকারী, তা দিয়ে যুক্তিকে ভারী করার চেয়ে**। পুরো ভারটি প্রথম অংশেই: দেহের একটি জায়গা সম্পর্কে ছোট্ট একটি বাক্য, যাচাই করা সম্ভব, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের হাজার বছর আগে বলা... আর তা মিলে গেল। **তাহলে কে তাঁকে এর সন্ধান দিল?**

সূত্র Spemann & Mangold (1924) – the organizer · Nobel Prize in Physiology or Medicine 1935 · Moore & Persaud – *The Developing Human*

ভ্রূণবিজ্ঞান

৭ বিয়াল্লিশ রাত — তারপর আকৃতি ফুটে ওঠে

নুতফার উপর বিয়াল্লিশ রাত অতিবাহিত হলে আল্লাহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান, যিনি তাকে আকৃতি দেন এবং সৃষ্টি করেন তার শ্রবণ ও দৃষ্টি, তার চামড়া, গোশত ও হাড়।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

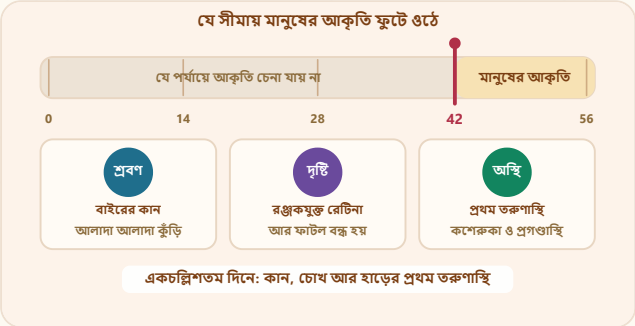

অদ্ভুত এক সংখ্যা, যা কেবল তখনই বলা হয় যখন সেটিই উদ্দেশ্য — চল্লিশ নয়, বিয়াল্লিশ

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, নুতফার উপর **বিয়াল্লিশ রাত** কেটে গেলে তাকে আকৃতি দেওয়া হয়, আর তাতে সৃষ্টি করা হয় শ্রবণ, দৃষ্টি, চামড়া, গোশত ও হাড়। আজকের ভ্রূণবিজ্ঞান ঠিক এই দিনটিতেই একটি **চৌকাঠ** বসায়: তার আগে আকৃতিতে এমন কিছুই নেই যা মানব-ভ্রূণকে অন্য কোনো ভ্রূণ থেকে আলাদা করে, আর সেখানে পৌঁছেই মানুষের চিহ্নগুলো ফুটতে শুরু করে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বিয়াল্লিশতম দিনের ভ্রূণ দেখার কোনো উপায় কারও ছিল না: তার দৈর্ঘ্য প্রায় **বারো মিলিমিটার**, আর সে মায়ের জরায়ুর ভেতরে। গ্রিকদের কাছে আকৃতি গঠনের একটি বিখ্যাত তারিখ ছিল: **অ্যারিস্টটল** *প্রাণীর ইতিহাস* গ্রন্থে স্থির করেছিলেন যে পুরুষ ভ্রূণ চেনা যায় **চল্লিশতম দিনে** আর নারী ভ্রূণ **নব্বইতম দিনে**, আর তার আগে তা বিভাজনহীন এক মাংসল বস্তু। এই তারিখ দুই দিক থেকেই ভুল: আকৃতি গঠনের সময়ে নর ও নারীর কোনো পার্থক্য নেই, আর জননাঙ্গ বারো সপ্তাহের আগে আলাদা করে চেনাই যায় না। তবু অ্যারিস্টটল চিকিৎসা ও আইনের উপর রাজত্ব করেছেন এক হাজার বছর। ভ্রূণের বিকাশের সঠিক সময়সূচি তৈরি হয়েছে বিশ শতকে এসে, যখন **কার্নেগি পর্যায়গুলো** দিনে-গোনা বয়স অনুসারে সাজানো হলো।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কার্নেগি পর্যায় সতেরো-র বয়স নিষেকের পর **একচল্লিশ দিন**, আর তাতে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য 11–14 মিলিমিটার। ঠিক সেই পর্যায়েই:

— **কান**: কর্ণছত্রের ছয়টি কুঁড়ি আলাদা হয়ে ওঠে এবং বাইরের কানের আকৃতি নেয়।

— **চোখ**: রেটিনার রঞ্জক স্পষ্ট দেখা দেয়, রেটিনার ফাটল বন্ধ হয়, আর লেন্সের তন্তু গড়ে ওঠে।

— **হাড়**: কশেরুকার পিণ্ডে এবং প্রগণ্ডাস্থি ও বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থিতে তরুণাস্থি জমতে শুরু করে। আর কণ্ঠা — গোটা শরীরে সবার আগে যে হাড়ে অস্থিভবন হয় — তার অস্থিভবন-কেন্দ্র দেখা দেয় সেই **ষষ্ঠ সপ্তাহেই**।

ব্রিটানিকা এই সময়টির বর্ণনায় বলে, চতুর্থ সপ্তাহে ভ্রূণকে একটি স্তন্যপায়ী বলে চেনা যায়, তারপর: "**দ্বিতীয় মাসের শেষ সপ্তাহগুলোতে বিকাশের পরিবর্তনগুলো প্রাইমেটদের আলাদা করে এমন লক্ষণ পেরিয়ে এমন এক অবস্থায় পৌঁছায়, যেখানে তাকে চেনা যায় মানুষ বলেই**।" আর দ্বিতীয় মাসের শেষ সপ্তাহগুলো শুরু হয় বিয়াল্লিশতম দিন থেকেই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে সূক্ষ্মতা রয়েছে **অদ্ভুত সংখ্যাটির** ভেতরে। বক্তা যদি সহজ কোনো সংখ্যা চাইতেন, বলতেন চল্লিশ — যে সংখ্যাটি সবকিছুতেই আরবদের মুখে চলে, **আর সেই সংখ্যাটিই তখনকার চিকিৎসাশাস্ত্রে তৈরি হয়ে বসেছিল**: চল্লিশ দিন, অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে চিকিৎসা ও আইনে এক হাজার বছর ধরে। ধার করা হলে, কিংবা চালু কথার সঙ্গে তাল মেলানো হলে, চল্লিশই বেরোত। কিন্তু তিনি বললেন **বিয়াল্লিশ** — এমন সংখ্যা কেবল তখনই বলা হয় যখন সেটিই উদ্দেশ্য, আর যে কথা মুখস্থ করা হয় ও হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া হয় তাতে এমন সংখ্যা এলোমেলোভাবে বাছা হয় না। আর অ্যারিস্টটল নর-নারীতে ভাগ করে ভুল করলেন; হাদিস ভাগ করেনি, আর ঠিক বলেছে।

তারপর দেখুন, এই দিনটির সঙ্গে কী বাঁধা হলো: **আকৃতি দেওয়া**। প্রাণ নয়, নড়াচড়া নয়, স্পন্দন নয় — আকৃতি। আর ভ্রূণবিজ্ঞান ঠিক এই জিনিসটিকেই এই চৌকাঠে বসায়: তার আগে মানব-ভ্রূণের আকৃতি অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণ থেকে আলাদা করা যায় না, আর তার পরে চিহ্নগুলো ফুটে ওঠে।

তারপর দেখুন ক্রমটি: **তার শ্রবণ ও তার দৃষ্টি** — শ্রবণ আগে। কুরআন যেখানেই এই দুটির উল্লেখ করেছে, সর্বত্র এই ক্রমই ধরে রেখেছে।

আর সেই একই সপ্তাহে মিলে যায় হাদিসে নাম ধরে বলা তিনটি জিনিস: কান আকৃতি নেয়, রেটিনা রঞ্জক ধরে, আর প্রথম হাড় তার কেন্দ্র বাঁধে। **তিনটি আলাদা তন্ত্র একসঙ্গে নিজেদের চৌকাঠ পেরোচ্ছে।**

আর একটি সীমায় থামুন: ফেরেশতা যা করেন তা গায়েব, অণুবীক্ষণে তা মাপা যায় না, আর আমরা এখানে তার উপর কিছুই দাঁড় করাচ্ছি না। যা মাপা যায় তা হলো **সময়টি**: গুনে-রাখা একটি রাত, এমন এক দেহে যা কেউ দেখতে পেত না, অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরির এক হাজার বছর আগে বলা হয়েছিল... আর তা মিলে গেল। **তবে তাঁকে এ খবর কে দিল?**

সূত্র Aristotle – *History of Animals*, VII · O'Rahilly & Müller – Carnegie stage 17 · *Britannica* – "Prenatal development"

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা

৪ স্থির পানিতে কেউ যেন পেশাব না করে

> তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব না করে, যা প্রবাহিত হয় না, তারপর তাতেই গোসল করে।
>
> **বুখারি ও মুসলিম — মুত্তাফাকুন আলাইহি**

বিলহারজিয়ার চক্র — দুই প্রান্তই নিষিদ্ধ

1. আক্রান্ত ব্যক্তি স্থির পানিতে পেশাব করে — তাতেই ডিম
2. ডিম ফোটে কেবল মিঠা পানিতে
3. লার্ভা ঢোকে এমন শামুকে, যা কেবল স্থির পানিতে বাঁচে
4. লার্ভা বেরিয়ে গোসলকারীর ত্বক ভেদ করে

একই বাক্যে চক্রের শুরু ও শেষ দুটোই নিষেধ

নিষেধ যদি কেবল নোংরার জন্য হতো, এই শর্তের কোনো মানে থাকত না: "স্থির পানি, যা প্রবাহিত হয় না"

সহজ কথায়

নবী ﷺ নিষেধ করেছেন **দুটি জিনিস একসঙ্গে**: স্থির, অপ্রবাহিত পানিতে পেশাব করা, আর তারপর সেই পানিতেই গোসল করা। আর এ দুটিই হুবহু **বিলহারজিয়া** রোগের চক্রের দুই প্রান্ত — মিসর ও আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে বিস্তৃত পরজীবী কৃমি: এর ডিম দেহ থেকে বেরোয় **পেশাবের সঙ্গে**, ডিম ফোটে কেবল **স্থির মিঠা পানিতে**, আর মানুষ পানিতে নামলে তা আবার তার দেহে ঢোকে **চামড়া ভেদ করে**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পেশাব যে রোগ ছড়াতে পারে, তা কেউ জানত না; পানিতে এমন কিছু আছে যা চামড়া ভেদ করে ঢোকে, তাও নয়। বরং স্থির জলাশয়ই ছিল একইসঙ্গে পান ও গোসলের উৎস। কৃমিটিকে সবার আগে নিজ চোখে দেখেন জার্মান চিকিৎসক **থিওডোর বিলহার্জ**, কায়রোর কসরুল আইনি হাসপাতালে, **1851** সালে। আর তা কীভাবে ছড়ায়, সেটি এরপরও অজানা থেকে যায় **চৌষট্টি বছর**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই চক্রটির যে বর্ণনা দেয়:

1 — আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের পেশাব দিয়ে মিঠা পানি দূষিত করে, তাতে থাকে পরজীবীর ডিম।

2 — ডিম ফোটে কেবল **মিঠা পানির** সংস্পর্শে এলে, আর বেরিয়ে আসে একটি সাঁতারু লার্ভা।

3 — লার্ভাটি ঢোকে একটি **মিঠা পানির শামুকে** — আর এই শামুক বাঁচে কেবল স্থির বা ধীরে বওয়া পানিতে — এবং তার ভেতরে হাজারে হাজারে বংশ বাড়ায়।

4 — সেখান থেকে বেরোয় অন্য লার্ভা, যারা পানিতে সাঁতরায়; কোনো মানুষ সে পানিতে নামলে তারা **কয়েক মিনিটেই তার চামড়া ভেদ করে**।

আর **লাইপার 1915** সালে প্রমাণ করেন সেই অংশটি, যা কেউ ভাবেইনি: সংক্রমণ **মুখ দিয়ে আদৌ ঘটে না**, ঘটে চামড়া ভেদ করেই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, নিষেধটি এসেছে **যৌগিকভাবে, একক নয়**। তিনি বলেননি যে পানিতে পেশাব করা নিষেধ। বলেননি যে স্থির পানিতে গোসল করা নিষেধ। বরং দুটি কাজকে এক বাক্যে জুড়ে দিয়েছেন "তারপর" দিয়ে: **তাতে পেশাব করা, তারপর তাতেই গোসল করা**। আর এ দুটিই — অক্ষরে অক্ষরে — সেই চক্রের প্রবেশপথ ও নির্গমনপথ।

এবার শর্তটি দেখুন: **"স্থির পানি, যা প্রবাহিত হয় না"**। নিষেধটি যদি নিছক ঘৃণা বা নোংরার কারণে হতো, এ শর্তের কোনো মানে থাকত না — প্রবহমান পানিতেও তো নোংরা নোংরাই। কিন্তু আজ আমরা যা জানি সেটিই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে শর্তটি একেবারে নিখুঁত: **বাহক শামুক বহমান পানিতে বাঁচে না**।

আর বিষয়টি যদি রুচি ও ঘেন্নার হতো, তবে নিষেধ করার মতো প্রথম জিনিস হতো তা থেকে **পান করা** — সেটিই মনের সবচেয়ে কাছে, সবার আগে সেটিই মাথায় আসে। অথচ নিষেধ পড়ল **গোসলের** উপর, যাকে পান করার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক কেউ ভাববেই না... যতক্ষণ না লাইপার 1915 সালে প্রমাণ করলেন যে সংক্রমণ ঘটে **চামড়া দিয়ে, মুখ দিয়ে নয়**।

এক বাক্যে তিনটি শর্ত — **স্থিরতা, পেশাব আর গোসল** — প্রতিটিই এমন এক রোগের চক্রের সত্যিকারের গিঁটে গিয়ে লাগে, যার প্রথম কৃমিটিই দেখা যায়নি বারো শতাব্দী পর্যন্ত, আর যার সংক্রমণের পথ জানা যায়নি তেরো শতাব্দী পর্যন্ত। **তবে এই তিনটির সন্ধান তাঁকে কে দিল?**

সূত্র WHO – fact sheet: *Schistosomiasis* · Leiper (1915) – the Bilharzia Mission in Egypt · Theodor Bilharz – Kasr el-Aini, Cairo, 1851

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা

৯ এটি ওষুধ নয় — এটি রোগ

এটি ওষুধ নয়, বরং এটি রোগ।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

পঁচিশ শতাব্দীর ঐকমত্য আর তার পতনের মাঝে এক বাক্য

পঁচিশ শতাব্দী: ওষুধ	আর চিকিৎসা যেখানে পৌঁছাল
2100 খ্রি.পূ. — সুমেরের ওষুধ-তালিকা	1916 — ওষুধ-তালিকা থেকে বাদ
হিপোক্রেটিস: প্রতিটি পথ্যে	1917 — কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই
গ্যালেন: শোধন করে, ভারসাম্য আনে	2023 — নিরাপদ কোনো মাত্রা নেই

ওষুধ নয়... বরং রোগ
বলা হয়েছিল যখন তা ছিল গোটা দুনিয়ার ওষুধ

বললেন সেই লোককে, যে বলল: আমি তো ওষুধের জন্যই বানাই

তিনি বলেননি এর ক্ষতি উপকারের চেয়ে বেশি — ওষুধ হওয়াকে অস্বীকার করলেন, রোগ হওয়াকে সাব্যস্ত করলেন

সহজ কথায়

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এলেন, তিনি নিষেধ করলেন। লোকটি বললেন: **"আমি তো কেবল ওষুধ হিসেবেই এটি বানাই।"** তিনি ﷺ বললেন: "এটি ওষুধ নয়, বরং এটি রোগ।" সেই যুগে মদ ছিল **গোটা দুনিয়ার ওষুধ**, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। আর আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে রেখেছে **প্রথম শ্রেণির ক্যানসার-সৃষ্টিকারী পদার্থের** তালিকায়, আর বলছে এর **কোনো নিরাপদ মাত্রাই নেই**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীন চিকিৎসায় মদ হালকাভাবে নেওয়া কোনো পানীয় ছিল না — এটি ছিল **চিকিৎসার একটি স্তম্ভ**। ইতিহাসের প্রাচীনতম ওষুধ-তালিকা, সুমের থেকে, প্রায় **2100 খ্রিস্টপূর্বাব্দে**, মদকে ওষুধ হিসেবেই নির্দেশ করে। মিসরীয় **এবার্স** প্যাপিরাস, প্রায় 1550 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, একে ভেষজের সঙ্গে মিশিয়ে জীবাণুনাশক ও ওষুধের বাহক বানায়। **হিপোক্রেটিস** প্রায় প্রতিটি রোগের পথ্যেই একে ঢোকান এবং ক্ষত পরিষ্কারের উপকরণ বানান। **গ্যালেন** বলেন, এটি দেহকে পরিশুদ্ধ করে ও ধাতুর ভারসাম্য রক্ষা করে। আর এ ধারা চিকিৎসার বইপত্রে চলেছে **প্রায় পঁচিশ শতাব্দী**, ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উল্টোটা শুরু হয় 1850 সালের পর, পরীক্ষামূলক চিকিৎসার হাত ধরে। **1916** সালে হুইস্কি ও ব্র্যান্ডি বাদ পড়ে **যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ-তালিকা** থেকে। **1917** সালে আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করে, শক্তিবর্ধক বা উদ্দীপক হিসেবে অ্যালকোহলের **"কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই"**।

তারপর এল চূড়ান্ত রায়: ক্যানসার গবেষণার আন্তর্জাতিক সংস্থা অ্যালকোহলকে রাখে **প্রথম শ্রেণিতে** — ক্যানসার-সৃষ্টিকারী পদার্থের সর্বোচ্চ শ্রেণি, যেখানে আছে অ্যাসবেস্টস, তেজস্ক্রিয়তা ও তামাক। আর **জানুয়ারি 2023**-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশ করে যে **অ্যালকোহলের কোনো মাত্রাই স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ নয়**। অন্তত **সাত ধরনের ক্যানসার** এর সঙ্গে যুক্ত, আর প্রতি বছর প্রায় **7 লাখ 40 হাজার নতুন রোগী**।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কথাটি কোথায় পড়ল, সেখানে থামুন। লোকটি স্বাদের জন্য পান করার কথা জিজ্ঞেস করেননি, খেয়ালের অজুহাতও দেননি — তিনি বলেছিলেন: **"আমি তো কেবল ওষুধ হিসেবেই এটি বানাই।"** অর্থাৎ সেদিন গোটা দুনিয়ায় যে যুক্তিটি সবচেয়ে শক্ত ছিল, তিনি সেটিই নিয়ে এসেছিলেন। নিষেধটি যদি নিছক ইবাদতের নিষেধ হতো, উত্তর হতো: "ওষুধ হিসেবেও এটি পান করা চলবে না।" কিন্তু উত্তর এল **এটি আসলে কী, সেই সংবাদ হয়ে**: এটি ওষুধই নয় — এটিই রোগ।

আর এ এমন এক বাক্য, যা সেদিন পৃথিবীর বুকে থাকা প্রতিটি চিকিৎসা-ধারার ঐকমত্যের বিরুদ্ধে যায়: গ্রিক, রোমান, পারসিক, ভারতীয় ও মিসরীয়। **একটি ধারাও এর সঙ্গে একমত নয়** — তাই এমন কেউ ছিল না যার কাছ থেকে কথাটি নেওয়া যেত, কারণ এ এমন কথা যার কোনো বক্তাই ছিল না।

তারপর সময় গড়াল। 1916 সালে মদ ওষুধ-তালিকা থেকে বেরিয়ে গেল, আর 2023 সালে হয়ে গেল প্রথম শ্রেণির ক্যানসার-সৃষ্টিকারী, যার নিরাপদ মাত্রা বলে কিছু নেই। অর্থাৎ পাঁচ শব্দের একটি বাক্য যা বলেছিল, সেখানে পৌঁছাতে চিকিৎসাশাস্ত্রের লেগেছে **তেরো শতাব্দী**।

আর গড়নটির নিখুঁত দিকটি লক্ষ করুন: তিনি বলেননি "এর ক্ষতি উপকারের চেয়ে বেশি" — সতর্ক মানুষ তো এ কথাই বলে, আর বলে নিরাপদ থাকে — বরং **ওষুধ হওয়াকে সরাসরি অস্বীকার করলেন, আর রোগ হওয়াকে সরাসরি সাব্যস্ত করলেন**। তেরো শতাব্দী পরে সংস্থাটিও ঠিক সেখানেই পৌঁছেছে: **কোনো নিরাপদ মাত্রা নেই। তবে তাঁকে কে খবর দিল?**

সূত্র IARC Monographs 100E – alcohol, Group 1 · WHO, 4 Jan 2023 – *No level of alcohol consumption is safe* · *U.S. Pharmacopeia* – alcohol removed, 1916

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা

10 কোয়ারেন্টিন — চিকিৎসাবিজ্ঞানের হাজার বছর আগে

কোনো ভূখণ্ডে প্লেগের কথা শুনলে সেখানে প্রবেশ কোরো না; আর তোমরা যে ভূখণ্ডে আছ সেখানে তা দেখা দিলে তা থেকে পালিয়ে বেরিয়ে এসো না।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

সপ্তম খ্রিস্টাব্দে রচিত এক বিশ্বজনীন জনস্বাস্থ্য-নীতি

সহজ কথায়

কোনো দেশে মহামারি দেখা দিলে: আপনি বাইরে থাকলে **সেখানে ঢুকবেন না**, আর ভেতরে থাকলে **সেখান থেকে বেরোবেন না**। এটিই হুবহু **কোয়ারেন্টিনের** সংজ্ঞা, যা গোটা দুনিয়া করোনা মহামারিতে প্রয়োগ করেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মহামারিকে বোঝা হতো ক্রোধ, অপদেবতা কিংবা দূষিত বাতাস হিসেবে। আর তা দেখা দিলে স্বাভাবিক আচরণ ছিল **দলবেঁধে পালানো** — অথচ এটিই সবচেয়ে খারাপ কাজ, কারণ তাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। জীবাণুর কথা জানা ছিল না, আর রোগ যে মেলামেশায় ছড়ায় তাও জানা ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

জীবাণুতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায়নি ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে, পাস্তুর ও কখ-এর হাতে। ইউরোপে প্রথম সংগঠিত কোয়ারেন্টিন হয় রাগুসায় (দুব্রোভনিক) 1377 সালে, আর ভেনিস প্রথম স্থায়ী কোয়ারেন্টিন-কেন্দ্র গড়ে 1423 সালে — অর্থাৎ এই হাদিসের সাত শতাব্দী পরে। আর হাদিসে বর্ণিত নীতিটি হলো **দ্বিমুখী কোয়ারেন্টিন**: প্রবেশ নিষেধ এবং নির্গমন নিষেধ — বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধিতে হুবহু এ কথাই বলা আছে, আর 2020 সালে গোটা দুনিয়ায় এটিই প্রয়োগ করা হয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

হাদিসের দ্বিতীয় অর্ধাংশটিই কঠিনতর এবং বুদ্ধিদীপ্ততর। মহামারি-আক্রান্ত ভূখণ্ডে প্রবেশ নিষেধ করা — সতর্কতা থেকেই মন এ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। কিন্তু **সেখান থেকে বেরোনো নিষেধ করা** বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তিরই বিরুদ্ধে যায়, আর তা কেবল তখনই যুক্তিসংগত হয় যখন জানা থাকে, বেরিয়ে যাওয়া মানুষটি রোগ বয়ে নিয়ে যেতে পারে **অথচ সে টেরও পায় না** — অর্থাৎ **সংক্রমণের নীরব বাহক** ধারণাটি। এ ধারণা বিংশ শতাব্দীর আগে জানাই ছিল না। উমর ইবনুল খাত্তাব একে বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন **আমওয়াসের প্লেগে**, সিরিয়া থেকে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে এনে; তাঁকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন: "আমরা আল্লাহর নির্ধারণ থেকে আল্লাহর নির্ধারণের দিকেই পালাচ্ছি।"

সূত্র Quarantine – Ragusa and Venice, 1377 · WHO – *International Health Regulations* (2005)

রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী

11 রোমানরা পরাজিত হয়েছে — আর তারাই জয়ী হবে

আলিফ লাম মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে সবচেয়ে নিচু ভূখণ্ডে, আর তারা তাদের পরাজয়ের পর জয়ী হবে কয়েক বছরের মধ্যেই।

সূরা আর-রূম — আয়াত 1-4

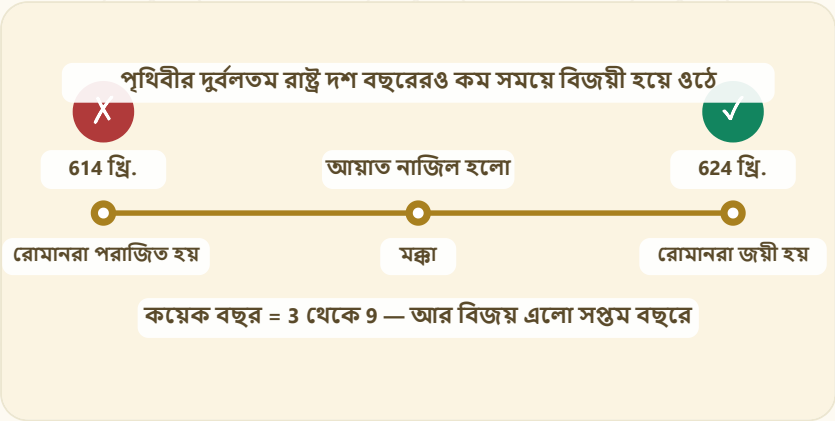

মক্কায় নাজিল হওয়া এক সংবাদ, হাজার হাজার মাইল দূরে চলা এক যুদ্ধ নিয়ে

সহজ কথায়

রোমানরা এমন চূর্ণ পরাজয়ে যুদ্ধ হারল যে মানুষ ধরে নিল তারা শেষ। তখন নাজিল হলো এক আয়াত: **রোমানরা কয়েক বছরের মধ্যেই জয়ী হবে**। আর তা ঘটল সাত বছর পরে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

614 খ্রিস্টাব্দে পারসিকরা রোমানদের নিদারুণভাবে চূর্ণ করে: তারা নেয় সিরিয়া ও জেরুজালেম, তারপর 618 থেকে 621 সালের মধ্যে মিসর, আর বন্দি করে নিয়ে যায় পবিত্র ক্রুশ। রোমান রাষ্ট্র তখন পূর্ণ ধসের কিনারায় — শূন্য কোষাগার, চূর্ণ সেনাবাহিনী, ভেতরে বিদ্রোহ। পৃথিবীর কেউই তার ফিরে আসার উপর বাজি ধরছিল না। আর মক্কার মুশরিকরা আবু বকরের সঙ্গে বাজি ধরেছিল যে আয়াতটি মিথ্যা — তখনো বাজি ধরা নিষিদ্ধ হয়নি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

622 সালে হিরাক্লিয়াস পাল্টা অভিযানে বেরিয়ে সে বছরেরই হেমন্তে শাহরবারাজকে হারান, তারপর **624 সালে গানজাকে** খসরুর বাহিনী ভেঙে দেন — সেটি বদরেরই বছর, যেমন পরের আয়াত বলেছে: "আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে।" আর **627 সালের ডিসেম্বরে** মসুলের কাছে নিনেভের যুদ্ধে পারসিক বাহিনীকে চূর্ণ করেন, এরপর 628 সালে খসরুকে ফেলে দেন ও ক্রুশ ফিরিয়ে আনেন। এসব লিপিবদ্ধ আছে বাইজেন্টাইন, পারসিক ও সিরিয়াক সূত্রে, ইসলামি সূত্র থেকে স্বাধীনভাবেই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি কোনো প্রজ্ঞাবাক্য নয়, বর্ণনাও নয় — এটি **বিষয় ও মেয়াদে নির্দিষ্ট এক ভবিষ্যদ্বাণী**, আর তা এসেছে যার পক্ষে বলা হচ্ছে তার জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তে। আরবিতে মেয়াদের জন্য ব্যবহৃত শব্দটি তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে বাঁধা — অর্থাৎ বন্ধ এক জানালা, যা মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল। দশ বছর বিজয় ছাড়া কেটে গেলে গোটা দাওয়াতই বিরোধীদের সামনে ধসে পড়ত। আর তার চেয়েও সূক্ষ্ম: "**সবচেয়ে নিচু ভূখণ্ডে**" — যুদ্ধটি হয়েছিল মৃত সাগরের অঞ্চলে, যা **এই গ্রহের সবচেয়ে নিচু শুকনো ভূমি** (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 430 মিটার নিচে) — এমন এক ভৌগোলিক সত্য, যা মাপা হয়নি ঊনবিংশ শতকের আগে।

সূত্র Kaegi – *Heraclius: Emperor of Byzantium* · Battle of Nineveh, 627 CE

ভূগোল

12 “সর্বনিম্ন ভূমিতে” — গ্রহের সবচেয়ে নিচু স্থলভাগ

আলিফ লাম মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে সর্বনিম্ন ভূমিতে, আর তারা তাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে।

সূরা আর-রূম — আয়াত 1-3

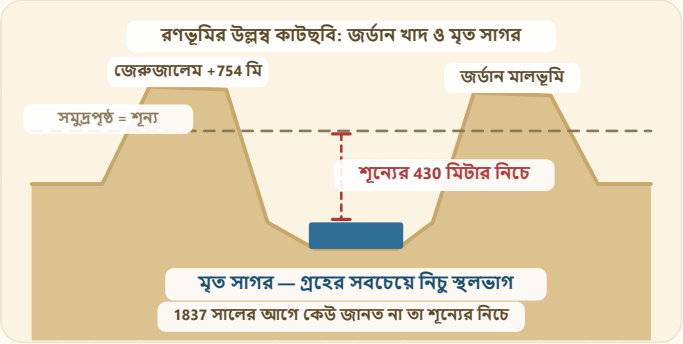

গ্রহের একমাত্র সেই জায়গা, যেখানে শব্দটি তার দুটি অর্থেই মিলে যায়

সহজ কথায়

আয়াতটি শুধু বলেনি “রোমকরা পরাজিত হয়েছে” — জায়গাটিও নির্দিষ্ট করেছে: **“সর্বনিম্ন ভূমিতে”**। আরবি শব্দ *আদনা* দুটি অর্থ বহন করে: **সবচেয়ে নিকটবর্তী**, আর **সবচেয়ে নিচু**। আর সেই যুদ্ধ ঘটেছিল এমন এক অঞ্চলে, যা সত্যিই **গোটা পৃথিবীপৃষ্ঠের সবচেয়ে নিচু উন্মুক্ত স্থলভাগ** — মৃত সাগরের চারপাশের জর্ডান চ্যুতি-উপত্যকা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সপ্তম শতাব্দীতে কারও কাছেই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কোনো জায়গার উচ্চতা জানার উপায় ছিল না। চোখ তা দেখায় না, আর উপত্যকায় নেমে আসা পথিক দেখে একটি নিচু উপত্যকা, ঠিক যেমন নিচু উপত্যকা সে ইয়েমেন, ওমান ও পারস্যে আগেই দেখে এসেছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা মাপা তখনও এক অজাত বিজ্ঞান: তার জন্য দরকার ব্যারোমিটার (যা 1643 সালের আগে উদ্ভাবিতই হয়নি) কিংবা উপকূল থেকে টেনে আনা ত্রিকোণমিতিক জরিপ। আর কারও মাথায়ই আসেনি যে শুকনো ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠের **নিচে** থাকতে পারে, আর তবু পানিতে ডুবে যায় না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1837 সালের মার্চে পর্যটক **মুর ও বিকি** পানির স্ফুটনাঙ্ক দিয়ে অঞ্চলটি মাপার চেষ্টা করেন, আর যে ফল বেরিয়ে আসে তা ভূগোলবিদদের চমকে দেয়: জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠের **নিচে**। এরপর লেফটেন্যান্ট **সাইমন্ডস** 1841 সালে ত্রিকোণমিতিক জরিপে মাপেন, আর আমেরিকান **লিঞ্চ** অভিযান মাপে 1848 সালে।

আজকের সংখ্যাটি: মৃত সাগরের পৃষ্ঠ প্রায় **সমুদ্রপৃষ্ঠের 430 মিটার নিচে**, আর এটিই **গোটা পৃথিবীপৃষ্ঠের সবচেয়ে নিচু উন্মুক্ত বিন্দু** — কোনো কিছুই এর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এটি মৃত সাগর চ্যুতির অংশ, যা মহা চ্যুতি-ব্যবস্থার উত্তর শাখা।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, আয়াতটির উপর জায়গার নাম বলার কোনো বাধ্যবাধকতাই ছিল না। আসন্ন বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী তা ছাড়াই পূর্ণ। তাই একটি ভৌগোলিক শর্ত জুড়ে দেওয়া মানে **মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ানো**, বিশ্বাস করানোর সম্ভাবনা বাড়ানো নয় — আর যে মানুষ কোনো বাণী বানিয়ে তোলে, সে এর উল্টোটাই করে।

তারপর দেখুন, শব্দটির প্রথম অর্থ — “আরব থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী ভূমি” — নিজে থেকেই সঠিক ও যথেষ্ট; বাণীর কোনো কিছুই দ্বিতীয় অর্থের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থটিও **সত্য, আর এমনভাবে সত্য যাতে গ্রহের আর কোনো জায়গার ভাগ নেই**। দুটি অর্থের এক বিন্দুতে মিলে যাওয়া এমন কিছু নয় যার হিসাব কেউ কষে রাখে।

আর এখানে একটি সীমা বলে রাখা উচিত: প্রথম যুগের তাফসিরকারেরা একে নিকটবর্তিতা ধরেই পড়েছেন, নিচুতা নয়, কারণ নিচুতা তাঁদের জানাই ছিল না — আর এটিই তো সাক্ষ্য: **অর্থটি বাণীর ভেতরে ছিল মানুষের হাতে তা মাপার কোনো যন্ত্র আসার আগেই**। আর ভবিষ্যদ্বাণীটি নিজে — কয়েক বছরের মধ্যে বিজয় — নিজের পায়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আর এই বইয়ে তার নিজস্ব একটি পৃষ্ঠা আছে।

সূত্র The Dead Sea – the lowest land on earth · Moore & Beke (1837) – the first measurement of the depression · Lt. John Symonds – the 1841 trigonometric survey · NASA Earth Observatory – the Dead Sea

স্নায়ুবিজ্ঞান

13 মিথ্যাবাদী, পাপী এক ললাট

কখনোই নয়! সে যদি বিরত না হয়, আমি অবশ্যই তাকে ললাট ধরে টেনে নিয়ে যাব
মিথ্যাবাদী, পাপী এক ললাট।

সূরা আল-আলাক — আয়াত 15-16

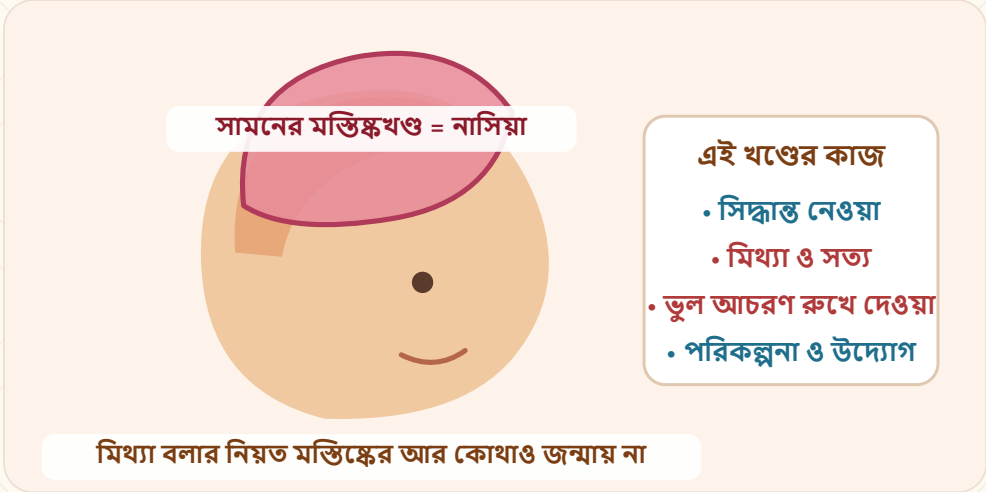

কার্যকরী প্রতিচ্ছবি দেখায়, মিথ্যা বলার মুহূর্তে সামনের মস্তিষ্কখণ্ড সক্রিয় হয়ে ওঠে

সহজ কথায়

"নাসিয়া" মানে মাথার একেবারে সামনের দিকটা। আর কুরআন তাকেই বলেছে "মিথ্যাবাদী, পাপী" — অর্থাৎ **মিথ্যা আর অপরাধ ঠিক এই জায়গা থেকেই বেরোয়**। স্নায়ুবিজ্ঞান এটিই প্রমাণ করেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মাথার কোনো নির্দিষ্ট অংশের সঙ্গে মিথ্যা বলার মতো নৈতিক কাজের যোগ তখন জানাই ছিল না। দার্শনিকেরা তো মূল কথাতেই একমত ছিলেন না: অ্যারিস্টটল চিন্তার কেন্দ্র রেখেছিলেন **হৃৎপিণ্ডে**, মস্তিষ্কে নয়। আর মস্তিষ্কের কোন অঞ্চলের কী কাজ, তা নির্ধারণের কাজ শুরুই হয়নি ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স — যা কপালের ঠিক পেছনেই থাকে — সিদ্ধান্ত নেওয়া, পরিকল্পনা করা আর আচরণ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র। কার্যকরী এমআরআই গবেষণা দেখায়, **ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ঠিক এই অঞ্চলটিকেই সক্রিয় করে**, কারণ তাতে সত্যকে চেপে রেখে তার বদলে আরেকটি কিছু বানিয়ে তুলতে হয়। আর এই অঞ্চল নষ্ট হলে মানুষ নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলে — যেমন 1848 সালের বিখ্যাত ফিনিয়াস গেজের ঘটনায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই সম্বন্ধের সূক্ষ্মতাটুকু লক্ষ করুন। আয়াত বলেনি "মিথ্যাবাদী পাপী ব্যক্তির ললাট" — অর্থাৎ ললাটের মালিকের কথা বলেনি। বরং **ললাটটিকেই** মিথ্যাবাদী ও পাপী বলেছে, ফলে কাজটিকে ব্যক্তির নয়, অঙ্গেরই কাজ বানিয়ে দিয়েছে। এ তো কাজের জায়গাটিকে শারীরবৃত্তীয়ভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া। আর আরও বেশি লক্ষণীয়: আয়াতে যাকে উদ্দেশ করা হচ্ছে, তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে তার সবচেয়ে সম্মানের জিনিসটিতে — অথচ নাম করে বলা হলো না তার হৃদয়, না তার জিহ্বা; বলা হলো তার মাথার সামনের দিক: মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত আর মিথ্যার কেন্দ্র।

সূত্র Harlow – the case of Phineas Gage · Kandel et al. – *Principles of Neural Science*

কীটতত্ত্ব

14 কর্মী মৌমাছি... সবই স্ত্রী

আর আপনার রব মৌমাছিকে ওহি দিলেন: পাহাড়ে ঘর বানাও ◌ তারপর সব ফল থেকে খাও, আর তোমার রবের সহজ করে দেওয়া পথে চলো

সূরা আন-নাহল — আয়াত 68-69

মধুরস সংগ্রহ করতে আর মোম গড়তে আপনি যে মৌমাছি দেখেন, তার প্রতিটিই স্ত্রী

সহজ কথায়

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ মৌমাছিকে যত নির্দেশ দিয়েছেন, আরবিতে তার সবই এসেছে **স্ত্রীবাচক রূপে**: "বানাও", "খাও", "চলো" — তিনটি ক্রিয়াই স্ত্রীলিঙ্গে। আর বিজ্ঞান বলে: যারা ঘর বানায়, সংগ্রহ করে আর মধু তৈরি করে, সেই মৌমাছিরা **সবাই স্ত্রী**, একটি পুরুষও নেই।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীন দুনিয়ায় প্রচলিত ধারণা ছিল, মৌচাকের প্রধান একজন **পুরুষ রাজা** — অ্যারিস্টটল স্পষ্ট ভাষায় তা-ই লিখেছেন এবং তাকে নাম দিয়েছেন "রাজা"; ইউরোপীয়রাও শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁকে অনুসরণ করে একে King Bee বলে এসেছে। মৌচাকের প্রধান যে স্ত্রী, তা প্রমাণিত হয়নি 1668 সাল পর্যন্ত, ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ইয়ান সোয়ামারডামের হাতে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মৌচাকে তিনটি শ্রেণি: একজন **স্ত্রী রানি**, হাজার হাজার **স্ত্রী কর্মী** — এরাই মোম গড়ে, মধুরস সংগ্রহ করে, মধু বানায়, পাহারা দেয় আর পরিষ্কার রাখে — আর কয়েকশো **পুরুষ**, যাদের একমাত্র কাজ রানিকে নিষিক্ত করা, তারপর তারা মরে যায় কিংবা তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পুরুষ মৌমাছি খাবারের খোঁজে বেরোয় না, ঘর বানায় না, আর মধু তৈরিতে তার কোনো ভূমিকাই নেই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

পরপর তিনটি ক্রিয়ায় স্ত্রীবাচক রূপ পুরোপুরি ধরে রাখা — এমন এক ভাষায়, যেখানে দুই লিঙ্গ একসঙ্গে থাকলে পুরুষবাচক রূপই প্রাধান্য পায় — কোনো ব্যাকরণগত কাকতালীয়তা নয়। বরং নির্দিষ্টতা আরও সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে: এই তিনটি কাজই হুবহু **স্ত্রী কর্মী মৌমাছির** কাজ — ঘর বানানো, ফল-ফুলে চরে বেড়ানো, আর পথ ধরে যাওয়া-আসা। গোটা প্রজাতিকে বোঝানো উদ্দেশ্য হলে পুরুষবাচক বহুবচনই আসত। আর এ কথা সেদিনকার দুনিয়ার সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষেরা যা বিশ্বাস করতেন, তার ঠিক উল্টো।

সূত্র Aristotle – *Historia Animalium* · Jan Swammerdam – the ruler of the hive is female

ইন্দ্রিয়

15 শ্রবণ আগে, দৃষ্টি পরে — প্রতিবারই

আর তিনিই আপনাদের জন্য শ্রবণ, দৃষ্টি ও হৃদয় বানিয়েছেন, যাতে আপনারা কৃতজ্ঞ হন।

সূরা আন-নাহল — আয়াত 78

কান কাজ করছে

সপ্তাহ 24

চোখ কাজ করছে

সপ্তাহ 28

শ্রবণ দৃষ্টির চার সপ্তাহ আগে পূর্ণ হয়

গোটা কুরআনে মানুষ সৃষ্টির প্রসঙ্গে দৃষ্টি একবারও শ্রবণের আগে আসেনি

সহজ কথায়

মানুষ সৃষ্টির প্রসঙ্গে আর তার উপলব্ধির যন্ত্রগুলোর উল্লেখে কুরআনে দৃষ্টি শ্রবণের আগে আসেনি **একটিবারও**। আর বিজ্ঞান বলে: গর্ভস্থ শিশুর কান কাজ করে ও শোনে, তার চোখ কাজ শুরু করার কয়েক মাস আগেই।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

চোখই সেই ইন্দ্রিয়, যাকে প্রতিটি মানুষ সহজাতভাবেই আগে রাখে: “নিজের চোখে দেখেছি” কথাটি “শুনেছি”-র চেয়ে জোরালো, আর চাক্ষুষ সাক্ষ্য শোনা খবরের উপরে। সব ভাষাতেই স্বাভাবিক ক্রম শুরু হয় দৃষ্টি দিয়ে। আর গর্ভের শিশু যে আদৌ শোনে, তা-ই তো জানা ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কানের কক্লিয়ার গঠন সম্পূর্ণ হয় মোটামুটি বিংশ সপ্তাহে, আর শব্দে গর্ভস্থ শিশুর সাড়া প্রমাণিতভাবে ধরা পড়ে **চব্বিশতম সপ্তাহ** থেকে। অন্যদিকে রেটিনা ও দৃষ্টিপথ কাজের উপযোগী হয় না **আটাশতম সপ্তাহের** আগে। আর নবজাতক জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের কণ্ঠ চিনে নেয়, অথচ কয়েক মাস না গেলে স্পষ্ট দেখতেই পায় না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

মুজিজা কোনো একটি জায়গায় নয়, বরং **পূর্ণ ধারাবাহিকতায়**। ক্রমটি যদি কাকতালীয় হতো, তবে তেরোটি জায়গার অন্তত একটিতে তা বদলে যেত। অথচ তা অটুট, যদিও সাধারণ ভাষাবোধের বিপরীতে যায়। বরং সূক্ষ্মতা আরও বাড়ে: এসব জায়গায় “শ্রবণ” এসেছে **একবচনে** আর “দৃষ্টি” এসেছে **বহুবচনে** — কারণ শ্রবণ একটিমাত্র ইন্দ্রিয়, যা সব দিক থেকে একই ধরনের অনুভূতি গ্রহণ করে; অথচ দুটি চোখ দুটি আলাদা ছবি তৈরি করে, যা মস্তিষ্কে মিলিয়ে নেওয়া হয়।

সূত্র Moore & Persaud – *The Developing Human* · *Britannica* – “Prenatal development”

16

কলাবিজ্ঞান

ব্যথার বাস চামড়ায়

যতবার তাদের চামড়া পুড়ে পাকা হয়ে যাবে, ততবার আমি তাদের বদলে দেব অন্য চামড়া, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ নেয়।

সূরা আন-নিসা — আয়াত 56

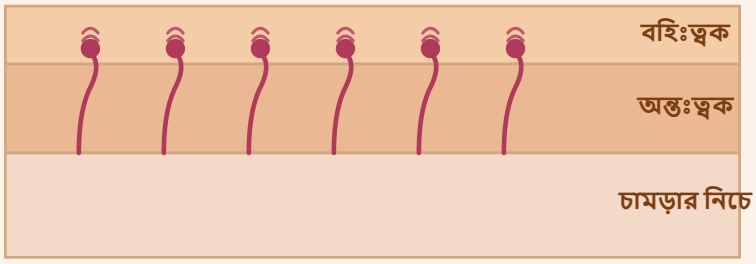

ব্যথার সব গ্রাহক চামড়াতেই — পুড়ে গেলে অনুভূতি শেষ

তৃতীয় মাত্রার গভীর পোড়ায় ব্যথা হয় না — কারণ ব্যথার গ্রাহকগুলোই পুড়ে গেছে

সহজ কথায়

ব্যথার গ্রাহক সারা দেহে ছড়ানো, কিন্তু সবচেয়ে ঘন হয়ে থাকে **চামড়ায়**; দেহের আর কোনো অঙ্গে এত বেশি নেই। তাই চামড়া যখন গভীরভাবে পুড়ে যায়, সেই জায়গায় ব্যথার অনুভূতিই থেমে যায়। আর আয়াতটি চামড়া বদলে দেয়, যাতে অনুভূতি চলতে থাকে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ব্যথাকে ভাবা হতো গোটা দেহের একটি সাধারণ অনুভূতি, কিংবা হৃদয়ের বা আত্মার অনুভূতি। জানা ছিল না যে তার **বিশেষ স্নায়ু-গ্রাহক** আছে, কিংবা সেই গ্রাহকগুলোর একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। ব্যথার গ্রাহকের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা আসেনি 1906 সালের আগে, চার্লস শেরিংটনের হাতে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ব্যথার গ্রাহক (Nociceptors) হলো মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত, যা কেন্দ্রীভূত থাকে **চামড়ার স্তরগুলোতে**। তৃতীয় মাত্রার পোড়ায়, যেখানে চামড়া তার পুরো পুরুত্বজুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, **রোগী পোড়া জায়গায় ব্যথার অনুভূতি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেন** — এটি একটি স্বীকৃত রোগনির্ণায়ক লক্ষণ, যা দিয়ে চিকিৎসকেরা পোড়ার গভীরতা আলাদা করেন। আর অনুভূতি ফিরিয়ে আনতে চামড়া প্রতিস্থাপন করতে হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কারণটি আয়াতেই বলা আছে: **"যাতে তারা শাস্তির স্বাদ নেয়"**। অর্থাৎ চামড়া বদলে দেওয়া শাস্তির বাড়তি কোনো অংশ নয়, বরং **সেই শাস্তির অনুভূতি বজায় থাকার শর্ত**। আর এর জন্য দুটি বিষয় একসঙ্গে জানা থাকতে হয়: ব্যথার অনুভূতির জায়গা সবার আগে চামড়া, আর চামড়া একবার পুড়ে পাকা হয়ে গেলে **অনুভূতি বন্ধ হয়ে যায়**। আয়াতটি কেবল ব্যথার বর্ণনা দেয়নি, তার উপরে এমন একটি যুক্তি দাঁড় করিয়েছে, যা এই চিকিৎসাগত সত্যটি না থাকলে টেকেই না।

সূত্র Sherrington – *The Integrative Action of the Nervous System*, 1906 · Kandel et al. – *Principles of Neural Science*

শরীরবিদ্যা

17 গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে বিশুদ্ধ দুধ

আর নিশ্চয়ই গবাদিপশুর মধ্যে আপনাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আমি আপনাদেরকে পান করাই তাদের পেটের ভেতরে যা আছে তা থেকে — গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে — বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

সূরা আন-নাহল — আয়াত 66

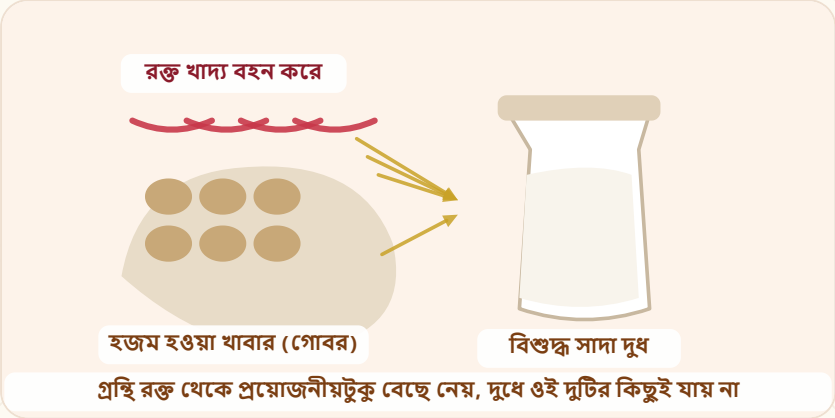

দুধ তৈরি হয় ওলানে, অন্ত্র থেকে রক্ত যেসব উপাদান বয়ে আনে তা দিয়ে

সহজ কথায়

আপনি যে সাদা নিখুঁত দুধ পান করেন, তা গাভির শরীরে তৈরি হয় অন্ত্রের পরিপাক হওয়া খাদ্য আর শিরায় বয়ে চলা রক্তের **মাঝখানের** এক জায়গায়। তবু তা বেরিয়ে আসে **বিশুদ্ধ** হয়ে — এর কোনোটির রংই তাতে লাগে না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

দুধ কীভাবে তৈরি হয়, তার কিছুই জানা ছিল না। ধারণা ছিল, মশকে যেমন পানি জমে, ওলানে দুধও তেমনি জমা হয়। আর তাকে পরিপাক হওয়া খাদ্য ও রক্তের সঙ্গে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে তার জায়গা **এই দুইয়ের মাঝখানে** নির্দিষ্ট করা — এ বিষয়ে কারও কোনো জ্ঞানই ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

খাদ্য অন্ত্রে পরিপাক হয়, তারপর তার উপাদানগুলো শোষিত হয়ে রক্তে মেশে। রক্ত সেগুলো বয়ে নিয়ে যায় ওলানের দুগ্ধগ্রন্থিতে; সেখানে আবরণী কোষগুলো রক্ত থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় শর্করা, অ্যামিনো অ্যাসিড, চর্বি ও লবণ তুলে নেয়, তারপর **একেবারে নতুন করে দুধ বানায়** আর তা নিঃসরণ করে। কাজেই দুধ না ছাঁকা রক্ত, না গলে যাওয়া খাদ্য; বরং এমন এক উৎপাদিত বস্তু, যার উৎপত্তির জায়গা পরিপাকতন্ত্র ও রক্তসংবহনের মাঝখানে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"মাঝখান থেকে" কথাটিই এখানে মুজিজার জায়গা। আয়াত বলেনি "গোবর ও রক্ত থেকে" — বললে দুধ হতো ওই দুটি থেকেই নিষ্কাশিত আর তাদের সঙ্গে মেশানো; বলেনি "গোবর ও রক্তের পরে"। বলেছে "এ দুইয়ের মাঝখান থেকে" — অর্থাৎ উৎপাদনের জায়গাটি **এই ধারাবাহিকতায় ওই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে**: পরিপাকের পরে ও রক্তের বহনের পরে, আর দুধ বেরোনোর আগে। তারপর উৎপন্ন বস্তুটিকে বলেছে **"বিশুদ্ধ"** — অর্থাৎ যা থেকে এসেছে তার কোনো চিহ্নই এতে নেই। এ এমন এক শারীরবৃত্তীয় পথের বর্ণনা, যা 1628 সালে রক্তসংবহন আবিষ্কারের আগে বোঝাই যায়নি।

সূত্র Harvey – *De Motu Cordis*, 1628 · Guyton & Hall – *Textbook of Medical Physiology*

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা

18 কারণ জানার আগেই হাত ধুয়ে নিন

তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগলে সে যেন পাত্রে হাত না ডোবায় যতক্ষণ না তিনবার তা ধুয়ে নেয়, কারণ সে জানে না তার হাত রাত কোথায় কাটিয়েছে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

"সে জানে না তার হাত রাত কোথায় কাটিয়েছে" — অদৃশ্যের উপর দাঁড়ানো কারণ

1	2	3	4
পাঁচবার ওজু	**হাত ধোয়া**	**মিসওয়াক**	**মুখ ধোয়া**
প্রতিদিন	ঘুম থেকে উঠে	প্রতি নামাজে	আর নাক ও চেহারা

হাত ধোয়াই চিকিৎসার একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

প্রতিটি মুসলিমের উপর দিনে পাঁচবার আরোপিত এক পবিত্রতার নিয়ম

সহজ কথায়

নবী ﷺ ঘুম থেকে উঠে খাবার স্পর্শ করার আগে হাত ধোয়ার আদেশ দিয়েছেন, আর তার কারণ হিসেবে বলেছেন এক বিস্ময়কর কথা: **"সে জানে না তার হাত রাত কোথায় কাটিয়েছে"** — অর্থাৎ এমন এক সম্ভাব্য ক্ষতি আছে যা **চোখে দেখা যায় না**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জীবাণুর কথা কোনোভাবেই জানা ছিল না। পরিচ্ছন্নতা ছিল **চেহারা ও গন্ধের** ব্যাপার: হাত দেখতে পরিষ্কার হলেই তা পরিষ্কার। স্পর্শে ছড়িয়ে পড়া গোপন দূষণ বলে কোনো ধারণাই ছিল না। বরং ইউরোপের চিকিৎসকেরা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ থেকে উঠে হাত না ধুয়েই প্রসূতির সেবায় যেতেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাত ধোয়া আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতিতে **সমগ্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা**, আর এটি একাই বছরে লক্ষ লক্ষ সংক্রমণ ঠেকায়। এটি আবিষ্কৃত হয় 1847 সালে, হাঙ্গেরীয় চিকিৎসক **সেমেলভাইস**-এর হাতে; তিনি লক্ষ করেছিলেন, চিকিৎসকদের হাত ধোয়ানোয় প্রসূতিদের মৃত্যুহার 18% থেকে নেমে 2%-এ এসেছে — **আর তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল, তিনি চাকরি থেকে বিতাড়িত হন এবং মানসিক হাসপাতালে মারা যান**। আর মুসলিম দিনে পাঁচবার ধুয়ে নেয় তার দুই হাত, মুখ, মুখগহ্বর, নাক, দুই বাহু ও দুই পা।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দলিলের জায়গাটি **কারণ বর্ণনায়**, আদেশে নয়। পরিচ্ছন্নতার আদেশ সম্পর্কে বলা যেতে পারে, এটি রুচি কিংবা অভ্যাসের ব্যাপার। কিন্তু "**সে জানে না তার হাত রাত কোথায় কাটিয়েছে**" কথাটি কারণ দেখাচ্ছে এমন এক বিষয় দিয়ে যা **অজানা ও অদৃশ্য** — অর্থাৎ হাত দেখতে পরিষ্কার হলেও বিপদ থেকেই যায়। আর এটিই সেই গোপন দূষণের ধারণার মর্মকথা, যার উপর গোটা প্রতিরোধমূলক চিকিৎসাবিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে। এর সঙ্গে যোগ করুন বাকি ব্যবস্থাটুকু: প্রতি নামাজে মিসওয়াক, অজুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া, পাত্র ঢেকে রাখার আদেশ, পানীয়ের মধ্যে নিশ্বাস ফেলার নিষেধ, বদ্ধ পানিতে পেশাব করার নিষেধ, আর গোসল ফরজ হওয়া। জীবাণুতত্ত্বের বারো শতাব্দী আগে রচিত এক পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যব্যবস্থা।

সূত্র Ignaz Semmelweis – childbed fever, 1847-1861 · WHO – *Guidelines on Hand Hygiene in Health Care*, 2009

উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ

19 আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক — দশ বছরের চ্যালেঞ্জ

আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন ও যা সে উপার্জন করেছে, কিছুই কাজে আসেনি। অচিরেই সে জ্বলন্ত শিখার আগুনে প্রবেশ করবে।

সূরা আল-মাসাদ — আয়াত 1-3

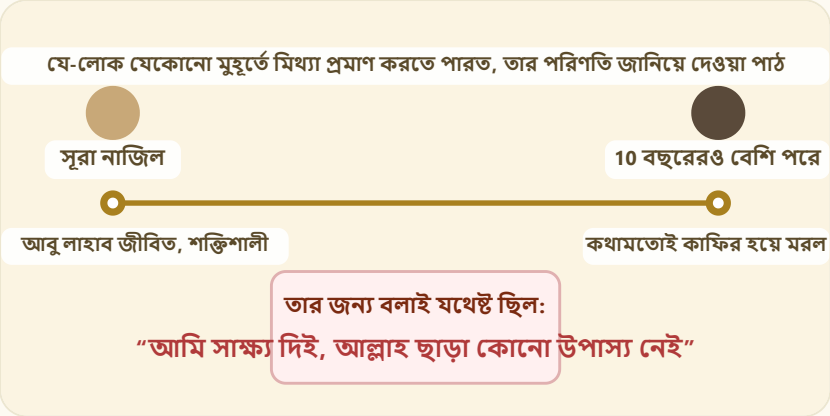

লেখা যেতে পারে এমন সবচেয়ে বিপজ্জনক বাক্য: যে এখনও মরেনি, তার বিষয়ে চূড়ান্ত রায়

সহজ কথায়

একটি সূরা নাযিল হলো, যাতে বলা হলো নবী ﷺ-এর চাচা — আবু লাহাব — **আগুনে প্রবেশ করবে**। অর্থাৎ সে কখনোই ইসলাম গ্রহণ করবে না। এরপর সে দশ বছরেরও বেশি বেঁচে ছিল, আর গোটা কুরআনকে ধসিয়ে দেওয়ার জন্য তার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট ছিল যে মিথ্যা করে হলেও সে কালিমা উচ্চারণ করে নিত — কিন্তু সে তা করেনি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আবু লাহাব ছিল এই দাওয়াতের সবচেয়ে কঠোর শত্রুদের একজন এবং তার ক্ষতি করার ক্ষমতায় সবার আগে; সে ছিল নবী ﷺ-এর চাচা এবং কুরাইশের একজন সরদার। আর আগামী দিনগুলোতে কোনো মানুষ কী হয়ে দাঁড়াবে, তা কারও পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না — কত কঠিন শত্রুই তো দীর্ঘ শত্রুতার পর ইসলাম গ্রহণ করেছে, যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও ইকরিমা ইবনে আবু জাহল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বদর যুদ্ধের কয়েক দিন পর আবু লাহাব মারা যায় — অর্থাৎ সূরাটি নাযিল হওয়ার দশ বছরেরও বেশি সময় পর — **কুফরির উপরেই**, এমন এক রোগে যা থেকে তার নিজের পরিবারই দূরে সরে গিয়েছিল। সিরাত ও ইতিহাসের সব কিতাবেই এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে, আর ইসলামের বিরোধীদের কেউও এ নিয়ে বিতর্ক করেনি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি এমন কোনো দূরবর্তী বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নয় যাতে কারও হাত দেওয়ার ক্ষমতা নেই — বরং এটি **এক জীবিত মানুষের পছন্দ সম্পর্কে, যে নিজের কানে তা শুনেছে**। আর সে-ই ছিল এই দাওয়াত ভেঙে দিতে সবচেয়ে উৎসুক। তার সামনে দশ বছরেরও বেশি সময় ছিল একটিমাত্র বাক্য বলার — ভান করে মিথ্যা বলেও — আর তাতেই এই বাণী ধসে পড়ত এবং দাওয়াত সেদিনই শেষ হয়ে যেত। **এই চ্যালেঞ্জ দশ বছরেরও বেশি সময় খোলা রেখে দেওয়া, তারপর তা ঠিক যেমন বলা হয়েছিল তেমনভাবেই মিলে যাওয়া — এ ঝুঁকি কোনো মানুষ নেয় না।** এর সঙ্গে যোগ করুন, সূরাটি তার স্ত্রীর উপরেও একই রায় দিয়েছিল, আর সেও কুফরির উপরেই মারা যায়। দুইয়ের মধ্যে দুই, একসঙ্গে মিলে গেল — মিথ্যা প্রমাণ করার দশ বছরেরও বেশি সুযোগের পর।

মিশরবিদ্যা

20 ইউসুফের যুগে “বাদশাহ”, মূসার যুগে “ফিরআউন”

আর বাদশাহ বলল: তাকে আমার কাছে আনো, আমি তাকে নিজের জন্য বেছে নেব …
আর ফিরআউন বলল: আমাকে ছাড়ো, আমি মূসাকে হত্যা করি।

সূরা ইউসুফ 54 — এবং সূরা গাফির 26

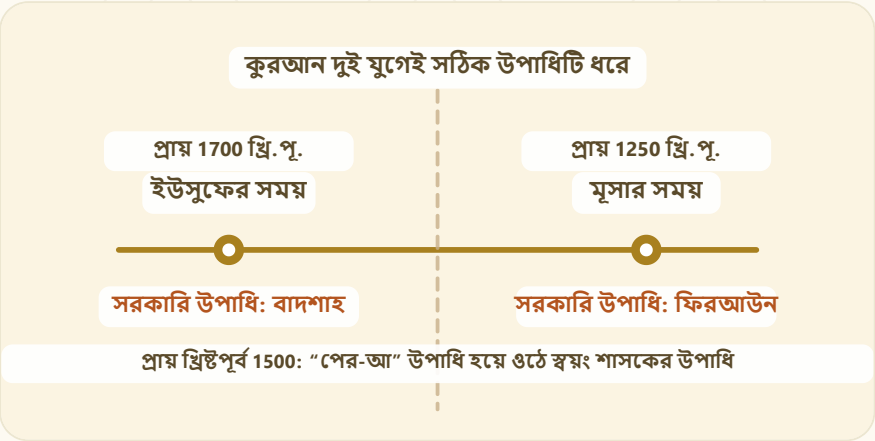

রাজকীয় উপাধির এই বদল এমন এক সত্য, যা হায়ারোগ্লিফ পাঠোদ্ধারের আগে জানা ছিল না

সহজ কথায়

কুরআন ইউসুফের যুগের মিশরের শাসককে বলে **“বাদশাহ”**, আর মূসার যুগের শাসককে বলে **“ফিরআউন”** — এবং কখনোই দুটিকে মিলিয়ে ফেলে না। মিশরবিদ্যা বলছে, এটিই হুবহু সঠিক।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরব উপদ্বীপে মিশরের শাসকদের উপাধি সম্পর্কে, কিংবা সেগুলো কখন বদলেছে সে সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না। গোটা অঞ্চলে চালু রীতি ছিল প্রতিটি মিশরীয় শাসককে নির্বিশেষে “ফিরআউন” বলা। এমনকি **তাওরাত নিজেই ইউসুফের শাসককে “ফিরআউন” বলে** আদিপুস্তকে বারবার।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

“ফিরআউন” শব্দটির মিশরীয় মূল **পের-আ (per-aa)**, যার অর্থ “মহান গৃহ” — অর্থাৎ প্রাসাদটি নিজেই, শাসকের ব্যক্তিসত্তা নয়। প্রাচীন ও মধ্য রাজ্যের গোটা সময়জুড়ে তা এমনই ছিল। **শাসকের নিজের** উপাধি হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়নি নতুন রাজ্যের আগে — মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব 15 শতকে তৃতীয় থুতমোসের শাসনকাল থেকে, আর এরপরই তা ছড়িয়ে পড়ে। ইউসুফের যুগ পড়ে তার আগে, আর মূসার যুগ তার পরে। আধুনিক মিশরবিদ্যার গ্রন্থে এটি স্থিরীকৃত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ধারাবাহিকতাই প্রমাণ। ব্যাপারটি কাকতালীয় হলে প্রায় ত্রিশটি স্থানে অন্তত একবার হলেও দুটি উপাধি মিলে যেত। কিন্তু কুরআন এই পার্থক্য পুরোপুরি বজায় রাখে। এর চেয়েও শক্তিশালী কথা হলো, এটি **সে যুগে আহলে কিতাবের মধ্যে প্রচলিত তাওরাতের পাঠের বিরুদ্ধে যায়** — অথচ সেটিই একমাত্র উৎস, যা থেকে নকল করার অভিযোগ তোলা হয়। বাহক যদি মানুষ হতো, সে ভুলটিও সঙ্গে করে বয়ে আনত। আর এই সংশোধন যে সঠিক, তা জানা গেছে এক হাজার বছরেরও বেশি পরে, হায়ারোগ্লিফ পাঠোদ্ধারের পর।

সূত্র Gardiner – *Egypt of the Pharaohs*, 1961 · *Britannica* – “Pharaoh”

21

ভ্রূণবিদ্যা

আলাকা: ঝুলন্ত এমন কিছু, যা রক্ত শুষে নেয়

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাকা থেকে।

সূরা আল-আলাক — আয়াত 2

তৃতীয় সপ্তাহের ভ্রূণ: তার আকার আর তার কাজ — দুটিই জোঁকের আকার ও কাজ

সহজ কথায়

আরবিতে "আলাক" শব্দটির তিনটি অর্থ: **ঝুলন্ত** কোনো বস্তু, রক্ত শুষে নেওয়া **জোঁক**, আর **জমাট রক্ত**। আর এই স্তরে ভ্রূণ তিনটি অর্থই একসঙ্গে ধারণ করে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

তৃতীয় সপ্তাহের ভ্রূণ কেউ দেখেনি। তার আকার দুই মিলিমিটারেরও কম, অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখাই যায় না। অ্যারিস্টটল ও গ্যালেন বলেছিলেন: ভ্রূণ গাছের শিকড়ের মতো নালি দিয়ে জরায়ুর সঙ্গে যুক্ত হয় আর মায়ের রক্তে পুষ্টি পায়। কিন্তু শুরুটা কীভাবে হয়, তা জানা ছিল না: **সে জরায়ুর আস্তরণে গেঁথে যায় আর তাতে ঝুলে থাকে**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ষষ্ঠ দিনে ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুর আস্তরণে প্রোথিত হয় আর তাতে **ঝুলে থাকে**। তারপর তার কোষগুলো মায়ের রক্তনালি খুঁড়ে ফেলে, ফলে রক্ত এসে তার চারপাশের ফাঁকগুলো ভরে দেয় — অর্থাৎ সে **আক্ষরিক অর্থেই রক্ত শুষে নেয়**। আর তৃতীয় সপ্তাহের ভ্রূণের অণুবীক্ষণিক ছবি এমন এক আকার দেখায়, যা বাঁক আর পাশের খণ্ডবিন্যাস পর্যন্ত জোঁকের সঙ্গে মিলে যায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটিমাত্র শব্দে তিনটি অর্থের মিলে যাওয়াই হলো মুজিজা। কেবল ঝুলে থাকা বোঝানো উদ্দেশ্য হলে বলা হতো "মুআল্লাকা", আর কেবল রক্ত বোঝানো উদ্দেশ্য হলে বলা হতো "দম"। কিন্তু "আলাকা" একই সঙ্গে বর্ণনা করে: **জায়গা** (দেয়ালে ঝুলন্ত), **খাদ্যগ্রহণ** (রক্ত শুষে নেওয়া), **আকার** (জোঁকের মতো), আর **উপাদান** (জমাট রক্তে ঘেরা)। অণুবীক্ষণ আবিষ্কারের এক হাজার বছর আগে এক নিরক্ষর মানুষের উপরে নেমে আসা একটি শব্দে চারটি অণুবীক্ষণিক সত্য।

সূত্র Moore & Persaud – *The Developing Human* (implantation)

22

প্লেট টেকটনিক্স

পর্বত চলছে, আর আপনি ভাবছেন তারা স্থির

আর আপনি পর্বতগুলোকে দেখে স্থির মনে করেন, অথচ সেগুলো মেঘের চলার মতোই চলছে।

সূরা আন-নামল — আয়াত ৪৪

গোটা মহাদেশ অতি ধীরে চলছে, আর তার উপরে যা কিছু আছে সবই তার সঙ্গে চলছে

সহজ কথায়

পর্বতগুলোকে আপনার মনে হয় যেন দাঁড়িয়ে আছে, নড়ছে না। অথচ সত্যি হলো, তারা **চলছে** — এত ধীরে যে আপনার চোখ ধরতে পারে না, ঠিক যেমন এক পলক তাকিয়ে আপনি মেঘকে সরতে দেখেন না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পৃথিবীর সব মানুষের কাছেই পর্বত ছিল চূড়ান্ত অটলতার প্রতীক। "পাহাড়ের মতো অটল" প্রতিটি ভাষারই প্রবাদ। কেউ দাবি করেনি যে তাদের নিচের জমিটাই সরে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

প্লেট টেকটনিক্স তত্ত্ব, যা বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে প্রতিষ্ঠিত: পৃথিবীর ভূত্বক বিশাল কতগুলো পাতে ভাগ করা, যেগুলো ভাসে ও পিছলে চলে, আর সঙ্গে নিয়ে চলে মহাদেশ ও পর্বতকে, বছরে কয়েক সেন্টিমিটার গতিতে। আজ এই গতি কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে মাপা হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উপমাটিই প্রমাণ: "আপনি সেগুলোকে স্থির মনে করেন" — অর্থাৎ তাদের স্থিরতা স্পষ্টভাবেই **চোখের ধাঁধা**। এরপর "মেঘের চলার মতো চলছে" — আর মেঘ চলে **আনুভূমিকভাবে, ধীরে, দলবদ্ধ হয়ে**; পড়েও না, লাফায়ও না। তাই আয়াতটি একটি সত্যিকারের গতির বর্ণনা দিয়েছে, সঙ্গে এ-ও বলে দিয়েছে কেন তা চোখে পড়ে না। আরও সূক্ষ্ম বিষয়: পর্বত একা চলে না, বরং চলে **তার চারপাশের সবকিছুকে সঙ্গে নিয়ে** — হুবহু মেঘের মতো।

সূত্র Wegener – *Die Entstehung der Kontinente und Ozeane*, 1915 · U.S. Geological Survey – understanding plate motions

23

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বিশ্বজগৎ প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে

আর আকাশ আমি নির্মাণ করেছি শক্তি দিয়ে, আর নিশ্চয়ই আমিই তা প্রসারিত করে চলেছি

সূরা আয-যারিয়াত — আয়াত 47

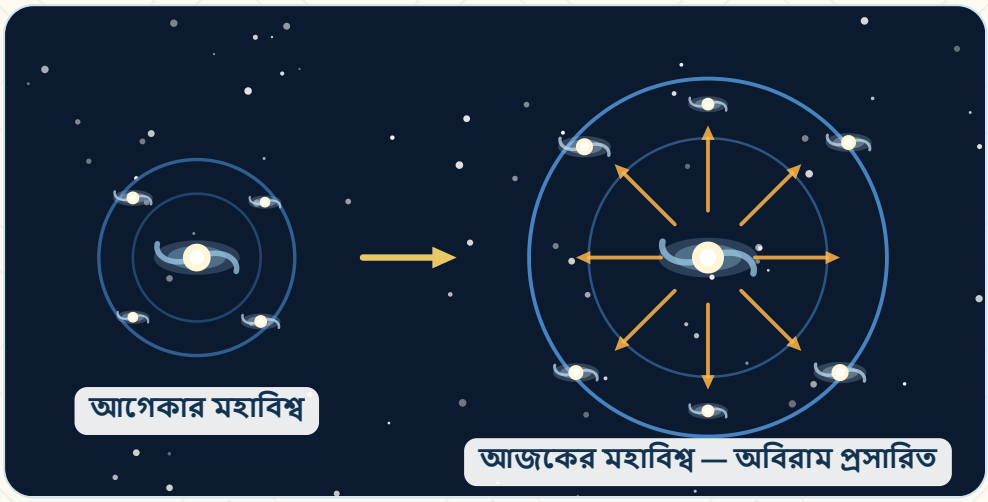

ফুলতে থাকা বেলুনের বিন্দুর মতো ছায়াপথগুলো দূরে সরে যাচ্ছে

সহজ কথায়

একটি বেলুনের কথা ভাবুন, যার গায়ে আপনি বিন্দু এঁকেছেন, তারপর সেটি ফোলালেন। প্রতিটি বিন্দু তার পাশের বিন্দু থেকে দূরে সরে গেল। বিশ্বজগৎ ঠিক এটিই করছে: আকাশ তার আয়ুর প্রতি সেকেন্ডে বড় হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষ — এমনকি বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরাও — বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বজগৎ **স্থির ও অপরিবর্তনীয়**, তার আকার একটাই, বাড়েও না কমেও না। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিশ্বাসই প্রবল ছিল; এমনকি আইনস্টাইন নিজে তাঁর সমীকরণে একটি কৃত্রিম ধ্রুবক যোগ করেছিলেন, যাতে বিশ্বজগৎকে স্থির থাকতে বাধ্য করা যায়!

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1929 সালে এডউইন হাবল লক্ষ করেন, দূরের ছায়াপথগুলোর আলো **লালের দিকে হেলে পড়ছে** — অর্থাৎ সেগুলো আমাদের কাছ থেকে পালাচ্ছে। যত দূরের, তত দ্রুত পালাচ্ছে। বিশ্বজগৎ প্রসারিত হচ্ছে। আর 1998 সালে ধরা পড়ে, এই প্রসারণ **ত্বরান্বিত হচ্ছে**; এর আবিষ্কারকরা 2011 সালে নোবেল পুরস্কার পান।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি "মূসিউন" — কর্তৃবাচক বিশেষণ, যা বোঝায় এমন কাজ যা **চলমান ও অবিরাম**; অতীত কালের "আমি প্রশস্ত করেছি" নয়। অর্থাৎ প্রসারণ এখনো চলছে। আরব মরুভূমির এক নিরক্ষর মানুষ, যাঁর কাছে দূরবিনও নেই, বর্ণালিমাপক যন্ত্রও নেই, এমন একটি বাক্য বলছেন যা গোটা মানবজাতির ঐকমত্যের বিরুদ্ধে যায় — তারপর ইতিহাসের বৃহত্তম জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এসে অক্ষরে অক্ষরে তা সত্য প্রমাণ করে। এটি কাকতালীয় বলেও ব্যাখ্যা করা যায় না, বুদ্ধিমত্তা দিয়েও নয়।

সূত্র Hubble (1929), PNAS 15 · Riess et al. (1998) – accelerating expansion · Nobel Prize in Physics 2011

জ্যোতির্বিজ্ঞান

24 সূর্য এক প্রদীপ — আর চাঁদ এক আলো

> কত বরকতময় তিনি, যিনি আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন, আর তাতে রেখেছেন একটি প্রদীপ ও একটি আলোকদাতা চাঁদ।
>
> **সূরা আল-ফুরকান — আয়াত 61**

শব্দের এক সূক্ষ্ম পার্থক্য, যা মেলে শতাব্দীর পর শতাব্দী অজানা থাকা এক ভৌত পার্থক্যের সঙ্গে

সহজ কথায়

সূর্য নিজে থেকেই আলো দেয়, কারণ সে জ্বলছে। চাঁদের নিজের কোনো আলোই নেই — সে অন্ধকার পাথর, যা সূর্যের আলো আমাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। আর কুরআন সূর্যকে সব সময় বলে **প্রদীপ**, **প্রজ্বলিত প্রদীপ**, **দীপ্তি**, আর চাঁদকে সব সময় বলে **আলো** বা **আলোকদাতা** — গোটা কিতাবে একটিবারের জন্যও বর্ণনা দুটি উল্টে যায় না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আলোর উৎস আর তার প্রতিফলকের মধ্যেকার পার্থক্য জানা ছিল না। বরং জাতিগুলো সূর্য ও চাঁদ দুটোকেই আলোকময় দুই দেবতা গণ্য করে পূজা করত, আর পুরাণ সমান মর্যাদায় তাদের ডাকত "দুই জ্যোতি" আর "আকাশের দুই চোখ" নামে। খালি চোখ এদের আলাদা করে না: দুটোই আকাশে উজ্জ্বল চাকতি, বরং চাঁদের দিকে তাকাতে আরাম বেশি, তাই তাকেই বিশুদ্ধতর আলো বলে মনে হয়। খ্রিষ্টপূর্ব চার শতাব্দী আগে অ্যানাক্সাগোরাস বলেছিলেন, চাঁদ মাটির মতো একটি বস্তু যা সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে — কিন্তু তা ছিল গ্রিক আসরের একটি তাত্ত্বিক মত, আরব উপদ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছায়নি, আর দূরবিন আসার আগে পর্যবেক্ষণেও প্রমাণিত হয়নি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সূর্য একটি তাপ-নিউক্লীয় চুল্লি: নিজের কেন্দ্রে **দেড় কোটি ডিগ্রি** তাপমাত্রায় সে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে বদলে দেয়, আর তাতেই জন্ম নেয় আলো ও তাপ। চাঁদ ঠান্ডা পাথুরে বস্তু, নিজের থেকে দৃশ্যমান কোনো আলোই সে বিকিরণ করে না; তার যা কিছু আমরা দেখি সবই ফিরে আসা সূর্যের আলো। তার **প্রতিফলন-ক্ষমতা (অ্যালবিডো) প্রায় 0.12** — অর্থাৎ তার উপর যা পড়ে তার প্রায় 12% সে ফিরিয়ে দেয়, বাকিটুকু গিলে নেয়; তার পৃষ্ঠ আসলে পিচঢালা পথের মতোই কালো। এ কারণেই তার দশা বদলায়: আমরা তার আলোকিত অংশটুকুই দেখি, এর বেশি নয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আরবি ভাষা শব্দ দুটিকে আলাদা করে: **সিরাজ** অর্থাৎ প্রদীপ নিজের আগুন নিজের ভিতরেই বহন করে, আর **নূর** অর্থাৎ আলো না জ্বলেই আলোকিত করে। দূরবিন আসার শত শত বছর আগেই তাফসিরকারগণ এই পার্থক্য স্পষ্ট করে লিখে গেছেন।

আর প্রমাণ কোনো একটিমাত্র আয়াতে নয় — তা কাকতালীয় হতে পারত — বরং **গোটা কিতাবজুড়ে ধারাবাহিকতায়**: সূরা নাবায় সূর্যের জন্য "প্রজ্বলিত প্রদীপ", সূরা নূহে "তিনি চাঁদকে সেগুলোর মধ্যে আলো বানিয়েছেন আর সূর্যকে বানিয়েছেন প্রদীপ", সূরা ইউনুসে "সূর্যকে দীপ্তি আর চাঁদকে আলো", সূরা ফুরকানে "একটি প্রদীপ ও একটি আলোকদাতা চাঁদ"। চারটি জায়গা, আর বণ্টন একটিবারও নড়ে না।

কাকতালীয় হলে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো করে নাজিল হওয়া তেইশ বছরের ওহিতে অন্তত একবার হলেও বর্ণনা দুটি জায়গা বদল করত। **কাকতাল এত নিয়মনিষ্ঠ হয় না** — আর বক্তার হাতে কোনটি জ্বলে আর কোনটি প্রতিফলিত করে তা জানার একটিমাত্র উপায়ও ছিল না।

সূত্র NASA – *Sun: Facts* (nuclear fusion) · NASA NSSDC – *Moon Fact Sheet* (geometric albedo 0.12) · الطبري – «جامع البيان» (الفَرقُ بين الضِّياء والنُّور)

সৃষ্টিতত্ত্ব

25 তারা ছিল একটিই বস্তু... তারপর আলাদা হলো

কাফিররা কি দেখে না যে আসমানসমূহ ও যমিন মিশে লেগে ছিল, অতঃপর আমি তাদের পৃথক করে দিলাম?

সূরা আল-আম্বিয়া — আয়াত 30

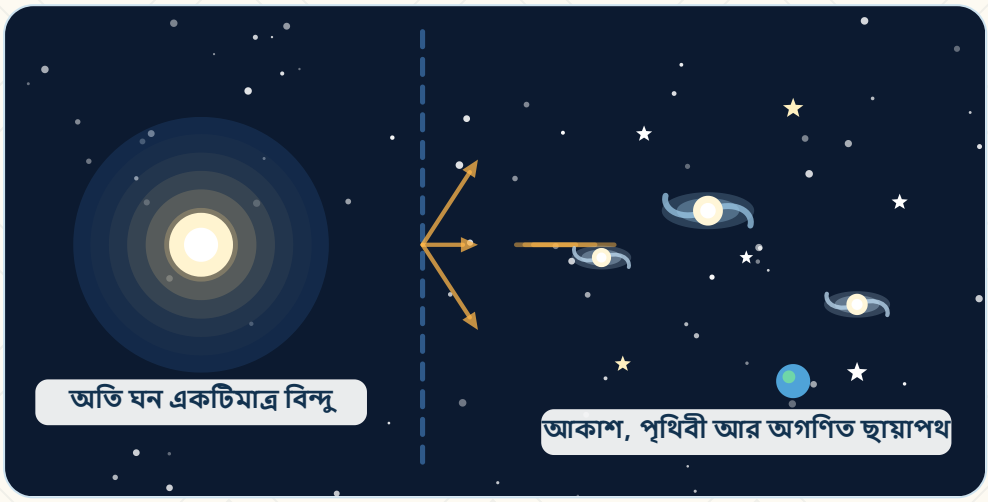

একটিমাত্র জোড়া লাগা পিণ্ড থেকে ছায়াপথে ভরা প্রসারমাণ বিশ্বজগৎ

সহজ কথায়

কুরআন বলছে: আসমান ও যমিন শুরুতে **পরস্পরে লেগে** একটিই বস্তু ছিল, তারপর আল্লাহ তাদের বিদীর্ণ করে আলাদা করে দিলেন। ঠিক যেমন একটিমাত্র বীজ ফেটে যায় আর তা থেকে বেরিয়ে আসে আস্ত গাছ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

"বিশ্বজগতের একটি সূচনা আছে" — এমন কোনো ধারণাই তখন ছিল না। বিশ্বাস ছিল, বিশ্বজগৎ **অনাদি, তার কোনো শুরু নেই**। আর যাঁরা কোনো উৎপত্তির কথা ভেবেছেন, তাঁরা ভেবেছেন যুদ্ধরত দেবতাদের উপকথা, একটিমাত্র বস্তুর বাস্তব বিচ্ছেদ নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব, যা আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত মডেল: গোটা বিশ্বজগৎ শুরু হয়েছিল **একটিমাত্র জোড়া লাগা, অতি-ঘন ও অতি-উত্তপ্ত অবস্থা** হিসেবে — মহাশূন্যের কোনো কোণে ফেটে পড়া কোনো গোলক নয় — তারপর স্থান নিজেই সর্বত্র একসঙ্গে প্রসারিত হয়ে তা বিদীর্ণ হলো। তিনটি প্রমাণে এটি নিশ্চিত হয়েছে: ছায়াপথগুলোর পরস্পর থেকে দূরে সরা; 1965 সালে আবিষ্কৃত "মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ", যা সেই বিস্ফোরণের অবশিষ্ট তাপ; এবং বিশ্বজগতে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের অনুপাত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আরবি "রাতক" শব্দের অর্থ এমন বস্তু, যা জোড়া লাগা ও বন্ধ; আর "ফাতক" অর্থ তাকে চিরে আলাদা করা। এটি এমন নিখুঁত বর্ণনা, যাতে অন্য ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা, আয়াতটি এটিকে পেশ করছে কাফিরদের প্রতি **চ্যালেঞ্জের দলিল** হিসেবে — "কাফিররা কি দেখে না" — অর্থাৎ এটি বাজি ধরছে যে একদিন তা দৃশ্যমান হবে। আর হয়েছেও, 1300 বছর পরে; এর দুই আবিষ্কারক 1978 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

সূত্র Penzias & Wilson (1965), Astrophysical Journal 142 · Nobel Prize in Physics 1978 · NASA / WMAP – Big Bang cosmology

ভূতত্ত্ব

26 পর্বত পৃথিবীতে গেঁথে দেওয়া খুঁটি

আমি কি পৃথিবীকে বিছানা বানাইনি, আর পর্বতগুলোকে খুঁটি?

সূরা আন-নাবা — আয়াত 6-7

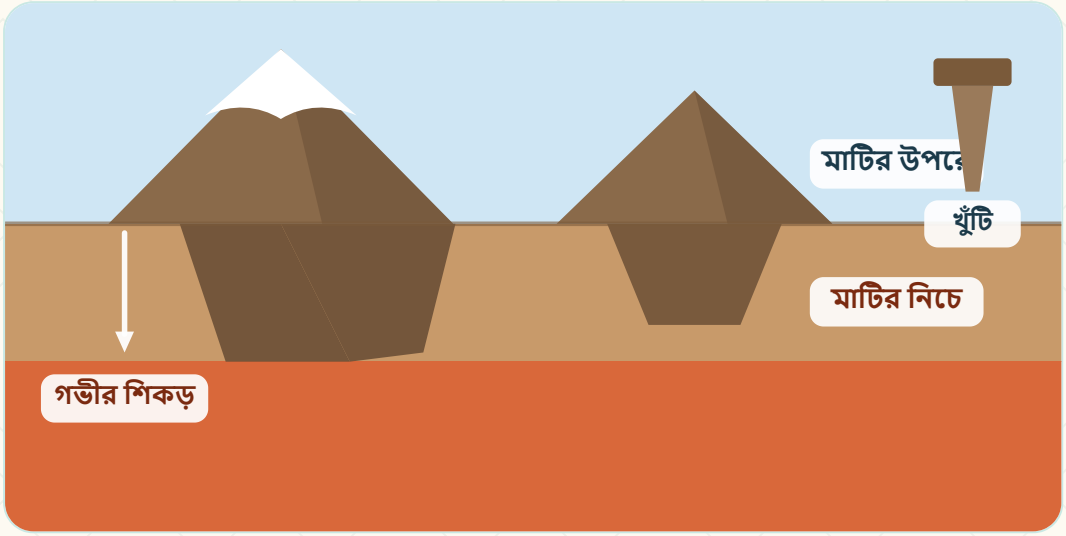

পর্বত তাঁবুর খুঁটির মতো: উপরে দেখা যায় সামান্য, আর মাটির নিচে গাঁথা অংশ তার বহুগুণ

সহজ কথায়

যে খুঁটি দিয়ে আপনি তাঁবু গাড়েন, তার সামান্য অংশ উপরে দেখা যায় আর বড় অংশটি মাটির ভিতরে গাঁথা থাকে। পর্বতও ঠিক তা-ই: তাদের **মাটির নিচে গভীর শিকড়** আছে, উপরে যা দেখছেন তার বহুগুণ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের চোখে পর্বত ছিল পাথরের একটি চাঁই, যা পৃথিবীর পৃষ্ঠের **উপরে** বসানো — টেবিলের উপর পাথরের মতো। তার নিচে যে আরও বিস্তার আছে, তা জানার কোনো উপায়ই কারও ছিল না, কারণ খোঁড়াখুঁড়ি অগভীর কুয়োর বেশি কখনো এগোয়নি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ভূতত্ত্ব একে বলে **পর্বতের শিকড়**: প্রতিটি পর্বত ভূত্বকের ভিতরে এমন গভীরতা পর্যন্ত ডুবে থাকে, যা সাধারণত তার দৃশ্যমান উচ্চতার প্রায় পাঁচ গুণ। এই শিকড়গুলোই **পর্বতকে ধরে রাখে ও তার ভার ভারসাম্যে রাখে**, ফলে ভূত্বক ম্যান্টলের উপর এমন এক উচ্চতায় ভাসে যা ঠিক করে দেয় তার নিজের পুরুত্ব ও ঘনত্ব — একেই বলা হয় সমস্থিতি (আইসোস্ট্যাসি)।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"খুঁটি" শব্দটি আকারের উপমাও নয়, ছুঁচালো আকৃতিরও নয়। আরবিতে খুঁটি এমন একটি জিনিস, যার পরিচয়ই তার কাজ দিয়ে: **এমন বস্তু যার বেশির ভাগটাই পোঁতা থাকে, যাতে তার উপরের জিনিসটাকে স্থির রাখে**। তাই আয়াতটি পর্বতকে দুটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যা তখন জানা ছিল না: পৃষ্ঠের নিচে বিস্তার, আর স্থির রাখা। আর এর আগে যা এসেছে তা লক্ষ করুন — পৃথিবীকে বলা হয়েছে "বিছানা", অর্থাৎ এমন কিছু যা নড়তে পারে — তাই খুঁটিগুলো আসে তাকে স্থির রাখতে।

সূত্র Airy (1855) – isostasy · U.S. Geological Survey – the earth's crust and mountain roots

27

সমুদ্রবিজ্ঞান

দুই সমুদ্র মেলে, অথচ মেশে না

তিনি দুই সমুদ্র ছেড়ে দিয়েছেন, তারা মিলিত হয়; উভয়ের মাঝে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।

সূরা আর-রহমান — আয়াত 19-20

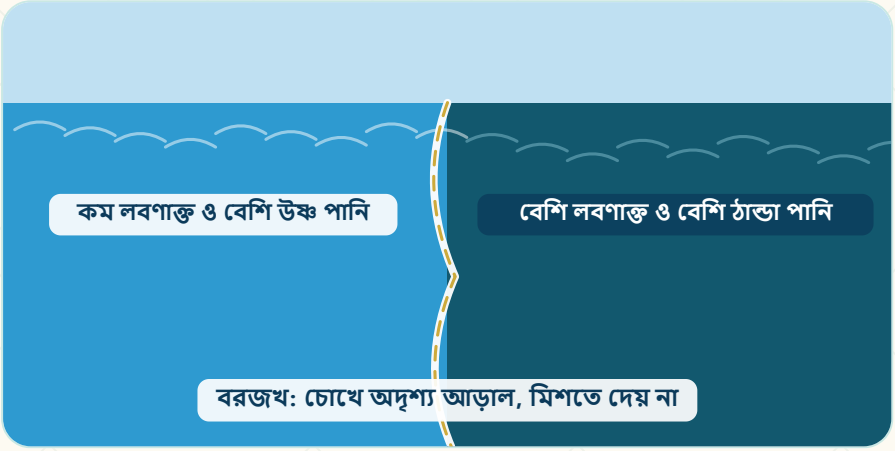

লবণাক্ততা ও তাপমাত্রায় আলাদা দুই পানি, আর তাদের মাঝে এমন এক আড়াল যা চোখ দেখে না, অথচ যন্ত্র পড়ে ফেলে

সহজ কথায়

দুটি ভিন্ন সমুদ্র যখন মেলে, তখন আপনি যেমন ভাবেন তেমন সঙ্গে সঙ্গে তারা মিশে যায় না। তাদের মাঝে **একটি আড়াল** থেকে যায়, যা একের পানিকে অন্যের পানি থেকে আলাদা রাখে, ফলে প্রতিটি সমুদ্র নিজের রং, নিজের লবণাক্ততা আর নিজের তাপ ধরে রাখে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রতিটি মানুষের কাছেই এটি স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে পানি পানির সঙ্গে মিললে তক্ষুনি মিশে যায় — যেমন দুই গ্লাস পানি মিশে যায়। পানি আর পানির মাঝে কোনো "দেয়াল" থাকতে পারে, এমন কল্পনাই কারও ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সমুদ্রবিজ্ঞান **সত্যিকারের পানি-আড়ালের** অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে, যেগুলোকে বলা হয় ফ্রন্ট ও হ্যালোক্লাইন: লবণাক্ততা, ঘনত্ব ও তাপমাত্রার পার্থক্য এমন এক সরু অন্তর্বর্তী অঞ্চল তৈরি করে যা **ঘনত্বে অত্যন্ত খাড়াভাবে ঢালু**, ফলে ভারী পানি হালকা পানির নিচ দিয়ে পিছলে যায়, আর দুটি মেশে কেবল তখনই যখন কোনো আলোড়ন ভারী পানিকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে উপরে তোলে। জিব্রাল্টার প্রণালীতে এটি মেপে দেখা হয়েছে: ভূমধ্যসাগরের বেশি লবণাক্ত, ভারী পানি প্রায় একশো বিশ মিটার গভীরতায় আটলান্টিকের **নিচ** দিয়ে গলে বেরিয়ে যায়, তারপর আরও নামতে থাকে। এমন এক আড়াল, যা চোখ দেখে না, অথচ যন্ত্র পড়ে ফেলে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি কেবল না-মেশার কথা বলেই থামেনি; কারণটিরও নাম বলেছে: **বরযখ** — আরবিতে বরযখ হলো দুই জিনিসের মাঝখানে দাঁড়ানো আড়াল। এরপর তার ফলটিও বলেছে: একটি অন্যটির উপর সীমা ছাড়ায় না। এ এমন এক ঘটনার বর্ণনা, যা বিংশ শতাব্দীতে লবণাক্ততা ও ঘনত্ব মাপার যন্ত্র আসার আগে আবিষ্কারই হয়নি। আর অন্য এক আয়াতে বর্ণনা আরও তীক্ষ্ণ: "তিনি উভয়ের মাঝে রেখেছেন এক অন্তরাল ও **এক দুর্ভেদ্য আড়াল**"।

সূত্র Sverdrup, Johnson & Fleming — *The Oceans*, 1942 · NOAA — ocean fronts and haloclines

পানির প্রকার

28 মিঠা ও সুস্বাদু — আর লোনা ও তিতা

আর তিনিই দুই সমুদ্রকে পাশাপাশি চলতে দিয়েছেন — এটি মিঠা, তৃষ্ণা মেটায়, আর ওটি লোনা, তিতা — এবং উভয়ের মাঝে রেখেছেন এক আড়াল ও এক দুর্ভেদ্য অন্তরাল।

সূরা আল-ফুরকান — আয়াত 53

নদীর মোহনায় মিঠা পানি লোনা পানির উপরে ভাসে স্পষ্ট এক সীমারেখা নিয়ে

সহজ কথায়

মিঠা পানির নদী যখন লোনা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, দুই পানি সঙ্গে সঙ্গে মেশে না। তাদের মাঝে থেকে যায় এমন এক **আড়াল**, যা কৃত্রিম উপগ্রহ স্পষ্ট দেখতে পায়, আর যা বিস্তৃত হয় কয়েক দশ কিলোমিটার।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সবার কাছেই পানি তো পানিই, আর সহজ বোধ বলে পানি পানির সঙ্গে মিশে যায়। জানা ছিল না যে মিঠা পানি লোনা পানির চেয়ে **কম ঘন**, আর কেবল এই পার্থক্যই দুটিকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেয় — মিঠা পানি উপরে ভাসে এমন এক স্তরে, যা মেশে অত্যন্ত ধীরে। আর এ দুইয়ের মাঝে যা আছে তাকে "দুর্ভেদ্য" আড়াল বলা — সাধারণ পর্যবেক্ষণে এর কোনো সমতুল্য নেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বড় বড় নদীর মোহনায় — আমাজন, কঙ্গো ও মিসিসিপি — মিঠা পানি সমুদ্রের ভেতরে কয়েক দশ কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়ে যায় **নিজের রং ও ঘনত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে**, আর বিভাজনরেখাটি মহাশূন্য থেকে দেখা যায়। এর কারণ ঘনত্ব, লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার পার্থক্য, যা তৈরি করে এক সরু অন্তর্বর্তী স্তর — যাকে বলা হয় **হ্যালোক্লাইন** — এবং তা মিশ্রণকে ভীষণ ধীর করে দেয়। মহাকাশচারীরা বারবার এই দৃশ্যের ছবি তুলেছেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই আয়াত আর সূরা আর-রাহমানের আয়াতের মধ্যে যে পার্থক্য, তা এতই সূক্ষ্ম যে কেবল জানা লোকই তা ধরতে পারেন। সেখানে দুটি সমুদ্রই লোনা, কেবল বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন, আর মাঝের বিভাজককে বলা হয়েছে একটিমাত্র শব্দে: বারযাখ, আড়াল। আর এখানে — যেখানে মিলন **মিঠা ও লোনার** মধ্যে — যোগ করা হয়েছে দ্বিতীয় একটি বিশেষণ: "**এক দুর্ভেদ্য অন্তরাল**", অর্থাৎ জোরালো, কঠোর এক নিষেধ। ভৌত কারণটি স্পষ্ট: মিঠা ও লোনা পানির ঘনত্বের পার্থক্য দুটি লোনা পানির পার্থক্যের চেয়ে **অনেক বেশি**, তাই বিভাজন আরও স্পষ্ট, আরও শক্ত। ঘটনার তীব্রতার সঙ্গে শব্দের তীব্রতা ঠিক মিলে গেছে।

সূত্র NOAA – estuaries, where fresh water meets the sea · Sverdrup, Johnson & Fleming – *The Oceans*, 1942

29

উচ্চতার শারীরবিদ্যা

যত উপরে উঠবেন, বুক তত চেপে আসবে

আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সংকীর্ণ ও দম-বন্ধ করে দেন, যেন সে আকাশে উঠে চলেছে।

সূরা আল-আনআম — আয়াত 125

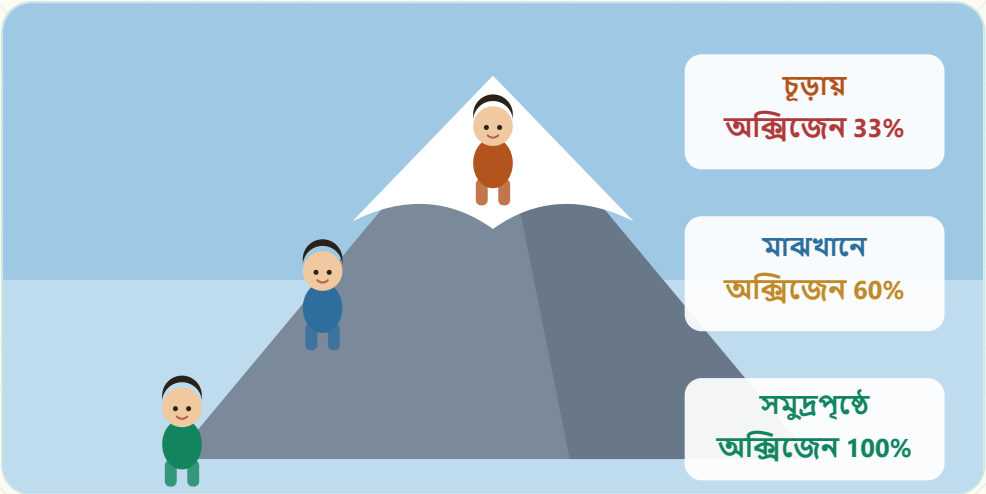

যত উপরে উঠবেন অক্সিজেন তত কমবে, শ্বাস সংকীর্ণ হবে আর কষ্ট বাড়বে

সহজ কথায়

খুব উঁচু কোনো পাহাড়ে উঠলে আপনি টের পাবেন, বুক চেপে আসছে আর শ্বাস নেওয়াটা পরিশ্রমের কাজ হয়ে গেছে। যত উপরে উঠবেন, বুক তত বেশি চেপে আসবে। কুরআন একে **উপমা** বানিয়েছে সেই মানুষের বুকের সংকীর্ণতার, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সেই পরিবেশে কোনো মানুষ বড়জোর সাধারণ এক পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠেছিল, আর উচ্চতার সঙ্গে শ্বাসকষ্টকে কেউ **ধাপে ধাপে** মেলায়নি। বরং বাতাসের যে ওজন বা চাপ বলে কিছু আছে, সেটিই জানা ছিল না; তোরিচেল্লি বায়ুচাপ মাপেন 1643 সালে গিয়ে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

যত উপরে উঠবেন, বায়ুচাপ তত কমবে আর রক্তে তত কম অক্সিজেন পৌঁছবে। 3,500 মিটারে তা সমুদ্রপৃষ্ঠের মানের প্রায় 60 শতাংশ, আর এভারেস্টের চূড়ায় প্রায় 33 শতাংশ। ফল হলো শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ আর মাথাব্যথা — যাকে বলা হয় **উচ্চতাজনিত অসুস্থতা**। এ কারণেই উড়োজাহাজে কেবিনের চাপ ধরে রাখার ব্যবস্থা বসানো হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটিমাত্র বাক্যাংশে তিনটি সূক্ষ্মতা। প্রথম: উপরে ওঠার সঙ্গে বুকের সংকীর্ণতাকে জুড়ে দেওয়া — এটিই নিজেই। দ্বিতীয়: "দম-বন্ধ" অর্থের শব্দটি সংকীর্ণতার উপর সংকীর্ণতা বোঝায় — অর্থাৎ তীব্রতায় একটি ক্রম। তৃতীয় এবং সবচেয়ে সূক্ষ্ম: "ওঠা" বোঝাতে যে আরবি ক্রিয়ারূপটি এসেছে তা তীব্রতাবাচক, যা নিছক উপরে ওঠা নয়, বরং **কষ্ট স্বীকার করে একটু একটু করে লড়াই করার** অর্থ দেয়। ব্যাকরণিক রূপটিই সেই ক্রম বহন করছে, আজ শরীরবিদ্যা যার বর্ণনা দেয়।

সূত্র Torricelli – the barometer, 1643 · John B. West – *High Life*, 1998

জলবায়ু ও বাতাস

30 গর্ভসঞ্চারী বাতাস — যা গাছ ও মেঘের বিয়ে দেয়

আর আমি বাতাসকে পাঠিয়েছি গর্ভসঞ্চারীরূপে, তারপর আকাশ থেকে পানি নামিয়ে তা তোমাদের পান করিয়েছি।

সূরা আল-হিজর — আয়াত 22

বাতাস গাছকে পরাগ দিয়ে গর্ভবতী করে, আর মেঘকে ধুলো ও তড়িৎ-আধান দিয়ে

সহজ কথায়

বাতাস শুধু জিনিস নাড়ে না — সে **বিয়ে দেয়**। সে এক ফুল থেকে আরেক ফুলে পরাগ বয়ে নেয়, যাতে ফল ধরে; আর ধুলো ও তড়িৎ-আধান বয়ে নেয় মেঘের কাছে, যাতে তারা বৃষ্টি ঝরায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বাতাস ছিল কেবল ঠেলা আর বয়ে নেওয়ার শক্তি, এর বেশি কিছু নয়: জাহাজ চালাত, ধুলো ওড়াত। তার যে **গর্ভসঞ্চারে** কোনো ভূমিকা আছে, তা জানা ছিল না; গাছেরও যে পুরুষ ও স্ত্রী আছে, সেটিই প্রমাণিত হয়নি 1694 সালের আগে — জার্মান বিজ্ঞানী কামেরারিউসের হাতে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বাতাসে পরাগায়ন হাজার হাজার উদ্ভিদ-প্রজাতির বংশবিস্তারের উপায় — গম, ধান, ভুট্টা, খেজুর আর পাইন। আর মেঘের ভেতরে: বাতাস বয়ে আনে ধুলো ও লবণের সেই **ঘনীভবন-কেন্দ্রক**, যেগুলোর চারপাশে জলীয় বাষ্প জমে ফোঁটা হয়; আর সে-ই মেঘের উপর ও নিচের মধ্যে তড়িৎ-আধান আলাদা করে দেয়, যা থেকে বিদ্যুৎ চমকায় আর বৃষ্টি নামে। ওই কেন্দ্রক ছাড়া মেঘ বৃষ্টিই ঝরায় না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আরবি শব্দটি এমন এক ক্রিয়া থেকে গড়া, ভাষায় যা **গর্ভসঞ্চার ও মিলনের** জন্যই নির্দিষ্ট — খেজুরগাছের হাতে-করা পরাগায়নের জন্য এই শব্দটিই চলত, যা আরবরা কেবল খেজুরের বেলাতেই জানত। সেই কাজটি **বাতাসের নিজের** দিকে আরোপ করা মানে এমন এক ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করা, যা তখন জানাই ছিল না। আরও সূক্ষ্ম: আয়াতটি গর্ভসঞ্চার আর তারপর বৃষ্টি নামাকে সঙ্গে সঙ্গে পরপর রেখেছে — অর্থাৎ বাতাস মেঘকেও গর্ভবতী করে, যাতে সে বৃষ্টি দেয়। আর এ-ই শব্দে শব্দে আধুনিক আবহাওয়াবিজ্ঞান।

সূত্র Camerarius – *De sexu plantarum epistola*, 1694 · *Britannica* – "Pollination"

আবহাওয়াবিজ্ঞান

31 আকাশে পাহাড়, আর তাতে শিলা

আর তিনি আকাশ থেকে, তাতে যে পাহাড় আছে তা থেকে, শিলা নামান, তারপর যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন।

সূরা আন-নূর — আয়াত 43

কিউমুলোনিম্বাস: বিশাল এক পিণ্ড, যা এমনভাবে খাড়া উঠে যায় যেন আকাশে একটি পাহাড়

সহজ কথায়

শিলা — বরফের দানা — যে কোনো মেঘ থেকে নামে না। নামে কেবল সেইসব বিরাট মেঘ থেকে, যেগুলো **আকাশে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে ওঠে**, আর যাদের উচ্চতা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড়ের কয়েক গুণ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মাটি থেকে মেঘকে দেখায় আনুভূমিকভাবে ছড়ানো একটি চাদরের মতো, পাহাড়ের মতো নয়। মেঘের উচ্চতা জানার কোনো উপায় ছিল না, আর মেঘ যে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার হয়, সে বোধও ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

শিলা তৈরি হয় কেবল **কিউমুলোনিম্বাস** মেঘেই: 8 থেকে 15 কিলোমিটার উঁচু খাড়া এক পিণ্ড — এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। তার ভেতরের ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ পানির ফোঁটাকে বারবার উপরে তুলে নেয়, সেখানে তা স্তরের পর স্তরে জমতে থাকে, শেষে এত ভারী হয় যে পড়ে যায়। এ কারণেই একটি শিলা চিরে ফেললে তার ভেতরে গাছের গুঁড়ির বলয়ের মতো বলয় দেখতে পাবেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"তাতে যে পাহাড় আছে তা থেকে শিলা" — এই কথাটি অল্প কয়েকটি শব্দে তিনটি তথ্য দেয়: মেঘের একটি **পাহাড়সদৃশ, খাড়া রূপ** আছে; শিলা থাকে তাদের **ভেতরে**, উপরে নয়; আর তা নামে **কেবল এগুলো থেকেই**, অন্য মেঘ থেকে নয়। এই নির্দিষ্টতাই আয়াতের সবচেয়ে সূক্ষ্ম অংশ, আর মাটিতে দাঁড়ানো কোনো মানুষের পক্ষে তা জানা অসম্ভব।

বংশগতিবিদ্যা

32 মিশ্রিত এক শুক্রবিন্দু

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; আর আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

সূরা আল-ইনসান — আয়াত 2

প্রথম কোষটি একটিমাত্র জিনিস নয়, বরং দুই পিতা-মাতা থেকে আসা দুটি অর্ধেকের মিশ্রণ

সহজ কথায়

মানুষের শুরু একটিমাত্র তরল থেকে নয় — বরং দুটি উপাদানের **মিশ্রণ** থেকে: অর্ধেক বাবার আর অর্ধেক মায়ের, যে দুটি মিশে গিয়ে একটি নতুন জিনিস হয়ে যায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, সন্তান তৈরি হয় কেবল পুরুষের তরল থেকে, আর মা কেবল **একটি পাত্র আর এক টুকরো জমি, যেখানে বীজ গজায়**। এ কথা অ্যারিস্টটলের লেখায় স্পষ্ট ভাষায় আছে, আর শতাব্দীর পর শতাব্দী চিকিৎসাশাস্ত্রে তা-ই চলেছে। নারীর ডিম্বাণু আবিষ্কৃতই হয়নি 1827 সালের আগে, কার্ল আর্নস্ট ফন বেয়ারের হাতে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নিষেক: 23টি ক্রোমোজোম বহনকারী একটি শুক্রাণু 23টি ক্রোমোজোম বহনকারী একটি ডিম্বাণুর সঙ্গে মিশে যায়, আর তৈরি হয় 46 ক্রোমোজোমের একটিমাত্র কোষ, যা গোটা মানুষটির উৎস। কাজেই প্রথম শুক্রবিন্দুটি দুটি সমান উপাদানের **প্রকৃত মিশ্রণ**, একক কোনো বস্তু নয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"**আমশাজ**" শব্দটি "মাশাজ"-এর বহুবচন; অভিধানে এর অর্থ — এমনভাবে মিশে যাওয়া মিশ্রণ, যে একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না। আর এটি একটি একবচন শব্দের ("নুতফা", একবচন) বিশেষণ — অর্থাৎ ওই একটি শুক্রবিন্দু নিজেই মিশ্রণসমূহ। এ কথা দুই হাজার বছর দুনিয়া শাসন করা অ্যারিস্টটলের মতকে শুধরে দেয়। আর অন্য এক আয়াতে বিবরণ আরও বাড়ে: মানুষ সৃষ্টি হয়েছে "সবেগে নির্গত পানি" থেকে, তারপর "শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা স্খলিত হয়" — আর কুরআন পুরুষ ও নারী হওয়ার পার্থক্য দেয় শুক্রবিন্দুর উপরে, জরায়ুর উপরে নয়।

সূত্র von Baer – *De ovi mammalium et hominis genesi*, 1827 · Moore & Persaud – *The Developing Human*

শারীরস্থান

৩৩ মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মাঝখান থেকে

> সুতরাং মানুষ দেখুক, তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে, যা বের হয় মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়গুলোর মাঝখান থেকে।
>
> **সূরা তারিক — আয়াত 5-7**

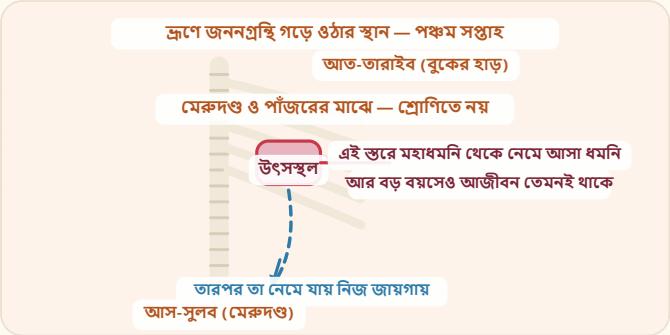

গ্রন্থিটি এখানেই জন্ম নেয়, তারপর নেমে যায়... আর তার ধমনি কখনোই সঙ্গে সরে না

সহজ কথায়

আয়াত বলছে, সৃষ্টির পানি বের হয় **মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মাঝখান থেকে** — অর্থাৎ **শিরদাঁড়া** আর **বুকের হাড়গুলোর** মাঝখান থেকে। আর ভ্রূণবিজ্ঞান বলছে, **প্রজনন-গ্রন্থি ঠিক এই জায়গাতেই তৈরি হয়**, তারপর নেমে যায় তার পরিচিত জায়গায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীন শারীরস্থান অঙ্গটিকে সেখানেই দেখত, যেখানে তাকে পাওয়া যেত। হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও তাঁদের পরবর্তীরা সৃষ্টির পানির উৎস খুঁজেছেন কখনো মস্তিষ্কে, কখনো শরীরের প্রতিটি অঙ্গে। কিন্তু তার উৎস **পিঠ ও বুকের মাঝখানে পেটের উপরের দিকের এক জায়গায় আটকানো** — এমন এক জায়গা, যার সঙ্গে বাইরে থেকে কোনো কিছুরই সম্পর্ক দেখা যায় না — এ কথা পর্যবেক্ষণ থেকে কোনোদিনই বেরিয়ে আসতে পারে না, কেননা অঙ্গটির জন্ম কেবল কয়েক মিলিমিটার লম্বা ভ্রূণেই দেখা যায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পঞ্চম সপ্তাহে প্রজনন-গ্রন্থিটি দেখা দেয় যাকে বলা হয় **মূত্র-জননাঙ্গীয় উঁচু ভাঁজ** (urogenital ridge) তার উপর; এটি পেটের পশ্চাৎ প্রাচীরের সঙ্গে লেগে থাকা সরু একটি পট্টি, অবস্থান বক্ষদেশের নিচের ও কটিদেশের উপরের কশেরুকার সমান উচ্চতায় — অর্থাৎ **ঠিক শিরদাঁড়া ও বক্ষপঞ্জরের মাঝখানে**। তারপর তা দীর্ঘ এক যাত্রায় নেমে যায় তার চূড়ান্ত জায়গায়।

আর **রেখে যাওয়া চিহ্নই চিরকালের জন্য উৎসের প্রমাণ**: তাকে পুষ্টি জোগানো ধমনিটি বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী পাশের শ্রোণি-রক্তনালি থেকে বের হয় না, বরং নামে **দ্বিতীয় কটি-কশেরুকার কাছে উদর-মহাধমনি থেকে** — যেখানে সে আগে ছিল। তার লসিকানালি ও স্নায়ুগুলোরও একই দশা। এ কারণেই তার টিউমার ছড়ায় পেটের উপরের দিকের গ্রন্থিতে, শ্রোণির গ্রন্থিতে নয় — আর এটি এমন এক ব্যবহারিক নিয়ম, যা প্রত্যেক ক্যান্সার-চিকিৎসক জানেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

থমকে দাঁড়ানোর মতো ব্যাপারটি হলো, **বর্ণনাটি চোখে যা দেখা যায় তার সঙ্গে মেলে না**। যিনি দেখে দেখে বর্ণনা করেন, তিনি সেই জায়গার কথাই বলেন যেখানে অঙ্গটিকে পান; জন্মের কয়েক মাস আগেই অঙ্গটি যে জায়গা ছেড়ে এসেছে, সেই জায়গার কথা নয়। আয়াতটি ইঙ্গিত করছে **উৎসের** দিকে, **অবস্থানের** দিকে নয় — আর এখানেই বিস্ময়।

আর এখানে একটি সীমা স্পষ্ট করে বলা দরকার: প্রাচীন মুফাসসিরগণ আয়াতটি বুঝেছেন "পুরুষের মেরুদণ্ড ও নারীর বুক" অর্থে, আর তা একটি সংগত ভাষাগত ব্যাখ্যা, যা ফেলে দেওয়ার নয়। আমরা দাবি করছি না যে শারীরস্থানগত ব্যাখ্যাই একমাত্র নির্ধারিত অর্থ, কিংবা কেবল তার উপরেই কিছু দাঁড় করাচ্ছি না। আমাদের কথা কেবল এটুকুই: **দুটি শব্দ অক্ষরে অক্ষরে সেই জায়গাটিই বর্ণনা করছে, তেরো শতাব্দী পরে ভ্রূণবিজ্ঞান যাকে ঐ পানির উৎস বলে প্রমাণ করেছে** — আর সেই জায়গাটি আজও প্রত্যেক জীবিত মানুষের শারীরস্থানে নিজের কথা ঘোষণা করে যাচ্ছে, এমন এক ধমনির পথে, যার ব্যাখ্যা এ ছাড়া দাঁড়ায় না যে অঙ্গটির শুরু ওখানেই হয়েছিল।

সূত্র Moore & Persaud – *The Developing Human* (the genital ridge) · The genital ridge – where the gonad first forms · The gonadal artery – still arising from the aorta at L2

34 নর ও নারী — নির্ধারণ করেন পিতা

আর তিনিই জোড়া সৃষ্টি করেছেন — নর ও নারী — এক ফোঁটা শুক্র থেকে, যখন তা স্খলিত হয়।

সূরা আন-নাজম — আয়াত 45-46

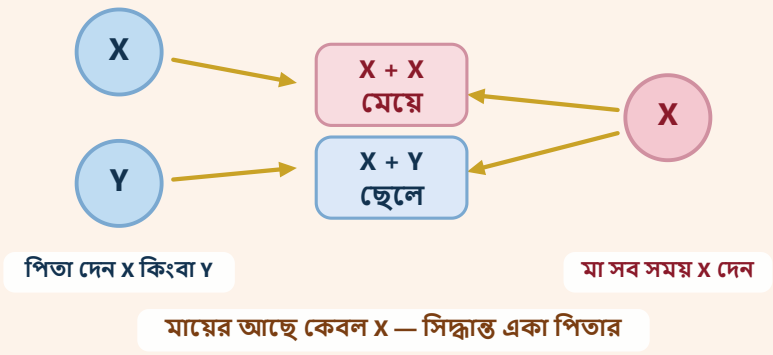

সন্তান ছেলে না মেয়ে, তা স্থির হয়ে যায় নিষেকের মুহূর্তেই — শুক্রাণু যা বহন করে তা দিয়ে

সহজ কথায়

সন্তান ছেলে না মেয়ে? এ সিদ্ধান্ত কখনোই মায়ের দিক থেকে আসে না — আসে **পিতার** দিক থেকে। কারণ মা বহন করেন কেবল এক ধরনের, আর পিতা বহন করেন দুই ধরনেরই।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য নারীকে দোষ দেওয়া হতো — কোনো কোনো সমাজে আজও হয় — আর স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হতো এই বলে যে সে "ছেলে জন্ম দিতে পারে না"। এম্পিডোক্লিসের মত ছড়িয়ে পড়েছিল যে জরায়ুর উত্তাপই লিঙ্গ নির্ধারণ করে, আর শত শত বছর চিকিৎসাশাস্ত্রে চলেছে এই কথা যে পুত্র আসে জরায়ুর ডান দিক থেকে আর কন্যা বাম দিক থেকে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

লিঙ্গ-ক্রোমোজোম: নারী XX, পুরুষ XY। ডিম্বাণু সর্বদা X বহন করে, ব্যতিক্রমহীনভাবে; কিন্তু শুক্রাণু X বহন করতে পারে, আবার Y-ও। X-বাহী শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলন হলে সন্তান কন্যা, আর Y-বাহী হলে পুত্র। **অর্থাৎ লিঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয় পিতার দিক থেকে।** এটি আবিষ্কার করেন নেটি স্টিভেনস, 1905 সালে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি জোড়ার সৃষ্টিকে — নর ও নারীকে — সম্বন্ধ করেছে **শুক্রবিন্দুর সঙ্গে, যখন তা স্খলিত হয়**; আর এই ক্রিয়াপদটি বিশেষভাবে পুরুষের পানির জন্যই ব্যবহৃত হয়। উৎস নির্দিষ্ট, কোনো দ্ব্যর্থতা নেই। এই বাণী যদি মানুষের রচনা হতো, এমন এক সমাজে যেখানে সন্তানের লিঙ্গের জন্য নারীকে দোষ দেওয়া হতো, তবে নিরাপদ পথ ছিল চুপ থাকা কিংবা প্রচলিত মত মেনে নেওয়া। অথচ তা **প্রচলিত বিশ্বাসের সরাসরি বিরোধিতা করে বিষয়টি স্পষ্টভাবে পিতার দিকেই সম্বন্ধ করেছে** — আর তেরো শতাব্দী পরে বিজ্ঞান এসে তার সত্যতা দিয়েছে।

সূত্র Nettie M. Stevens – *Studies in Spermatogenesis*, 1905

ভ্রূণবিদ্যা ও শারীরস্থান

35 তিন অন্ধকারে

> তিনি আপনাদের সৃষ্টি করেন আপনাদের মায়েদের গর্ভে, এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি, তিন অন্ধকারের মধ্যে।
>
> **সূরা আয-যুমার — আয়াত 6**

তিনটি স্তরে সাজানো পর্দা: পেটের প্রাচীর, তারপর জরায়ুর প্রাচীর, তারপর ভ্রূণের ঝিল্লি

সহজ কথায়

গর্ভের শিশু একটিমাত্র অন্ধকার কামরায় থাকে না — থাকে **তিনটি কামরায়**, একটির ভিতরে আরেকটি: মায়ের পেটের প্রাচীর, তারপর জরায়ুর প্রাচীর, তারপর যে পানির থলি তাকে ঘিরে রাখে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

গর্ভবতী নারীর ব্যবচ্ছেদ হতো না, জরায়ুর গঠন সম্পর্কে কোনো জ্ঞানও ছিল না। স্বাভাবিক ধারণা ছিল, শিশু আছে **একটিমাত্র অন্ধকারে**: তার মায়ের পেটের ভিতরে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে তিনটি অন্ধকার গণনা করা এক সূক্ষ্ম দাবি, যার জন্য স্তরগুলোকে একটি একটি করে জানতে হয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ভ্রূণকে ঘিরে থাকে পরপর তিনটি পর্দা: **পেটের সামনের প্রাচীর**, তারপর তিন পেশিস্তরসহ **জরায়ুর প্রাচীর**, তারপর **ভ্রূণের ঝিল্লিগুলো** (অ্যামনিয়ন ও কোরিয়ন) এবং তাদের মাঝের তরল। প্রতিটিই নিজে নিজেই আলো আটকায়, আর সেগুলো সাজানো বাইরে থেকে ভিতরের দিকে, ঠিক যে ক্রমে বলা হয়েছে সেই ক্রমেই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সংখ্যাই এখানে চূড়ান্ত কথা বলে। কুরআন বলেনি "অন্ধকারে", বলেনি নির্বিশেষে "অন্ধকারসমূহে"; বরং নির্দিষ্ট করেছে: "**তিন**"। সংখ্যার দাবি ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গেই তা মিথ্যা প্রমাণ করা যায়। আর তার সঙ্গে এসেছে আরও একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বাক্যাংশ: "এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি" — অর্থাৎ পরপর আসা পর্যায়, প্রতিটি আগেরটির পরে সৃষ্ট। তাই একটিমাত্র আয়াতে একসঙ্গে এসেছে **স্থানের স্তরবিন্যাস** আর **সময়ের পর্যায়ক্রম**।

সূত্র Moore & Persaud – amnion, chorion, decidua

ভ্রূণবিদ্যা

36 মুদগাহ — যে টুকরায় দাঁতের ছাপ

তারপর একটি মাংসপিণ্ড থেকে, পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি — যাতে আমি আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে দিই।

সূরা আল-হজ্জ — আয়াত 5

চতুর্থ সপ্তাহের ভ্রূণ: ফুটে ওঠা সোমাইট, যেন চিবানো কোনো বস্তুতে দাঁতের ছাপ

সহজ কথায়

আরবি শব্দ *মুদগাহ*-র অর্থ **যে লোকমা আপনি নিজের দাঁতে চিবিয়েছেন**। এই পর্যায়ে ভ্রূণ একটি ছোট পিণ্ড, যার গায়ে ফোলা আর খাঁজ — ঠিক যেমন চিবানো আঠায় দাঁতের দাগ পড়ে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এই পর্যায় সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। কল্পনা করার যেকোনো চেষ্টা ভ্রূণকে বলত হয় রক্ত, নয়তো ক্ষুদ্র এক মানুষের প্রতিকৃতি। কিন্তু তাকে **দাঁতের ছাপ লাগা চিবানো একটি বস্তু** বলা এমন এক বিস্ময়কর বর্ণনা, যা না দেখে কারও মাথায় আসে না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

চতুর্থ সপ্তাহে ভ্রূণের পিঠ বরাবর পরপর কতগুলো খণ্ড ফুটে ওঠে, যাদের বলা হয় **সোমাইট**, আর তাদের মাঝে থাকে গভীর খাঁজ — ফলে ভ্রূণকে দেখায় চিবানো এক টুকরার মতো। ভ্রূণবিজ্ঞানী কিথ মুর এই পর্যায়ের ভ্রূণের পাশে চিবানো এক টুকরো আঠার ছবি তুলেছিলেন, আর মিলটি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই খণ্ডগুলোর কিছু অঙ্গে রূপ নেয়, কিছু মিলিয়ে যায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

চূড়ান্ত কথা **শব্দের নির্বাচনে**। সেই যুগে বর্ণনাকারীর সামনে পথ ছিল দুটি, তৃতীয় কোনো পথ ছিল না: হয় বলা যে এটি **রক্ত**, নয়তো বলা যে এটি **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণ ক্ষুদ্র এক মানুষ** — আর এই দুটি মতই তখন দুনিয়াজুড়ে প্রচলিত ছিল। অথচ তিনি আনলেন তৃতীয় একটি কথা, যা কারও মাথাতেই আসে না: **চিবানো এক লোকমা, যার গায়ে দাঁতের ছাপ**। এটি কথার কারুকাজ নয়, কারণ তারা যা কল্পনা করত তার কোনোটির সঙ্গেই এর মিল নেই — আর এ কথায় কেবল সে-ই পৌঁছায়, যে তা দেখেছে।

আর এটি একা দাঁড়ানো কোনো একটি শব্দও নয়, বরং **একটি ধারাবাহিকতার কড়ি**: নুতফা, তারপর আলাকা, তারপর মুদগাহ। তিনটি সাধারণ আরবি শব্দ, প্রতিটি নিজ পর্যায়ে অণুবীক্ষণ যা দেখায় তা-ই বর্ণনা করে, **এবং যে ক্রমে তা সত্যিই ঘটে ঠিক সেই ক্রমেই**।

আর একটি সীমায় থামুন: প্রচলিত আছে যে "পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি" অর্থ কোষের বিভেদীকরণ আর তাদের কিছুর নির্ধারিত মৃত্যু। **আমরা এখানে তার উপর কিছুই দাঁড় করাই না**: ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শাবি ও ইবনে মাসউদ থেকে যা বর্ণিত তা হলো, পূর্ণাকৃতি সেটিই যা **সৃষ্টিতে পূর্ণ**, আর অপূর্ণাকৃতি হলো **গর্ভপাতে পড়ে যাওয়া**; আয়াতের প্রসঙ্গও তা-ই সমর্থন করে, কেননা এরপরই আসে: "**আর আমি জরায়ুতে যা ইচ্ছা তা স্থির রাখি**"। প্রমাণ দাঁড়িয়ে আছে কেবল "মুদগাহ" শব্দটির উপর — আর যা প্রতিষ্ঠিত নয় তা ফিরিয়ে দিলে তার কিছুই ক্ষতি হয় না; বরং এটিই তাকে প্রমাণ বানায়।

সূত্র الدُّرَرُ السَّنِيَّة – تفسيرُ سورة الحجّ ه · Moore & Persaud – the somites · O'Rahilly & Müller – *Developmental Stages in Human Embryos*

প্রাণের উৎস

37 প্রতিটি জীবন্ত বস্তু — পানি থেকে

আর আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি প্রতিটি জীবন্ত বস্তু। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

সূরা আল-আম্বিয়া — আয়াত 30

আজ পর্যন্ত জানা প্রতিটি জীবের পানি লাগে, তা ছাড়া তার টিকে থাকা সম্ভব নয়

সহজ কথায়

প্রতিটি জীবন্ত বস্তু — মানুষ, পশু, গাছ, এমনকি ক্ষুদ্রতম জীবাণুও — **পানি থেকেই**, আর পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। আপনার নিজের শরীর প্রায় 60 শতাংশ পানি — আর জন্মের দিনে ছিল প্রায় 78 শতাংশ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

শুকনো এক মরুভূমিতে, যেখানে পানি দুর্লভ আর বেশির ভাগ জমিই বালু ও পাথর, সবচেয়ে অসম্ভব যে কথাটি কারও মনে আসতে পারত তা হলো — পানিই **প্রতিটি** জীবন্ত বস্তুর মূল। দার্শনিকেরা বস্তুর মূল নিয়ে তর্ক করেছেন — আগুন, বাতাস, মাটি, পানি — আর কারও কাছেই বিষয়টি চুকিয়ে দেওয়ার মতো প্রমাণ ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

জীবিত কোষ — গোটা প্রাণের একক — ভরের হিসাবে প্রায় 70 শতাংশ পানি, আর প্রতিটি জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তার ভেতরেই। আজ পর্যন্ত একটিও জীব জানা নেই, যার পানি ছাড়া চলে। এ কারণেই অন্য কোনো গ্রহে প্রাণ খুঁজতে গিয়ে মহাকাশ সংস্থাগুলো সবার আগে খোঁজে **পানি** — তাদের ঘোষিত স্লোগানই হলো: "পানিকে অনুসরণ করুন।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

অলৌকিকত্ব লুকিয়ে আছে **"প্রতিটি"** শব্দটিতে। আয়াত বলেনি যে পানি প্রাণের একটি কারণ, বলেনি যে বেশির ভাগ জীব পানি থেকে — বরং পানিকেই বানিয়েছে ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর মূল। আর এ হলো **সর্বজনীন এক নিয়ম, তাই মিথ্যা-প্রমাণযোগ্যও**: পানি লাগে না এমন একটিমাত্র জীব পাওয়া গেলেই তা ভেঙে পড়ত। বিজ্ঞান চৌদ্দ শতাব্দী ধরে পৃথিবীর প্রতিটি পরিবেশে খুঁজেছে — বরফে, আগ্নেয় ছিদ্রমুখে, সমুদ্রের গভীরে, পারমাণবিক চুল্লির ভেতরে — একটি ব্যতিক্রমও পায়নি।

সূত্র Alberts et al. — *Molecular Biology of the Cell*

প্রাণরসায়ন

38 সবুজ গাছের ভেতরে জমা আগুন

তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ গাছ থেকে আগুন বানিয়েছেন, আর দেখো, তোমরা তা থেকেই আগুন জ্বালো।

সূরা ইয়াসিন — আয়াত ৪০

গাছ সূর্যের আলো নিজের ভেতরে জমা করে, আর আগুন তা আবার ছেড়ে দেয়

সহজ কথায়

কাঠে যে আগুন জ্বলে তা নতুন নয় — তা **সূর্যের সেই আলোই**, গাছ যখন সবুজ ও জীবিত ছিল তখন যা সে জমিয়ে রেখেছিল। আপনি যখন কাঠ জ্বালান, তখন আপনি পুরোনো এক বন্দি সূর্যকে মুক্ত করে দিচ্ছেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সবুজ আর ভেজা তো প্রত্যেক মনেই আগুনের উল্টো: সবুজ ডাল জ্বলে না, শুকনো ডাল জ্বলে। তাই আগুনকে বিশেষভাবে **"সবুজ গাছের"** সঙ্গে জুড়ে দেওয়া রোজকার চোখে-দেখার বিরুদ্ধেই যেত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সালোকসংশ্লেষণ: সবুজ পাতা সূর্যের আলোর ফোটন ধরে ফেলে আর সেগুলোকে বদলে দেয় শর্করা ও সেলুলোজ অণুর বন্ধনে জমা রাসায়নিক শক্তিতে। আর দহন হলো ঠিক তার উল্টো প্রক্রিয়া: তা ওই বন্ধনগুলো ভেঙে শক্তিকে আলো ও তাপ হিসেবে ছেড়ে দেয়। আমরা যত জ্বালানি কাজে লাগাই — কাঠ, কয়লা, তেল, গ্যাস — সবই কোনো সবুজ গাছের জমানো সৌরশক্তি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

নির্দিষ্ট করে বলাটাই এখানে অলৌকিক। আয়াত বলেনি "গাছ থেকে আগুন", বলেছে "**সবুজ** গাছ থেকে" — আর সবুজ থাকাটাই ঠিক সেই অবস্থা, যাতে সালোকসংশ্লেষণ ও সঞ্চয় ঘটে। অর্থাৎ আগুনকে জোড়া হয়েছে সেই ধাপের সঙ্গে, যাতে শক্তি **জমা হয়**; যে ধাপে তা পোড়ে, সেটির সঙ্গে নয়। শুকনো কাঠ কেবল সেটুকুর জোরেই জ্বলে, সবুজ থাকতে যা সে জমিয়েছিল। এ এক অবস্থা ও এক ফলের মধ্যে পুরোপুরি সঠিক কার্যকারণ-সম্পর্ক, যা বোঝাই যায়নি 1817 সালে ক্লোরোফিল আবিষ্কারের আগে।

সূত্র Pelletier & Caventou (1817) – chlorophyll · Taiz & Zeiger – *Plant Physiology*

ফরেনসিক বিজ্ঞান

39 আঙুলের ছাপ — আপনার একমাত্র পরিচয়

মানুষ কি মনে করে আমি তার হাড়গুলো একত্র করতে পারব না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই — আমি তার আঙুলের ডগাগুলো পর্যন্ত ঠিকঠাক গড়ে দিতে সক্ষম।

সূরা আল-কিয়ামাহ — আয়াত 3-4

দুটি আঙুলের ছাপ কখনো মেলে না — অভিন্ন যমজেরও নয়

আটশ কোটি মানুষ... আটশ কোটি আলাদা আঙুলের ছাপ

সহজ কথায়

আপনার আঙুলের ডগায় সূক্ষ্ম রেখা আছে। এই রেখা **অন্য কোনো মানুষের মধ্যে কখনোই পুনরাবৃত্ত হয় না** — এমনকি সেই অভিন্ন যমজেও নয়, যে বাকি সব কিছুতে আপনারই মতো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আঙুলের ডগা ছিল চামড়ার সাধারণ এক টুকরা; কেউ সেদিকে তাকাত না, কেউ তাকে স্বতন্ত্র ভাবত না। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ কাদামাটিতে ও চুক্তিপত্রে আঙুল চেপে তাকে ব্যক্তিগত সিলমোহর বানিয়েছে, কিন্তু কেউ জানত না যে সেগুলো **অনন্য, কখনো পুনরাবৃত্ত হয় না**, কিংবা সারা জীবন অটল থাকে। পরিচয় শনাক্ত করতে আঙুলের ছাপ সরকারিভাবে ব্যবহৃত হয়নি 1892 সাল পর্যন্ত — আর তা আর্জেন্টিনায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আঙুলের ডগার রেখা তৈরি হয় গর্ভধারণের দশম সপ্তাহে, জিন আর জরায়ুর ভিতরে অ্যামনিয়োটিক তরলের চাপের এক জটিল মিথস্ক্রিয়ায় — আর তা বেরিয়ে আসে **সম্পূর্ণ অনন্য** হয়ে। সারা জীবন তা অটল থাকে — বদলায় না, মুছে ফেলা যায় না, উপরের চামড়া পুড়ে গেলেও আগের মতোই ফিরে আসে। গোটা দুনিয়ার পরিচয়-ব্যবস্থা এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

প্রসঙ্গটিই এখানে চাবিকাঠি। আয়াত কথা বলছে মৃতদের পুনরুত্থান আর হাড় একত্র করা নিয়ে। যে একে অসম্ভব মনে করে, তার উত্তরে প্রত্যাশিত ছিল: হ্যাঁ, আমি তার হাড়গুলো একত্র করতে সক্ষম। কিন্তু উত্তর এল আরও অনেক সূক্ষ্ম কিছু নিয়ে: "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই — আমি তার **আঙুলের ডগাগুলো** পর্যন্ত ঠিকঠাক গড়ে দিতে সক্ষম।" দেহের সমস্ত অংশের মধ্য থেকে ঠিক **আঙুলের ডগাকেই** বেছে নেওয়া — আর তা-ও ঠিক সেখানে, যেখানে কথা হচ্ছে কোনো কিছুকে **হুবহু আগের মতোই** ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা নিয়ে — স্বাতন্ত্র্য ও পরিচয়ের আসনের দিকেই ইঙ্গিত। আর এ কথা জানা যায়নি আরও বারো শতাব্দী পর্যন্ত।

সূত্র Galton – *Finger Prints*, 1892 · Juan Vucetich – the first fingerprint identification, 1892

40 ডানা মেলে, আবার গুটিয়ে

তারা কি তাদের উপরে পাখিদের দেখে না — ডানা মেলে, আবার গুটিয়ে? দয়াময় ছাড়া আর কেউ তাদের ধরে রাখে না।

সূরা আল-মুলক — আয়াত 19

মেলা ডানায় ভেসে চলা আর গুটানো ডানায় ঝাপটানো: পৃথিবীর সব উড়ালই এ দুটির একটি

সহজ কথায়

পাখি ওড়ে কেবল দুই রকমে: হয় **ডানা দুটি মেলে** দিয়ে নাড়াচাড়া ছাড়াই বাতাসে ভেসে চলে, নয়তো **ডানা গুটিয়ে** ঝাপটে নিজেকে সামনে ঠেলে দেয়। কুরআন দুটিরই নাম নিয়েছে, তৃতীয় কিছু যোগ করেনি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ওড়া ছিল দেখার দৃশ্য, বিশ্লেষণের বিষয় নয়। উড়ালের দুই ধরনের মধ্যে কেউ পার্থক্য করত না, কোনটি উত্তোলন দেয় আর কোনটি সামনের ধাক্কা দেয় তাও জানত না। শত শত বছর মানুষ ডানা ঝাপটানোর নকল করে উড়তে চেয়েছে, আর ব্যর্থ হয়েছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বায়ুগতিবিদ্যা পাখির উড়ালকে দুই ধরনে ভাগ করে, তৃতীয় কোনো ধরন নেই: স্থির মেলা ডানায় **ভেসে চলা ও চক্কর দেওয়া**, যা উপরে ওঠা বায়ুস্রোতকে কাজে লাগায়; আর **ঝাপটানো উড়াল**, যাতে ডানা গুটিয়ে ও মেলে সামনের ধাক্কা তৈরি হয়। আজ পর্যন্ত বানানো প্রতিটি উড়োজাহাজ প্রথম নীতিটির উপরেই দাঁড়ানো — স্থির, মেলা ডানা। মানুষ উড়তে সফল হয়েছে কেবল তখনই, যখন সে ঝাপটানোর নকল ছেড়ে মেলাকে গ্রহণ করেছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উড়ালকে দুই ধরনে সীমাবদ্ধ করাই প্রথম সূক্ষ্মতা। দ্বিতীয়টি **শব্দরূপে**: "মেলে" এসেছে কর্তৃবাচক বিশেষণের রূপে, যা স্থির ও অবিরাম অবস্থা বোঝায়; আর "গুটায়" এসেছে বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপে, যা পুনরাবৃত্তি ও বিরতি বোঝায়। ভৌত পার্থক্যটি ঠিক এটিই: মেলা একটি চলমান অবস্থা, গুটানো একটি বারবার ঘটা নড়াচড়া। আর তৃতীয় সূক্ষ্মতা: "মেলে" রাখা হয়েছে "গুটায়"-এর আগে — কারণ মেলা ডানাই সেই ভিত্তি যা উত্তোলন-শক্তি তৈরি করে, আর ঝাপটানো তার উপর একটি বাড়তি সংযোজন।

সূত্র Videler – *Avian Flight*, 2005 · *Britannica* – "Flight (animal locomotion)"

ক্ষত-চিকিৎসা

41 গুহাবাসীদের পাশ ফেরানো — আর শয্যাক্ষত প্রতিরোধ

আর আপনি তাদের জাগ্রত মনে করতেন, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত। আর আমি তাদের ডানে ও বামে পাশ ফিরিয়ে দিতাম।

সূরা আল-কাহফ — আয়াত 18

আজ দুনিয়ার প্রতিটি হাসপাতালে শয্যাপাশে সেবার নিয়মাবলি

সহজ কথায়

গুহাবাসীরা ঘুমিয়েছিল খুব দীর্ঘ সময়, আর আল্লাহ **তাদের ডানে ও বামে পাশ ফিরিয়ে দিতেন**। চিকিৎসাবিজ্ঞান আজ বলে: যে রোগী নড়াচড়া ছাড়া পড়ে থাকেন, **তাঁর চামড়ায় ঘা হয় আর মাংস পচে যায়** — আর এর একমাত্র প্রতিকার পাশ ফেরানো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের চোখে ঘুম ছিল নিছক বিশ্রাম, যত দীর্ঘই হোক ক্ষতি নেই। জানা ছিল না যে **দেহকে একই ভঙ্গিতে স্থির রাখলে** কলা নষ্ট হয়ে যায়। তাই দীর্ঘ ঘুমের গল্পে পাশ ফেরানোর উল্লেখকে মনে হয়েছিল অপ্রয়োজনীয় এক খুঁটিনাটি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

শয্যাক্ষত (Bedsores / Pressure Ulcers): দেহের ভার একই জায়গায় চাপ দিলে সেখানে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে কোষ মরে যায়, চামড়ায় ঘা হয়, তারপর পেশিতে, তারপর হাড়ে। পুরোপুরি স্থির থাকার **মাত্র দুই ঘণ্টার** মধ্যেই ক্ষয় শুরু হয়। দীর্ঘ শয্যাশায়িত্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক জটিলতাগুলোর একটি এটি, এবং এতে মৃত্যুও হতে পারে। বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত প্রতিরোধ: **রোগীকে ডানে ও বামে পাশ ফেরানো**, তাঁর অবস্থা অনুযায়ী বানানো সময়সূচি মেনে — প্রতি দুই থেকে তিন ঘণ্টায় একবার।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, আয়াতটি পাশ ফেরানোর কথা অনর্থক বলেনি, গল্পের অলংকার হিসেবেও বলেনি। তা এসেছে **তাদের দেহ কীভাবে রক্ষা পেল** — সেই দীর্ঘ সময় জুড়ে — তা বোঝানোর প্রসঙ্গে। আর এর জন্য জানা থাকতে হয় যে স্থির দেহ নষ্ট হয়ে যায়, আর **পাশ ফেরানোই তার প্রতিকার**। শব্দের নিখুঁততা আরও বেশি: "ডানে ও বামে" — চিকিৎসাবিজ্ঞান ঠিক এই পাশ-ফিরে-শোয়ার ভঙ্গিরই পরামর্শ দেয় (30 ডিগ্রি কাত অবস্থান), কারণ তাতে চাপ সরে যায় ত্রিকাস্থি ও নিতম্ব থেকে, যা সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাগুলোর অন্যতম (আর গোড়ালির জন্য আলাদা অবলম্বন থাকে, যা তাকে বিছানা থেকে তুলে রাখে)। তারপর একই আয়াতে আরেকটি খুঁটিনাটি: "**আর তাদের কুকুর গুহামুখে দুই থাবা মেলে দিয়ে ছিল**" — দুই থাবা মেলে দেওয়া বিশ্রামের ভঙ্গি, পাহারার নয়; কুকুরের শোয়া দীর্ঘ হলে সে এমনটিই করে।

সূত্র EPUAP · NPIAP – *Prevention and Treatment of Pressure Ulcers*

লোহা

42 লোহা — নাজিল হয়েছে, এখানে তৈরি হয়নি

আর আমি লোহা নাজিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি আর মানুষের জন্য নানা উপকার।

সূরা আল-হাদিদ — আয়াত 25

পৃথিবীর — আর আপনার রক্তের — প্রতিটি লোহার পরমাণু জন্মেছে কোনো নক্ষত্রের ভিতরে

সহজ কথায়

পৃথিবীর সমস্ত লোহা, এমনকি আপনার রক্তের লোহাটুকুও এখানে তৈরি হয়নি। তা এসেছে **মহাশূন্যে দানব নক্ষত্রের বিস্ফোরণ** থেকে, তারপর পৃথিবীতে পড়েছে। আর কুরআন বলেনি "আমি লোহা সৃষ্টি করেছি"; বলেছে: **"আমি নাজিল করেছি"**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের চোখে ধাতু মাটির নিচ থেকে খুঁড়ে তোলা হয়, তাই তা পৃথিবীরই এবং পৃথিবীরই জাতের। কোনো একটি নির্দিষ্ট ধাতু যে **এই গ্রহের বাইরে থেকে আসতে পারে**, এমন ধারণাই কারও ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নক্ষত্রের ভিতরকার নিউক্লীয় সংযোজন লোহা পর্যন্ত মৌলগুলো তৈরি করে — তারপর সেখানেই থেমে যায়, কারণ লোহাই নিউক্লীয় বন্ধন-শক্তির চূড়া: তার চেয়ে হালকা মৌলের সংযোজন শক্তি ছাড়ে, **আর তার চেয়ে ভারী মৌল গড়তে শক্তি খরচ হয়, উৎপন্ন হয় না**। তাই সাধারণ কোনো নক্ষত্রের পক্ষে লোহার চেয়ে ভারী কিছু বানানো সম্ভব নয়। কেবল সুপারনোভা বিস্ফোরণই লোহাকে মহাশূন্যে ছুড়ে দেয়। আমাদের গ্রহ আর তার সমস্ত লোহা জমাট বেঁধেছে সেই নাক্ষত্রিক ধুলো থেকে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কুরআন "নাজিল করা" ক্রিয়াটি বিশেষভাবে লোহার সঙ্গেই ব্যবহার করেছে, আর তাও এমন এক প্রসঙ্গে যেখানে রাসূলদের পাঠানো আর কিতাব নাজিল করার কথা হচ্ছে — অর্থাৎ যা **উপর থেকে** আসে তারই প্রসঙ্গে। আর ভৌত বাস্তবতা আক্ষরিক অর্থেই তা-ই। এর সঙ্গে যোগ করুন, লোহার পারমাণবিক সংখ্যা 26 আর ভরসংখ্যা 56, সূরা আল-হাদিদ কুরআনের 57তম সূরা, আর প্রচলিত গণনায় এটি 25 নম্বর আয়াত। তবু সবচেয়ে শক্ত প্রমাণ একটি শব্দই থেকে যায়: "আমি নাজিল করেছি।"

সূত্র Burbidge, Burbidge, Fowler & Hoyle (1957) — *Synthesis of the Elements in Stars* · Nobel Prize in Physics 1983

43

শিশুচিকিৎসা

দুগ্ধদানের দুই পূর্ণ বছর

আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবেন — যে দুগ্ধদানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় তার জন্য।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত 233

কুরআন — 1400 বছর আগে	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
24 মাস	**24 মাস**
"পূর্ণ দুই বছর"	**"দুই বছর বা বেশি"**
যে পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য	বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত সুপারিশ

একই সংখ্যা... চৌদ্দ শতাব্দীর ব্যবধানে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ মেয়াদে ও নীতিতে আয়াতের সঙ্গে মিলে যায়

সহজ কথায়

কুরআন পূর্ণ দুগ্ধদানের মেয়াদ নির্ধারণ করেছে **দুই পূর্ণ বছর**। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আজ ঠিক সেই একই মেয়াদেরই সুপারিশ করে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

দুগ্ধদানের মেয়াদ জাতিভেদে প্রথা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিস্তর আলাদা ছিল — কয়েক মাস থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যন্ত, কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়াই। শিশুর বৃদ্ধি ও রোগপ্রতিরোধের জন্য আদর্শ মেয়াদ জানার কোনো উপায়ই ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ সুপারিশ করে **ছয় মাস কেবল মায়ের দুধ**, তারপর বাড়তি খাবারের সঙ্গে তা চালিয়ে যাওয়া **দুই বছর বা তারও বেশি পর্যন্ত**। প্রমাণিত হয়েছে যে মায়ের দুধ এমন অ্যান্টিবডি বহন করে যা শিশুর রোগপ্রতিরোধ গড়ে তোলে, তা শিশুমৃত্যু, সংক্রমণ ও ডায়াবেটিস কমায়, আর উন্নততর মানসিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সূক্ষ্মতা কেবল সংখ্যায় নয়, বরং **তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া শর্তে**: "যে দুগ্ধদানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় তার জন্য"। আয়াত দুই বছরকে কঠোর বাধ্যবাধকতা করেনি; করেছে **পূর্ণতার সুপারিশকৃত ঊর্ধ্বসীমা** — আর আধুনিক চিকিৎসা-সুপারিশের ভাষাও ঠিক এটিই ("দুই বছর বা তারও বেশি", "দুই বছর বাধ্যতামূলক" নয়)। এরপর আয়াত আরও শিথিলতা যোগ করেছে: পিতামাতা উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শে আগেভাগে দুধ ছাড়ানো বৈধ, আর অন্য নারীকে দিয়ে দুধ পান করানোও বৈধ। সংখ্যায় আর সুপারিশের মর্মে — দুদিক থেকেই এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে।

সূত্র WHO & UNICEF – *Global Strategy for Infant and Young Child Feeding*

প্রসূতিবিদ্যা

44 খেজুর গাছের কাণ্ড নিজের দিকে নাড়া দিন

আর খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দিন; তা আপনার উপর ঝরিয়ে দেবে সুপক্ক তাজা খেজুর। সুতরাং খান, পান করুন এবং চোখ জুড়ান।

সূরা মারইয়াম — আয়াত 25-26

গর্ভের শেষ সপ্তাহগুলোতে ও প্রসবের পরে আজ খেজুরের সুপারিশ করা হয়

সহজ কথায়

এক নারী খেজুর গাছের নিচে একা সন্তান প্রসব করছেন, আর তাঁকে বলা হচ্ছে: **তাজা খেজুর খান**। আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, প্রসবের সময় ও তার পরে নারী যা খেতে পারেন তার মধ্যে খেজুর অন্যতম সেরা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

তাজা খেজুর ছিল পরিচিত ও প্রিয় খাবার, কিন্তু প্রসবে তার কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসাগত ক্রিয়া জানা ছিল না। প্রসূতির জন্য চেনা পরামর্শ ছিল বিশ্রাম, উষ্ণতা আর ঝোল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটিমাত্র ফলকে আলাদা করে নির্দিষ্ট করা এক চোখে পড়ার মতো নির্ধারণ।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পিয়ার-রিভিউড সাময়িকীতে প্রকাশিত ক্লিনিক্যাল গবেষণা প্রমাণ করেছে যে গর্ভের শেষ সপ্তাহগুলোতে খেজুর খাওয়া **প্রসববেদনার সময় কমায় আর প্রসব ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন হ্রাস করে**। খেজুরে আছে দ্রুত শোষিত হওয়া ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ — শক্তি নিঃশেষ হওয়ার পর প্রসূতির ঠিক যা দরকার — আর আছে পটাশিয়াম, লোহা ও ম্যাগনেশিয়াম; আর আছে এমন যৌগ, যা **অক্সিটোসিনের** মতো কাজ করে জরায়ুকে সংকুচিত হতে সাহায্য করে ও রক্তক্ষরণ কমায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে তিনটি বিষয় লক্ষ করুন। প্রথম: ফল নির্দিষ্ট — খেজুরই, অন্য কিছু নয়; এই অবস্থার জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে উপযুক্ত খাদ্য। দ্বিতীয়: অবস্থাও নির্দিষ্ট — "**সুপক্ক তাজা খেজুর**", নরম ও টাটকা, শুকনো নয়; যা দ্রুত শোষিত হয় আর সহজে হজম হয়। তৃতীয়, এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর: **কাণ্ড নাড়ার** নির্দেশ — চরম দুর্বলতার মুহূর্তে এক নারীকে নড়াচড়া ও শ্রমের আদেশ দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রসববেদনার সময় নড়াচড়ার সুপারিশ করে ঠিক এ কারণেই যে তা প্রসবকে দ্রুততর করে। খাদ্য, নড়াচড়া আর প্রশান্ত মন ("চোখ জুড়ান") — একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোটোকল।

সূত্র Al-Kuran et al. (2011) – date fruit in late pregnancy · Guyton & Hall – oxytocin and the uterus

45

পুষ্টিবিজ্ঞান

প্রবাহিত রক্ত আর শূকরের মাংস কেন হারাম হলো?

আপনি বলুন: আমার প্রতি যা ওহি করা হয়েছে তাতে আমি ভক্ষণকারীর জন্য হারাম এমন কিছু পাই না — তবে তা যদি হয় মৃত প্রাণী, কিংবা প্রবাহিত রক্ত, কিংবা শূকরের মাংস; কারণ তা অপবিত্র।

সূরা আল-আনআম — আয়াত 145

তিন নিষেধ... আর তিন কারণ, যা চিকিৎসাবিজ্ঞান শতাব্দী পরে প্রমাণ করেছে

নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার কারণ জানার চৌদ্দ শতাব্দী আগে

সহজ কথায়

কুরআন তিনটি খাদ্য হারাম করেছে: প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস, আর যে প্রাণী নিজে নিজেই মরে গেছে। আর আজ বিজ্ঞান দেখাচ্ছে, এদের প্রতিটিই **রোগের পরিচিত বাহক**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

খাদ্য বাছাই হতো প্রথা, রুচি আর প্রাপ্যতা দিয়ে। পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া কিংবা প্রাণী থেকে মানুষে রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিল না। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতায় শূকরের মাংস খাওয়া হতো কোনো দ্বিধা ছাড়াই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

রক্ত ব্যাকটেরিয়া বেড়ে ওঠার আদর্শ মাধ্যম, আর তা বিপাকীয় বর্জ্য, হরমোন ও বিষ বহন করে বৃক্কের দিকে। **শূকরের মাংস** ট্রাইকিনেলা কৃমির প্রধান বাহক, যা পেশিতে সিস্ট বেঁধে থাকে আর হালকা রান্নায় বেঁচে যায়; বাহক শূকরের ফিতাকৃমিরও, যার লার্ভা মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে; আর টক্সোপ্লাজমারও — এর সঙ্গে আছে উঁচু মাত্রার সম্পৃক্ত চর্বি। **মৃত প্রাণী** রোগে বা বিষে মরে থাকতে পারে, আর তার রক্ত আটকে থাকে কলার ভিতরেই, তাই তা দ্রুত পচে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সূক্ষ্ম শর্তটি হলো "**প্রবাহিত**"। নিষেধাজ্ঞা সব রক্তের উপর পড়েনি, পড়েছে জবাইয়ের সময় ঝরে পড়া প্রবহমান রক্তের উপর। আর যা কলার ভিতরে মিশে থেকে যায় — মায়োগ্লোবিন — তা রেহাই পেয়েছে; তা সরানোর কোনো উপায়ও নেই। নিষেধাজ্ঞাটি **এমন বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায় মাপা, যা কম পড়ে না, বাড়াবাড়িও করে না**। জবাইয়ের বিধানও তেমনই: তাতে গলার শিরা কাটা শর্ত, যাতে সমস্ত রক্ত ঝরে যায় — আর মাংস-নিরাপত্তার মানদণ্ড আজ ঠিক এটিরই সুপারিশ করে, ব্যাকটেরিয়ার ভার কমাতে। এমন এক বিজ্ঞানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ বিধান, যে বিজ্ঞান তখনো জন্মায়ইনি।

সূত্র CDC – *Trichinellosis* · WHO – *Taeniasis / cysticercosis*

46

কীটতত্ত্ব

পিঁপড়া কথা বলে, সতর্কও করে

অবশেষে যখন তারা পিঁপড়ার উপত্যকায় পৌঁছাল, তখন এক পিঁপড়া বলল: হে পিপীলিকাকুল, তোমরা তোমাদের বাসস্থানে ঢুকে পড়ো, যেন সুলাইমান ও তার বাহিনী তোমাদের পিষে না ফেলে।

সূরা আন-নামল — আয়াত 18

একটি পিঁপড়া তার উপনিবেশকে সতর্ক করে, আর গোটা উপনিবেশ গর্তে ঢুকে পড়ে

সহজ কথায়

ছোট্ট এক পিঁপড়া এগিয়ে আসা বাহিনী দেখে বাকি পিঁপড়াদের সতর্ক করল নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়তে। আর বিজ্ঞান বলছে: পিঁপড়া সত্যিই **বিপদসংকেত পাঠায়**, আর গোটা উপনিবেশ সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পুরোনো ধারণায় প্রাণী ছিল বাকশক্তিহীন এক জীব, যার না আছে ভাষা, না সংগঠন। একটি পিঁপড়ার মুখ থেকে এমন একটি বাক্য বেরোবে যাতে আছে **আহ্বান, আদেশ, সতর্কতা, কারণ আর আক্রমণকারীর জন্য একটি ওজর** ("আর তারা টেরও পায় না") — শ্রোতার কাছে এটি বাস্তব সংবাদের চেয়ে রূপকধর্মী গল্পই মনে হতো।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পিঁপড়া পৃথিবীর সবচেয়ে সুসংগঠিত সামাজিক প্রাণীদের একটি, আর তারা তিনটি প্রমাণিত উপায়ে যোগাযোগ করে: **রাসায়নিক ফেরোমোন** — প্রতিটি বার্তার জন্য আলাদা পদার্থ, আর তার মধ্যে আছে বিপদের ফেরোমোন, যা এমন দ্রুত ছড়ায় যে উপনিবেশ কয়েক সেকেন্ডেই সাড়া দেয়; **টোকা ও কম্পন**; আর **শব্দ** — আবিষ্কৃত হয়েছে যে পিঁপড়ার একটি ঘর্ষণ-অঙ্গ আছে, যা নির্দিষ্ট অর্থবহ শব্দ তৈরি করে; সেগুলো গবেষণাগারে রেকর্ড ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ছোট ছোট খুঁটিনাটিই এখানে প্রমাণ। প্রথমত: ক্রিয়াপদ "**বলল**" এসেছে স্ত্রীলিঙ্গে — আর যে শ্রমিক পিঁপড়ারা বাইরে বেরোয়, পাহারা দেয় আর সতর্ক করে, তারা **সবাই স্ত্রী**; পুরুষদের প্রজনন ছাড়া কোনো কাজ নেই, এরপর তারা মরে যায়। দ্বিতীয়ত: "**তোমাদের বাসস্থানে**" প্রবেশের আদেশ — আর পিঁপড়ার বাসা সত্যিই একটি বাসস্থান, কক্ষ, সুড়ঙ্গ আর ভাণ্ডারে ভাগ করা। তৃতীয়ত: "যেন তোমাদের পিষে না ফেলে" — আরবি ক্রিয়াটির অর্থ ভেঙে ফেলা, আর পিঁপড়ার দেহ একটি শক্ত বহিঃকঙ্কাল, যা **থেঁতলায় না, ভাঙে**। একটিমাত্র আয়াতে তিনটি সূক্ষ্মতা।

সূত্র Hölldobler & Wilson – *The Ants*, 1990 · Ant communication – pheromones and stridulation

47

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পঞ্জিকা

তিনশো বছর, আর তার সঙ্গে আরও নয়

আর তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিনশো বছর, আর তারা নয় বাড়িয়ে নিল।

সূরা আল-কাহফ — আয়াত 25

তিন শতাব্দীতে দুই পঞ্জিকার ব্যবধান পূর্ণসংখ্যায় ঠিক নয় বছর

সহজ কথায়

কুরআন বলেছে তারা ছিল **তিনশো বছর**, তারপর যোগ করেছে: **"আর তারা নয় বাড়িয়ে নিল"**। কারণটি চমৎকার: তিনশো সৌর বছর সমান 309.2 চান্দ্র বছর — অর্থাৎ পূর্ণসংখ্যায় তিনশো নয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ একটিই পঞ্জিকা ব্যবহার করত, দুই পঞ্জিকার মধ্যে রূপান্তর করত না। একটি পূর্ণ সংখ্যার পরে "নয়" জুড়ে দেওয়াকে মনে হতো অদ্ভুত ও অর্থহীন এক বাড়তি — কোনো কোনো পাঠক তো একে সংখ্যা নিয়ে দ্বিধা বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সৌর বছর 365.2422 দিন, আর চান্দ্র বছর 354.367 দিন। সুতরাং তিনশো সৌর বছর = 109,572.6 দিন। একে চান্দ্র বছরের দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় **309.2** চান্দ্র বছর। অর্থাৎ পূর্ণসংখ্যায় ব্যবধান নয় বছর। গুহাবাসীরা ছিলেন রোমান পরিবেশে, যেখানে সৌর পঞ্জিকা চালু ছিল, আর কুরআন সম্বোধন করছে এমন এক জাতিকে যারা চান্দ্র পঞ্জিকা ব্যবহার করে — তাই এটি সংখ্যাটি দুই পঞ্জিকাতেই একসঙ্গে দিয়ে দিল।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সংখ্যাটি খেয়ালখুশি মতো হলে "তিনশো বছর" বলে থেমে যেত, কিংবা বলত "তিনশো ও কিছু বেশি"। কিন্তু বাড়তিটুকু এসেছে **ঠিক নয় নির্দিষ্ট করে** — আর সেটিই হুবহু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক রূপান্তরের ফল। আর ভাষাটি লক্ষ করুন: "তিনশো বছর, **আর তারা নয় বাড়িয়ে নিল**" — ক্রিয়াপদটিই দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই নয় তাদের কাটানো আলাদা কোনো সময় নয়, বরং **গণনায় বৃদ্ধি, সময়ে নয়** — অর্থাৎ সময়কাল একটিই, পঞ্জিকা বদলের সঙ্গে সংখ্যাটি বদলে গেছে। হিসাবে ও ভাষায় একসঙ্গে টিকে থাকে, এমন ব্যাখ্যা কেবল এটিই।

সূত্র U.S. Naval Observatory — *Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac*

প্রত্নতত্ত্ব

48 সামুদ — যারা পাহাড় কেটে ঘর বানাত

আর তোমরা পাহাড় কেটে কুশলতার সঙ্গে ঘর বানাও। ... আর তারা পাহাড় কেটে ঘর বানাত, নিরাপদ বোধ করে।

সূরা আশ-শুআরা 149 — ও সূরা আল-হিজর 82

বিশাল সম্মুখভাগ, পাথরের উপর থেকে নিচে কেটে নামানো — একটি ভুলও যেখানে চলে না

সহজ কথায়

কুরআন বলেছে, সামুদ জাতি **তাদের ঘর পাহাড়ের ভেতরে কেটে বানাত** — পাথর গেঁথে গড়ত না, বরং পাহাড়টিকেই খুদে তার ভেতর ঘর বানাত। সেই ঘরগুলো আজও দাঁড়িয়ে আছে, দর্শনার্থীরা তা দেখেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরব উপদ্বীপে পরিচিত নির্মাণ ছিল মাটি, পাথর আর খেজুরপাতা। গোটা এক সভ্যতা পাহাড়ের পেটের ভেতর নিজেদের বাসস্থান কেটে বানাচ্ছে — এ ভাবনা শ্রোতাদের কাছে অচেনা ছিল। আর কুরআন নাম ধরে এমন এক জাতির কথা বলেছে, তাওরাতে যাদের উল্লেখ নেই, আর প্রাচীন সূত্রগুলো — সারগনের বর্ষপঞ্জি থেকে ডিওডোরাস ও টলেমি পর্যন্ত — যাদের চিনত কেবল উপদ্বীপের উত্তরের একটি আরব গোত্রের নাম হিসেবে, এই নির্মাণ-কৌশল কেউ তাদের সঙ্গে জুড়ে দেয়নি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মাদাইন সালিহ (আল-হিজর), উত্তর সৌদি আরবের আল-উলায়: বেলেপাথরে কাটা 130-রও বেশি সম্মুখভাগ, কোনো কোনোটি বিশ মিটারের বেশি উঁচু, সঙ্গে থাম, শীর্ষচূড়া, কার্নিশ এবং সামুদি ও নাবাতি শিলালিপি। 2008 সালে এটি হয় ইউনেস্কোর বিশ্ব-ঐতিহ্য তালিকায় প্রথম সৌদি স্থান। জায়গাটির নাম কুরআনেই আছে: "আর অবশ্যই **হিজরের অধিবাসীরা** রাসুলদের মিথ্যা বলেছিল।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার হয়েছে, সেটিই মীমাংসা করে দেয়: "**তারা কেটে বানায়**", "তারা গাঁথে" নয়। আরবিতে খোদাই মানে নিরেট একটি পিণ্ড থেকে উপাদান সরিয়ে ফেলা — গাঁথুনির ঠিক উল্টো। তারপর নির্দিষ্ট করা: "**পাহাড় থেকে**" — অর্থাৎ পাহাড়টিই ঘরের উপাদান। শ্রোতাদের চারপাশের কোনো কিছুর সঙ্গে মেলে না এমন এক কৌশলের এ এক নিখুঁত বর্ণনা। আর এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে অর্থে ভারী একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য: "**নিরাপদ বোধ করে**" — এমন ঘর ধসে না, পোড়ে না, শত্রুও ভাঙতে পারে না, কারণ তা পাথরটাই। এতেই আয়াতের কথাটি আরও ধারালো হয়: প্রকৌশলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তাও তাদের কোনো কাজে এল না।

সূত্র UNESCO World Heritage List – Hegra (al-Hijr)

প্রত্নতাত্ত্বিক শিলালিপি

49 খাদের অধিবাসীরা — যারা আগুন খুঁড়েছিল

অভিশপ্ত হয়েছে খাদের অধিবাসীরা — ইন্ধনে ভরা সেই আগুনের, যখন তারা তার পাশে বসে ছিল, আর তারা মুমিনদের সঙ্গে যা করছিল তার সাক্ষী ছিল।

সূরা আল-বুরুজ — আয়াত 4-7

ইয়েমেনি শিলালিপি ও সমকালীন সিরিয়াক চিঠিতে নথিভুক্ত এক ঐতিহাসিক গণহত্যা

সহজ কথায়

কুরআন এমন এক জাতির কথা বলেছে, যারা **লম্বা একটি খাদ** খুঁড়ে তাতে আগুন জ্বালাল, তারপর মুমিনদের সেখানে ছুড়ে ফেলে বসে বসে দেখল। এটি সত্যিকারের এক ঐতিহাসিক ঘটনা, পাথরের শিলালিপিতে লেখা আছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এ ঘটনা আরবদের কিতাবপত্রে নির্ভরযোগ্য কোনো বিস্তারিত বিবরণে ছিল না, মক্কায় এর কোনো লিখিত সূত্রও হাতের কাছে ছিল না। এ তো অন্য এক জাতির, আগের এক কালের, আর দূরের এক ভূমির কাহিনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ইতিহাস প্রমাণ করে প্রায় 523 খ্রিস্টাব্দের **নাজরান** গণহত্যার কথা, যখন হিমইয়ারি রাজা **জু নুওয়াস** নাজরানের খ্রিস্টানদের উপর নিপীড়ন চালান এবং যারা ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করে তাদের পুড়িয়ে মারেন। ঘটনাটি নথিবদ্ধ আছে **হিসন গুরাবের শিলালিপিতে**, ঘটনার সমকালীন **শামউন আল-আরশামির সিরিয়াক চিঠিতে**, এবং বাইজেন্টাইন ও হাবশি সূত্রে। আর নাজরানের উত্তরে বিরে হিমায় পাওয়া গেছে হিমইয়ারি 633 সনে তারিখ দেওয়া তিনটি শিলালিপি, যেগুলোতে নিহতের সংখ্যা গোনা হয়েছে বারো হাজার থেকে চৌদ্দ হাজার, আর বন্দির সংখ্যা সাড়ে নয় হাজার থেকে এগারো হাজার।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ছোট ছোট বিবরণের নিখুঁততাই এখানে ফয়সালা করে দেয়। আরবি শব্দ "**উখদুদ**" মানে মাটিতে লম্বা, সোজা একটি ফাটল — গোল গর্ত নয়। আর এটি খোঁড়া পরিখার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মেলে। "**ইন্ধনে ভরা**" বোঝায়, আগুনে বারবার নতুন ইন্ধন জোগানো হচ্ছিল, আচমকা লেগে যাওয়া আগুন নয়। "**তার পাশে বসে ছিল**" আর "**সাক্ষী**": অর্থাৎ অপরাধীরা বসে বসে দেখছিল — এ বিবরণটি শামউনের চিঠির সঙ্গে মিলে যায়, যেখানে লেখা আছে রাজা নিজে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে হাজির ছিলেন। আর লক্ষ করুন, কুরআন রাজার নামও বলেনি, জাতিরও নাম বলেনি — কারণ উদ্দেশ্য শিক্ষা, ইতিহাস-বিবরণ নয়।

সূত্র *The Book of the Himyarites* – the Najrān persecution, c. 523 CE · The Ḥimyarite Kingdom of south Arabia

প্রত্নতত্ত্ব

50 সাবা এবং বাঁধ-ভাঙা বন্যা

> কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিল, তাই আমি তাদের উপর পাঠালাম বাঁধ-ভাঙা বন্যা, আর তাদের দুই বাগান বদলে দিলাম এমন দুই বাগানে, যাতে ছিল বিস্বাদ তেতো ফল আর ঝাউ।
>
> **সূরা সাবা — আয়াত 16**

মারিবে সেই বিশাল বাঁধের ধ্বংসাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে আছে

সহজ কথায়

ইয়েমেনে **সাবা** নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, যা বেঁচে ছিল এক বিশাল বাঁধের উপর — সেই বাঁধ তার বাগানগুলোতে পানি জোগাত। বাঁধটি ভেঙে পড়ল, বন্যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল, আর বাগানগুলো পরিণত হলো তেতো গাছে, যা খাওয়া যায় না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবদের স্মৃতিতে সাবা বেঁচে ছিল কবিতা ও প্রবাদের একটি নাম হয়ে — "সাবার লোকদের মতো ছিন্নভিন্ন"। কিন্তু খননে পাওয়া কোনো নিদর্শন ছিল না, পাঠযোগ্য কোনো শিলালিপিও না। পশ্চিমা ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ করতেন, এমন রাজ্য আদৌ ছিল কি না — আর একে অর্ধেক কিংবদন্তি গণ্য করতেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মারিব বাঁধ আজও দাঁড়িয়ে থাকা এক নিদর্শন: নির্মিত হয়েছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে, দৈর্ঘ্যে প্রায় 600 মিটার, আর তা প্রায় দশ হাজার হেক্টরে পানি জোগাত। এর ভাঙনগুলো নথিবদ্ধ আছে ঘটনাস্থলে পাওয়া **সাবায়ী মুসনাদ শিলালিপিতে** — তার মধ্যে আছে আবরাহার বিখ্যাত শিলালিপি, যা 548 খ্রিস্টাব্দে বাঁধ মেরামতের বর্ণনা দেয়। আর আনুমানিক 570-580 খ্রিস্টাব্দের চূড়ান্ত ভাঙন ডেকে আনে **গোটা গোটা ইয়েমেনি গোত্রের উত্তরমুখী হিজরত** — যে হিজরত আরবদের বংশতালিকা ও ইতিহাসে সুপরিচিত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি কেবল ভাঙনের কথা বলে থামেনি; এরপর সেই জমির কী দশা হলো তা বর্ণনা করেছে উদ্ভিদবিদ্যার নিখুঁত ভাষায়: "এমন দুটি বাগান যাতে ছিল **বিস্বাদ তেতো ফল, ঝাউ আর সামান্য কিছু বরইগাছ**"। প্রথমটি কাঁটাযুক্ত তেতো ঝোপ, দ্বিতীয়টি এক ধরনের ঝাউ, তৃতীয়টি বরই — আর এগুলো হুবহু **শুষ্ক ও লবণাক্ত পরিবেশের উদ্ভিদ**, যা সেচ বন্ধ হয়ে মাটি লোনা হয়ে গেলে চাষের জমি দখল করে নেয়। তারপর বলল: "আর সামান্য **কিছু** বরইগাছ" — ঠিক জায়গায় বসানো এক স্বল্পতাসূচক শব্দ, কারণ তিনটির মধ্যে বরইই সবচেয়ে উপকারী আর সবচেয়ে কম।

সূত্র The Ma'rib Dam and its Sabaean inscriptions · Abraha – the dam-repair inscription (CIH 541)

প্রত্নতত্ত্ব

51 ফেরাউনের দেহ — নিদর্শন হিসেবে রক্ষিত

> সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটিকে রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হও।
>
> **সূরা ইউনুস — আয়াত 92**

তিন হাজার বছরের বেশি পুরোনো এক দেহ... আজও আছে

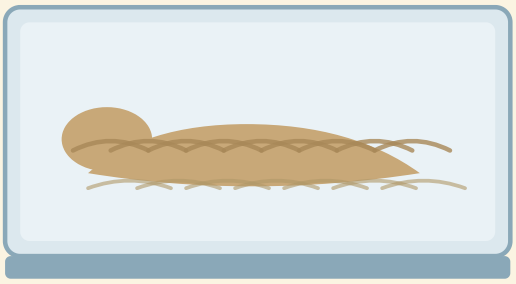

কায়রো জাদুঘর — শাহি মমি-কক্ষ

ফেরাউনের দেহ আজ কাচের পেছনে রাখা, মানুষ নিজ চোখে তা দেখে

সহজ কথায়

ফেরাউন যখন সাগরে ডুবে গেল, আল্লাহ বললেন, তিনি তার **দেহটিকে** রক্ষা করবেন, যাতে পরবর্তীরা তা দেখে শিক্ষা নেয়। সেই দেহ আজ রয়েছে এক জাদুঘরে, যেখানে সারা দুনিয়া থেকে মানুষ এসে দেখে যায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সাগরে যে ডোবে, তার দেহ হারিয়ে যায়: মাছে খায়, নয়তো পচে যায়, নয়তো বালিতে মিলিয়ে যায়। আর আয়াতটি যখন নাজিল হয়, আরবদের কেউ রাজকীয় মমিকরণ বা ফেরাউনদের সমাধি সম্পর্কে কিছুই জানত না। বরং হায়ারোগ্লিফিক লিপিটিই তখন পুরোপুরি বিস্মৃত ছিল, আর তার পাঠোদ্ধার হয়নি 1822 সালের আগে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1881 সালে দাইর আল-বাহরিতে রাজকীয় মমির গুপ্তভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়, তারপর 1898 সালে দ্বিতীয় আমেনহোটেপের সমাধি — এতে সামনে আসে নতুন রাজ্যের ফেরাউনদের দেহ। **মেরনেপতাহ**-র দেহ — যিনি যাত্রার ফেরাউন হওয়ার প্রার্থীদের একজন, যদিও অধিকাংশ গবেষকের মত তিনি দ্বিতীয় রামসেস — রক্ষিত আছে কায়রোর জাদুঘরে। শারীরস্থানবিদ গ্রাফটন এলিয়ট স্মিথ 1907 সালে তার মোড়ক খোলেন এবং এমন এক বৃদ্ধের দেহ বর্ণনা করেন যা মমিকরণে পুরোপুরি অক্ষত রাখা হয়েছে — আজ তা কাচের পেছনে রাখা, দর্শনার্থীরা নিজ চোখে তা দেখেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি কেবল "আমি তোমাকে রক্ষা করব" বলেনি, নির্দিষ্ট করেছে: "**তোমার দেহসহ**" — অর্থাৎ কেবল দেহটি, রুহ নয়। এটি একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য, যা ব্যক্তির রক্ষা পাওয়া আর তার লাশের টিকে থাকার মধ্যে সীমা টানে। তারপর কারণটিও বলেছে: "**যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হও**" — অর্থাৎ দেহটির টিকে থাকাই উদ্দেশ্য, তা দেখানোর জন্যই রাখা। আর এ কথা নাজিল হয়েছে এমন এক মরুভূমিতে যার মানুষ মমি বা সমাধির কিছুই জানত না, সেই সমাধিগুলো খোলা আর তাদের অধিবাসীদের কাচের ঘরে সাজানোর বারো শ বছর আগে।

সূত্র The Deir el-Bahari royal cache (TT320), 1881 · Champollion – decipherment of hieroglyphs, 1822 · The Royal Mummies, Cairo

পাঠের সংরক্ষণ

52 যেসব পাণ্ডুলিপি কার্বন প্রমাণ করেছে

নিশ্চয়ই আমিই এই উপদেশ নাযিল করেছি, আর নিশ্চয়ই আমিই তার সংরক্ষক।

সূরা আল-হিজর — আয়াত 9

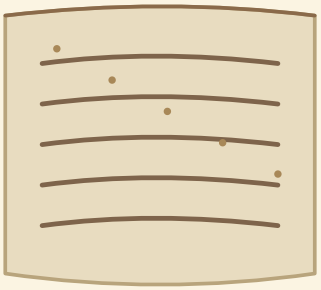

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় — ব্রিটেন

বার্মিংহাম পাণ্ডুলিপি

কার্বন-14 দিয়ে কাল-নির্ণয়

568 – 645 খ্রি.

95% সম্ভাব্যতায়

এর পাঠ আজকের মুসহাফের হুবহু

নবী ﷺ-এর জীবদ্দশার কিংবা তার অল্প পরের চামড়ার পাণ্ডুলিপি — আর তার পাঠই আজকের পাঠ

সহজ কথায়

কুরআন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তা সংরক্ষিত থাকবে, বদলাবে না। আজ আমাদের হাতে আছে **তেজস্ক্রিয় কার্বনে কাল-নির্ধারিত পাণ্ডুলিপি**, যা মোটামুটি নবী ﷺ-এর যুগ পর্যন্ত পৌঁছে যায় — আর তার পাঠ হুবহু আপনার হাতে থাকা মুসহাফের পাঠ, অক্ষরে অক্ষরে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সব প্রাচীন গ্রন্থই নকল ও অনুবাদের মধ্য দিয়ে সংযোজন, বিয়োজন ও বদলের শিকার হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী হাতে হাতে বাহিত যেকোনো পাঠের এটিই স্বাভাবিক পরিণতি। তাই পূর্ণ সংরক্ষণের দাবি ছিল **এমন এক দাবি, যা যেকোনো ভিন্নমুখী পাণ্ডুলিপি দিয়েই মিথ্যা প্রমাণ করা যেত**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বার্মিংহাম পাণ্ডুলিপি: চামড়ার এই পাণ্ডুলিপি 2015 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্বন-14 দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, আর 95 শতাংশ সম্ভাব্যতায় এর কাল নির্ধারিত হয় **568 থেকে 645 খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে। এরপর সানআ পাণ্ডুলিপি (তার উপরের উসমানি পাঠ), টুবিঙ্গেন পাণ্ডুলিপি, সমরকন্দ মুসহাফ, আর ইস্তাম্বুল ও কায়রোর বড় মুসহাফগুলো। গবেষকেরা — মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই — এসব পাণ্ডুলিপি আজ প্রচলিত মুসহাফের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন, আর পাঠে মিল পাওয়া গেছে প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অক্ষর লেখার বানানগত কিছু পার্থক্য ছাড়া, যা উচ্চারণ বা অর্থ কোনোটিই বদলায় না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সংরক্ষণ কেবল পাণ্ডুলিপির উপর দাঁড়ায়নি, দাঁড়িয়েছে **মানবেতিহাসে অনন্য এক দ্বৈত ব্যবস্থার** উপর: নিখুঁত লিখন, আর **বুকে মুখস্থ রাখা, যা মুতাওয়াতির সূত্রে বাহিত**। প্রতিটি প্রজন্মে দূর দূর দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ গোটা পাঠ মুখস্থ ধরে রাখে, যাদের এক কর্তৃত্বের নিচে জড়ো করার কেউ নেই — তাই একটি অক্ষর বদলানোর ব্যাপারে তাদের একমত হওয়া কার্যত অসম্ভব। আর পাঠটি নিজেই **এই অঙ্গীকার ঘোষণা করেছিল তার সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্তে** — মক্কায় তাড়া খাওয়া একটি দল। কোনো পাঠ চৌদ্দ শতাব্দী ধরে দুটি ভিন্ন অনুলিপি ছাড়াই টিকে আছে — পৃথিবীর অন্য কোনো গ্রন্থে এর নজির নেই।

সূত্র University of Birmingham – the Mingana Qur'ān folios · Oxford Radiocarbon Accelerator Unit

পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

53 তোমরা অবশ্যই নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্নই দেখিয়েছেন: তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, আল্লাহ চাইলে, নিরাপদে, মাথা মুণ্ডিত ও চুল ছাঁটা অবস্থায়, কোনো ভয় ছাড়াই।

সূরা আল-ফাতহ — আয়াত 27

নিরাপদ প্রবেশের প্রতিশ্রুতি... দেওয়া হলো বাধার সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে

সহজ কথায়

মুসলিমদের মক্কায় ঢুকতে দেওয়া হলো না, তাঁরা ভাঙা মন নিয়ে পথ থেকেই ফিরে এলেন। তখন একটি আয়াত নাযিল হলো, যা তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিল যে তাঁরা **নিরাপদে বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করবেন**। দুই বছর পর তাঁরা মক্কায় ঢুকলেন বিজয়ী হয়ে, ভয় ছাড়া, যুদ্ধ ছাড়া।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

হিজরি 6 সনে, হুদায়বিয়ায়, মুসলিমদের বাইতুল্লাহ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং কুরাইশের সঙ্গে এমন শর্তে সন্ধি হয়, যা তাঁদের অনেকের কাছেই অন্যায় মনে হয়েছিল — এমনকি উমর বলেই ফেললেন: "আমরা কেন আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এই হীনতা মেনে নেব?" মক্কা তখন তার শক্তির চূড়ায়, আর মুসলিমরা সংখ্যায় ও সরঞ্জামে কম। আসন্ন কোনো বিজয়ের ইঙ্গিত দিগন্তে কোথাও ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হিজরি 8 সনে (630 খ্রিস্টাব্দে) নবী ﷺ দশ হাজার সঙ্গী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন, **উল্লেখ করার মতো কোনো যুদ্ধ ছাড়াই**, আর ঘোষণা করলেন সাধারণ ক্ষমা: "যাও, তোমরা মুক্ত।" মুসলিমরা নিরাপদে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, মাথা মুণ্ডালেন ও চুল ছাঁটলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে সুনথিবদ্ধ ঘটনাগুলোর একটি, আর সব উৎসই এ ব্যাপারে একমত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতের ছোট ছোট বিবরণগুলোই একে আশা থেকে ভবিষ্যদ্বাণীতে তুলে নেয়। এটি কেবল বলেনি "তোমরা মক্কা জয় করবে", বরং নির্দিষ্ট করেছে **প্রবেশের ধরন**: "**নিরাপদে**" — ভয়ংকর যুদ্ধের পর বিজেতা হিসেবে নয়; "**কোনো ভয় ছাড়াই**" — পূর্ণ নিরাপত্তার উপর জোর; "**মাথা মুণ্ডিত ও চুল ছাঁটা অবস্থায়**" — অর্থাৎ তাঁরা প্রশান্ত মনে পুরো আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন, যা কেবল শহরের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলেই সম্ভব। একটিমাত্র বাক্যে চারটি বিবরণ, আর প্রতিটিই ঘটে গেল।

কবুল হওয়া দোয়া

54 যে উপত্যকায় কোনো ফসল নেই — আজ পৃথিবীর সবচেয়ে ভিড়ের জায়গা

হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের কিছুকে বসবাস করালাম ফসলহীন এক উপত্যকায়, আপনার পবিত্র ঘরের কাছে ... সুতরাং মানুষের মধ্য থেকে কিছু হৃদয়কে তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন, আর ফলমূল থেকে রিযিক দিন।

সূরা ইবরাহিম — আয়াত 37

হাজার হাজার বছর আগে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের এক দোয়া

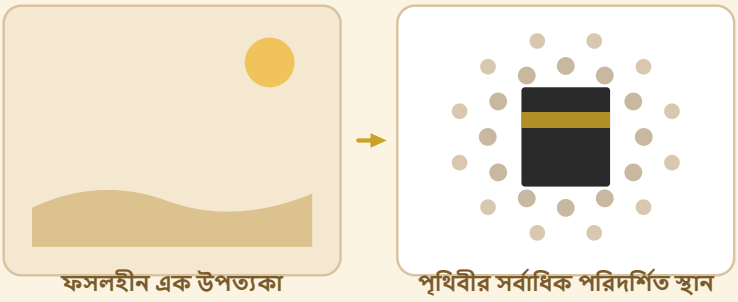

যে মাটিতে কিছুই জন্মায় না... সেখানেই মেলে সারা দুনিয়ার ফল

সহজ কথায়

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর স্ত্রী ও শিশুকে এমন এক উপত্যকায় রেখে আসার সময় দোয়া করলেন, যেখানে **পানি নেই, ফসলও নেই** — যেন আল্লাহ মানুষের হৃদয়কে তাদের প্রতি আকুল করে দেন এবং তাদের ফলমূলের রিযিক দেন। সেই উপত্যকাই আজ **পৃথিবীর বুকে মানুষ সবচেয়ে বেশি যেখানে যায়**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

উপত্যকাটি ছিল অনুর্বর পাহাড়ের মাঝে খালি মরুভূমি — নদী নেই, ঝরনা নেই, তখন কোনো বাণিজ্যপথও নেই। কাউকে সেদিকে টেনে আনার মতো কিছুই সেখানে ছিল না। আর দোয়াটির গড়নও অদ্ভুত: তিনি ফসল চাননি, জমির জন্য পানিও চাননি; চেয়েছেন আলাদা দুটি জিনিস — **ঝুঁকে পড়া হৃদয়**, আর **রিযিক হিসেবে ফলমূল**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আজকের মক্কা: কেবল হজের মৌসুমেই গোনা কয়েক দিনে সেখানে যান বিশ লাখেরও বেশি মানুষ, আর সারা বছর ধরে উমরাহ করেন লাখ লাখ। একশ আশি কোটিরও বেশি মানুষের মুখ সেদিকে ফেরে **প্রতিদিন পাঁচ বার**। অথচ তার মাটি বদলায়নি: আজও তা ফসলহীন উপত্যকা। তবু তার বাজারে আপনি পাবেন গোটা পৃথিবীর ফল, সারা বছর আসে প্রতিটি মহাদেশ থেকে। আর মরুভূমির বুকে জমজমের কূপ বয়ে চলেছে চার হাজার বছর ধরে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

মুজিযা রয়েছে **দোয়াটির গড়নের ভেতরেই**। মরুভূমিতে পরিবার রেখে আসা মানুষের স্বাভাবিক দোয়া হতো — জমি উর্বর হোক, বৃষ্টি নামুক। কিন্তু তিনি চাইলেন **মানুষের হৃদয় তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ুক** — অর্থাৎ রিযিক আসুক মানুষের হাত ধরে, মাটির হাত ধরে নয়। আর তিনি নিখুঁত ছিলেন: বললেন "**মানুষের মধ্য থেকে কিছু হৃদয়**", "সব মানুষ" নয় — সকলের জন্য চাইলে সে জায়গায় তাদের ঠাঁই হতো না। তারপর বললেন "**ঝুঁকে পড়ে**", "আসে" নয় — আরবি এই ক্রিয়াটির অর্থ আকুলতা ও টানে কোনো কিছুর দিকে ঝরে পড়া, বাধ্য হয়ে আসা নয়। প্রথমবার কাবা দেখা মানুষের অবস্থার এ এক হুবহু বর্ণনা। এই মাপের নিখুঁত এক দোয়া, তারপর চার হাজার বছর ধরে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে চলেছে।

পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

55

সুরাকার হাতে কিসরার দুই বালা

তিনি সুরাকা ইবনে মালিককে বললেন: তোমার কেমন লাগবে যখন তুমি কিসরার দুই বালা পরবে?

বর্ণনা করেছেন বাইহাকি, ইবনে আবদুল বার ও অন্যরা

হিজরতের দিন

নবী ﷺ ধাওয়ার মুখে
আর মাথার দাম ধরা

"কেমন লাগবে যখন তুমি পরবে
কিসরার দুই বালা?"

→

উমরের খিলাফত

কিসরার দুই বালা তার হাতে
সব মানুষের সামনে

দুইয়ের মাঝে প্রায় 15 বছর... আর প্রাচ্যের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের পতন

একশো উটের লোভে যে লোকটি তাঁকে হত্যা করতে বেরিয়েছিল... তাকেই দেওয়া হলো কিসরার ধনভাণ্ডারের ওয়াদা

সহজ কথায়

হিজরতের দিন সুরাকা পুরস্কারের লোভে নবী ﷺ-এর পিছু ধাওয়া করে বেরিয়েছিল। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন: **তোমার কেমন লাগবে যখন তুমি পারস্যের বাদশাহর দুই বালা পরবে?** আর বছর কয়েক পর উমর ইবনুল খাত্তাবের খিলাফতকালে সে সত্যিই সেই দুটি পরেছিল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

যে মুহূর্তে এই কথা বলা হয়েছিল, তা **গোটা সিরাতের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্ত**: নবী ﷺ নিজের শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন, তাড়া খাওয়া অবস্থায়, তাঁর বাহন আর সঙ্গীটি ছাড়া কিছুই নেই, আর তাঁকে ধরিয়ে দিলে একশো উট পুরস্কার ঘোষিত। আর পারস্য তখন পৃথিবীর দুই মহাশক্তির একটি, আর তার বাদশাহ ব্যঙ্গ করে নবী ﷺ-এর চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উমর ইবনুল খাত্তাবের খিলাফতকালে সাসানি সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং মাদাইন বিজিত হয়, আর কিসরার ধনভাণ্ডার মদিনায় বয়ে আনা হয়। তখন উমর সুরাকা ইবনে মালিককে ডেকে পরিয়ে দিলেন **কিসরার দুই বালা, তার মুকুট ও তার কোমরবন্ধ**, আর তাকে বললেন: "বলো: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এগুলো হুরমুযপুত্র কিসরার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন আর পরিয়ে দিয়েছেন বনু মুদলিজের এক বেদুইন সুরাকা ইবনে মালিককে।" খবরটি হাদিস ও ইতিহাসের কিতাবে একাধিক সূত্রে বর্ণিত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনটি জিনিস একসঙ্গে জড়ো করেছে, যা অনুমানে কখনও মেলে না: **নাম ধরে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি** (সুরাকা), **নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত একটি বস্তু** (কিসরার দুই বালা, যেকোনো গনিমত নয়), আর **এক বিশাল রাজনৈতিক ঘটনা** (পারস্যের পতন ও তার ধনভাণ্ডার আরবদের হাতে পৌঁছানো)। আর কথাটি বলা হয়েছিল এমন একজনকে, যে তখন ছিল **পিছু ধাওয়া করা এক শত্রু**, সুসংবাদ পাওয়া সঙ্গী নয়। মন জয় করাই উদ্দেশ্য হলে অনেক ছোট প্রতিশ্রুতিই বেশি কাজে লাগত। কিন্তু তাড়া খাওয়া একজন মানুষ, যার সেদিন নিজে ছাড়া কিছুই ছিল না, সে তার ধাওয়াকারীকে পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডারের ওয়াদা দিচ্ছে — এ হলো এমন একজনের কথা, যিনি নিজের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত, আর সে উৎস মানুষের নয়।

সূত্র «الطبري – «تاريخُ الرُّسُلِ والمُلوك

পৃথিবীর আকৃতি

56 তিনি রাতকে দিনের উপর জড়িয়ে দেন

তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর জড়িয়ে দেন এবং দিনকে রাতের উপর জড়িয়ে দেন।

সূরা আয-যুমার — আয়াত 5

রাত আর দিন পৃথিবীর গোলককে ঘিরে জড়িয়ে চলে, এমন এক আবর্তনে যা কখনো থামে না

সহজ কথায়

এখানে ব্যবহৃত আরবি ক্রিয়াপদটি এসেছে গোলক বোঝানো শব্দ থেকে, আর পাগড়ি পেঁচানোর শব্দ থেকে — অর্থাৎ **গোল কোনো কিছুর উপর কোনো কিছু জড়িয়ে দেওয়া**। রাত পৃথিবীকে তেমনই জড়িয়ে ধরে, যেমন পাগড়ি মাথাকে জড়িয়ে ধরে। আর জড়ানো কেবল গোলাকার বস্তুর উপরেই হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সর্বত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল, পৃথিবী একটি বিছানো সমতল, আর রাত দিনের **জায়গা দখল করে নেয়** এবং তাকে মুছে দেয়। গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা পৃথিবীকে গোল বলেছিলেন, তাঁরাও এই কথাকে রাত ও দিনের সীমারেখার কোনো অবিরাম জড়ানো-গতির সঙ্গে যুক্ত করেননি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পৃথিবী একটি গোলক (দুই মেরুতে সামান্য চাপা), আর সূর্য সব সময় তার অর্ধেককে আলোকিত করে। নিজের অক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণন **রাত ও দিনের বিভাজন-রেখাটিকে** তার পৃষ্ঠের উপর দিয়ে অবিরাম সরিয়ে নিয়ে চলে — অর্থাৎ রাত আক্ষরিক অর্থেই গোলকটিকে জড়িয়ে ধরে, মুছে যায় না, সরে যায়। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তোলা পৃথিবীর যেকোনো সরাসরি ছবিতে আপনি নিজের চোখেই তা দেখতে পাবেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

রাত ও দিনের পালাবদল বোঝাতে গোলকের ধাতু থেকে গড়া একটি ক্রিয়াপদ বেছে নেওয়া সমতল পৃষ্ঠের উপর কোনো অর্থই রাখে না। আরও সূক্ষ্ম বিষয় হলো, আয়াতটি এই জড়ানোকে **দুই দিকেই পরস্পরমুখী** করে দেয় — "তিনি রাতকে দিনের উপর জড়িয়ে দেন এবং দিনকে রাতের উপর জড়িয়ে দেন" — আর এমন বর্ণনা কেবল সে-ই দিতে পারে, যে গোলাকার বস্তুর উপর একটি অবিরাম আবর্তন দেখছে। আর অন্যত্র এসেছে: "এরপর তিনি **পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন**" — আরবি এই ক্রিয়ার অর্থ বিছানো, প্রসারিত করা ও সমান করা, অর্থাৎ পৃষ্ঠকে বসবাসের উপযোগী করে তোলা। আর গোলাকৃতির প্রমাণের মূল ভিত্তি *তাকভীর*-এ, *দাহা*-য় নয়; কারণ দুটির মধ্যে কেবল প্রথমটিই গোলকের ধাতু থেকে এসেছে।

সূত্র NASA Earth Observatory – the day-night terminator

পানিচক্র

57 যে আকাশ ফিরিয়ে দেয়

শপথ সেই আকাশের, যা ফিরিয়ে দেয়।

সূরা আত-তারিক — আয়াত 11

পানি বাষ্প হয়ে ওঠে আর বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসে — বদ্ধ এক চক্র, যাতে কিছুই হারায় না

সহজ কথায়

আকাশ সমুদ্র থেকে পানি নেয় বাষ্প হিসেবে, তারপর তা বৃষ্টি বানিয়ে আমাদের **ফিরিয়ে দেয়**। আজ আপনি যে ফোঁটাটি পান করছেন, আপনার আগে সেটি কেউ পান করেছে, আর আপনার পরেও কেউ পান করবে। পানি ফুরায় না, ফিরে আসে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বৃষ্টিকে মনে করা হতো **নতুন** পানি, যা আল্লাহ আকাশের ভাণ্ডার থেকে নামিয়ে দেন — পৃথিবী থেকেই ফিরে আসা পানি নয়। অ্যারিস্টটল বাষ্পের উপরে ওঠা আর বৃষ্টি হয়ে ফেরার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তা মাপজোখহীন তত্ত্বই থেকে যায়; পানিচক্র যে বদ্ধ এক ব্যবস্থা, যেখানে বৃষ্টিই নদীর স্রোতের হিসাব মেটায় — তা প্রমাণিত হয় সতেরো শতকে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পানিচক্র: জলাশয় থেকে বাষ্পীভবন → মেঘে ঘনীভবন → বর্ষণ → প্রবাহ → আবার বাষ্পীভবন। পৃথিবীতে পানির পরিমাণ **শত কোটি বছর ধরে অপরিবর্তিত**, কেবল ঘুরে ফেরে, বাড়েও না কমেও না। আর বায়ুমণ্ডল শুধু পানিই ফেরায় না, তাপ আর বেতার তরঙ্গও ফিরিয়ে দেয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটিমাত্র শব্দ — "**ফিরিয়ে দেওয়া**" — গোটা অর্থটাই বহন করছে। আরবিতে এর মানে **কোনো জিনিসের নিজের জায়গায় ফিরে আসা**, নিছক নেমে আসা নয়। আকাশকে এই গুণে ডাকার অর্থই হলো এ কথা বলা যে, তা থেকে যা নামে তা আগে তার দিকেই উঠেছিল। দুটি শব্দে এ-ই গোটা পানিচক্রের সারাংশ। অন্য জায়গায় তা নিশ্চিত করা হয়েছে: "আর আমি আকাশ থেকে **নির্ধারিত পরিমাণে** পানি নামিয়েছি" — স্থির, মাপা এক পরিমাণ, যা বদলায় না।

সূত্র U.S. Geological Survey — *The Water Cycle* · The ionosphere and the reflection of radio waves

পানিচক্র

58 পরিমিত পানি — না বাড়ে, না কমে

আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি নামিয়েছি, অতঃপর তা পৃথিবীতে থিতু করেছি। আর নিশ্চয়ই আমি তা নিয়ে যেতেও সক্ষম।

সূরা আল-মুমিনুন — আয়াত 18

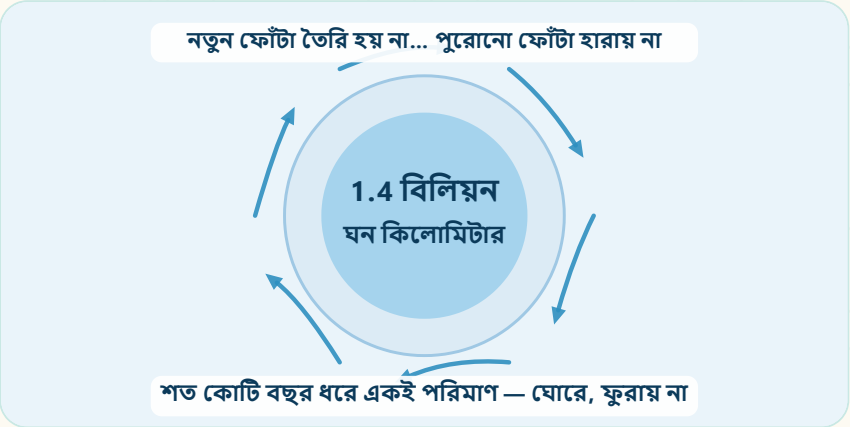

গোটা গ্রহজুড়ে পানির এক স্থির ভারসাম্য

সহজ কথায়

পৃথিবীতে পানির পরিমাণ **স্থির: না বাড়ে, না কমে**। ডাইনোসর যে পানি পান করেছিল, আজ আপনি সেই একই পানি পান করছেন। আর আয়াতের "**পরিমিতভাবে**" কথাটির অর্থ: হিসাব করা, নির্দিষ্ট পরিমাণে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বৃষ্টিকে বোঝা হতো এভাবে — মানুষের প্রয়োজন হলেই আকাশের ভাণ্ডার থেকে নতুন পানি নামিয়ে দেওয়া হয়। **একটি আবদ্ধ, স্থির পরিমাণ চক্রাকারে ঘুরছে** — এমন ধারণা কোনো সংস্কৃতিতেই ছিল না। সহজ ধারণাই তো এই যে বাষ্পীভবনে সাগরের পানি কমে যায় আর বৃষ্টি নতুন সংযোজন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পৃথিবীতে পানির আয়তন প্রায় **1.4 বিলিয়ন ঘন কিলোমিটার** বলে হিসাব করা হয়, এবং কোটি কোটি বছর ধরে তা মোটামুটি স্থির। তা বাষ্প হয়, ঘনীভূত হয়, ঝরে পড়ে, বয়ে যায় এবং ফিরে আসে — এমন এক আবদ্ধ চক্রে, যা কিছু যোগও করে না, কিছু বাদও দেয় না। বায়ুমণ্ডল ও চৌম্বকক্ষেত্র মিলে জলীয় বাষ্পকে মহাশূন্যে পালাতে দেয় না — মঙ্গলে ঠিক এটিই ঘটেনি, তাই তার অধিকাংশ পানি বাষ্প হয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে, পড়ে আছে এক মৃত মরুভূমি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"**পরিমিতভাবে**" শর্তটিই এখানে বিস্ময়, আর পরিমাণ স্থির না হলে এর কোনো অর্থই দাঁড়ায় না। পানি যদি প্রতিবার নামার সময় নতুন করে সৃষ্টি হতো, তবে তা মেপে দেওয়ার কোনো মানে থাকত না। তার চেয়েও সূক্ষ্ম এর পরের কথাটি: "**অতঃপর তা পৃথিবীতে থিতু করেছি**" — থিতু করা মানে টিকে থাকা ও জমা থাকা, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয়; পানি পৃথিবীতে সঞ্চিত, পৃথিবীর দ্বারা নিঃশেষিত নয়। তারপর শেষ সতর্কবাণী: "**আর নিশ্চয়ই আমি তা নিয়ে যেতেও সক্ষম**" — অর্থাৎ এই ভারসাম্য এমন এক অনুগ্রহ, যা তুলে নেওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানীরা আজ মঙ্গলে ঠিক তা-ই ঘটতে দেখেন: সেই গ্রহ তার আশি শতাংশেরও বেশি পানি হারিয়েছে, অবশিষ্ট আছে কেবল দুই মেরুর বরফ আর পৃষ্ঠের নিচে যা আছে তা।

সূত্র U.S. Geological Survey – how much water is there on Earth?

পৃথিবীর আকৃতি

59 আর পৃথিবীকে — এরপর তিনি বিছিয়ে দিলেন

আর এরপর তিনি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন। তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি।

সূরা আন-নাযিআত — আয়াত 30-31

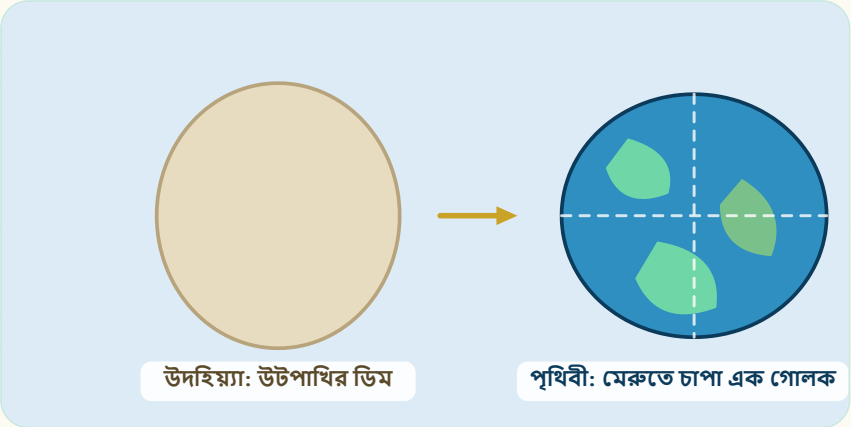

পৃথিবী নিখুঁত কোনো গোলক নয়, বরং মেরুতে চাপা আর বিষুবরেখায় স্ফীত

সহজ কথায়

আরবি ক্রিয়া *দাহা*-র অর্থ: **বিছানো, প্রশস্ত করা ও সমতল করা**। এ থেকেই এসেছে *উদহিয়্যা* — উটপাখির ডিম পাড়ার জায়গা, কারণ সে পা দিয়ে তা *দাহা* করে, অর্থাৎ বিছিয়ে দেয়। তাই পৃথিবী বিছানো, যাতে আপনি তার উপরে হাঁটেন ও বসবাস করেন — আর তার গোলাকৃতির কথা, সেটির জায়গা **"ইউকাওউইরু"**, "দাহা" নয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সাধারণ মানুষের ধারণায় পৃথিবী ছিল একটি সমতল পৃষ্ঠ, এর বেশি কিছু নয়। আর দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা একে গোল বলতেন, তাঁরা বলতেন **নিখুঁত গোলক**। মেরুতে চাপা হওয়ার কথা কেউই বলেননি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পৃথিবী একটি **চাপা গোলক** (Oblate Spheroid): বিষুবরেখায় তার ব্যাস মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত ব্যাসের চেয়ে প্রায় 43 কিলোমিটার বেশি, কারণ সে নিজের চারপাশে ঘোরে। নিউটন 1687 সালে এটি তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেন, আর ফরাসি অভিযানগুলো 1736 সালে মাঠে গিয়ে তা মেপে দেখে। জিওইড নামের নিখুঁত আকৃতিটি এই চাপা গোলক থেকে দুইশো মিটারের কমই সরে যায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ভাষাই এখানে বিষয়টি চুকিয়ে দেয়। আরবি অভিধানে *দাহা*-র অর্থ বিছিয়ে দেওয়া ও প্রশস্ত করা, আর একই ধাতু থেকে এসেছে উটপাখির বাসা ও তার ডিমের শব্দ দুটি। ধাতুটিতে গোলাকৃতি নেই: **উদহিয়্যা নামটি এসেছে বিছানো থেকে, ডিমের আকৃতি থেকে নয়** — উটপাখি পা দিয়ে নিজের জায়গাটি দাহা করে, অর্থাৎ সমান করে বিছিয়ে দেয়। গোলাকৃতির জায়গা অন্য একটি ক্রিয়া, যা গোলকের নিজস্ব ধাতু থেকেই: "তিনি রাতকে দিনের উপরে জড়িয়ে দেন"। আর এখানে "বিছানো" ও "প্রসারিত করা" বোঝানো সাধারণ ক্রিয়ার বদলে *দাহা* বেছে নেওয়া হয়েছে সমতল করা ও প্রস্তুত করার জন্য, আকৃতির জন্য নয়। আর চাবিকাঠি হলো, পরের আয়াতটিই বলে দিয়েছে বিছানোটা কীসের জন্য: "তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি" — অর্থাৎ বসবাসের প্রস্তুতি, সমতল করে দেওয়া নয়।

সূত্র Newton – *Principia*, 1687 · French Geodesic Mission to Lapland, 1736-1737

60

আধুনিক চিকিৎসা

মধুতে মানুষের জন্য আরোগ্য

তাদের পেট থেকে বের হয় বিভিন্ন রঙের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে।

সূরা আন-নাহল — আয়াত 69

কাঁচা মধু

চিকিৎসা যা প্রমাণ করেছে

- ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে
- ক্ষত ও পোড়ার চিকিৎসা করে
- শিশুদের কাশি প্রশমিত করে
- অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহনাশক
- আজ হাসপাতালে ব্যবহার হয়

চিকিৎসা-মধুর ব্যান্ডেজ ইউরোপ ও আমেরিকায় সরকারিভাবে অনুমোদিত

চিকিৎসা-মধুর ব্যান্ডেজ আজ ফার্মেসিতে সরকারি অনুমোদন নিয়ে বিক্রি হয়

সহজ কথায়

চৌদ্দশ বছর আগে কুরআন বলেছে, মধুতে **আরোগ্য** আছে। আর আজ হাসপাতালে মধু ব্যবহার করা হয় সেসব ক্ষত ও পোড়া সারাতে, যেগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যর্থ হয়েছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মধু ছিল মিষ্টি ও মূল্যবান খাদ্য, আর লোকায়ত অভিজ্ঞতা তাকে নানা উপকারের কৃতিত্ব দিত। কিন্তু ঐশী ঘোষণার ভঙ্গিতে এ কথা বলা যে তাতে **আরোগ্য** আছে — সেটি আলাদা ব্যাপার; বিশেষত যখন তা বেরোয় একটি পোকার পেট থেকে, যেখান থেকে বুদ্ধি কোনো উপকার আশাই করে না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মধু তিনটি কৌশলে প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক: তার চিনির ঘনত্ব ব্যাকটেরিয়া থেকে পানি টেনে নিয়ে তাদের মেরে ফেলে; তার অম্লতা তাদের বাড়তে দেয় না; আর তার ভিতরের এনজাইম গ্লুকোজ অক্সিডেজ ধীরে ও অবিরামভাবে **হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড** তৈরি করে। সরকারি ওষুধ-সংস্থাগুলো দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের জন্য ম্যানুকা মধুর ব্যান্ডেজ অনুমোদন করেছে, আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিশুদের কাশি উপশমে মধুর সুপারিশ করে। ফেরাউনি সমাধিতে পাওয়া মধু তিন হাজার বছর পরেও খাওয়ার উপযুক্ত ছিল।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সূক্ষ্মতার দুটি জায়গা লোকায়ত অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রথম: "বিভিন্ন **রঙের**" — আজ এটি জানা সত্য যে মধুর রং আর তার ঔষধি গুণ উদ্ভিদ-উৎস অনুযায়ী বদলায়, আর সে কারণেই তার নিরাময়ী ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হয়। দ্বিতীয়: "তাদের **পেট** থেকে বের হয়" — মধু আসলে তৈরি হয় **মধু-পাকস্থলীতে**, যা হজমের পাকস্থলী থেকে আলাদা একটি ভিতরের থলি; সেখানেই এনজাইম যুক্ত হয়, তারপর তা উদ্গিরণ করা হয়। বাণীটি সঠিক শারীরস্থানগত উৎসকে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করেছে।

সূত্র Cochrane Review – honey as a topical treatment for wounds · Cochrane Review – honey for acute cough in children

সূর্যের গতি

61 সূর্য ছুটে চলেছে... স্থির নয়

> আর সূর্য চলছে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।
>
> **সূরা ইয়াসীন — আয়াত 38**

সূর্য তার সব গ্রহকে সঙ্গে টেনে নিয়ে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে সাঁতরে চলে

সহজ কথায়

সূর্য নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। তা প্রচণ্ড গতিতে **ছুটে চলেছে**, আর সঙ্গে টেনে নিচ্ছে পৃথিবী ও সব গ্রহকে — আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রকে ঘিরে এক দীর্ঘ যাত্রায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষ সূর্যকে উঠতে ও অস্ত যেতে দেখত, তাই ভাবত এর গতি মানে কেবল পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরা। এরপর এল আধুনিক যুগ, যা বলল: না, ঘোরে বরং পৃথিবীই, আর **সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে স্থির**। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক জুড়ে এটিই ছিল প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সূর্য প্রকৃতই তিনটি প্রমাণিত গতিতে চলছে: প্রায় প্রতি 25 দিনে একবার নিজ অক্ষে ঘোরে; আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রকে ঘিরে ছুটছে সেকেন্ডে প্রায় **220 কিলোমিটার** বেগে, প্রতি 225 মিলিয়ন বছরে একটি পূর্ণ চক্কর দিয়ে; আর আকাশের একটি বিন্দুর দিকেও এগিয়ে চলেছে, যাকে বলা হয় সৌর অ্যাপেক্স।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন বৈপরীত্যটি: আয়াতটি নাজিল হয়েছিল তখন, যখন মানুষ ভাবত সূর্য তাদের চারদিকে ঘোরে — আর আয়াত সূর্যের জন্য সাব্যস্ত করল ছুটে চলা। এরপর এল এমন এক যুগ, যা সূর্যের সব গতি অস্বীকার করে বলল "তা স্থির"; তখন আয়াতটিকে বিজ্ঞানবিরোধী মনে হলো। তারপর আরও নতুন বিজ্ঞান এসে প্রমাণ করল এমন বাস্তব ছুটে চলা, যা **কারও কল্পনার চেয়েও বিশাল**। একটিমাত্র বাক্য বিজ্ঞানের দুটি পূর্ণ উল্টো-মোড়ের সামনে অটল থাকল — এটুকুই তো দলিল।

সূত্র Binney & Tremaine – *Galactic Dynamics* · *Britannica* – "Milky Way Galaxy"

বায়ুমণ্ডল

62 এক ছাদ আপনাকে বাঁচায়, অথচ আপনি তা দেখেন না

> আর আমি আকাশকে বানিয়েছি সুরক্ষিত ছাদ; অথচ তারা তার নিদর্শন থেকে বিমুখ।
>
> **সূরা আল-আম্বিয়া — আয়াত 32**

আপনি ঘরে ঘুমিয়ে থাকেন, আর প্রতিদিন হাজারো উল্কা আপনার কাছে পৌঁছানোর আগেই পুড়ে যায়

সহজ কথায়

আপনার মাথার উপরে এমন এক ছাদ আছে, যা আপনি দেখেন না, অথচ তা আপনাকে রক্ষা করে। আমাদের দিকে ছুটে আসা উল্কা পৌঁছানোর আগেই তাতে পুড়ে যায়, আর প্রাণঘাতী রশ্মি তা আটকে দেয়। **এটি না থাকলে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী মারা যেত**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের কাছে "আকাশ" ছিল হয় ফাঁকা শূন্য, নয়তো একটি শক্ত গম্বুজ, যাতে তারাগুলো গাঁথা। আমাদের উপরে যে **অদৃশ্য একটি স্তর রক্ষার কাজ করে যাচ্ছে**, তা কারও মাথায়ই আসেনি। জ্বলন্ত উল্কাকে তারা ভাবত খসে পড়া তারা, ঢালে পুড়ে যাওয়া উল্কাপিণ্ড নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বায়ুমণ্ডল প্রতিদিন আনুমানিক একশ টন মহাজাগতিক বস্তু পৌঁছানোর আগেই পুড়িয়ে দেয়। ওজোন স্তর প্রাণঘাতী অতিবেগুনি রশ্মির প্রায় 99% শুষে নেয়। আর পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র ঠেকিয়ে দেয় **সৌরবায়ু**, যা নইলে পৃথিবীকে তার বাতাস ও পানি থেকে বঞ্চিত করে ছাড়ত — ঠিক যেমনটা মঙ্গলের বেলায় হয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"ছাদ" আর "সুরক্ষিত" — এই দুই শব্দের একত্র হওয়াই অলৌকিক। ছাদ বোঝায় সর্বব্যাপী আচ্ছাদন, আর আরবি কর্মবাচক বিশেষণটি বোঝায় যে তা **নিজে সুরক্ষিত এবং নিচের সবকিছুকে সুরক্ষা দেয়**। এরপর এল পরের বাক্যটি: "অথচ তারা তার নিদর্শন থেকে বিমুখ" — অর্থাৎ এই ছাদে এমন **নিদর্শন** আছে, যেগুলো থেকে মানুষ উদাসীন থাকবে। এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত যে এর ভেতরে এমন বিস্ময় আছে, যা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। হয়েছেও তাই: ওজোন **স্তর** আবিষ্কৃত হয়নি 1913 সালের আগে, আর সৌরবায়ু ঠেকাতে চৌম্বকক্ষেত্রের ভূমিকা জানা যায়নি 1958 সালে ভ্যান অ্যালেন বলয় আবিষ্কারের আগে।

সূত্র Fabry & Buisson (1913) — the ozone layer · Van Allen (1958) — the radiation belts

উল্কা

63 যে উল্কারা আকাশ পাহারা দেয়

আর নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সাজিয়েছি, আর সেগুলোকে করেছি শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের বস্তু।

সূরা আল-মুলক — আয়াত 5

বুলেটের চেয়েও দ্রুত গতিতে বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময় উল্কা জ্বলে ওঠে

সহজ কথায়

আয়াতটি নক্ষত্র আর আলোকোজ্জ্বল বস্তুগুলোকে একসঙ্গে দুটি কাজ দেয়: **আকাশের সৌন্দর্য**, আর **উপরে উঠে আসার চেষ্টা করলে যা ছুড়ে মেরে তাড়িয়ে দেয়**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবদের চোখে উল্কা ছিল "খসে পড়া তারা", আর অন্য সংস্কৃতিতে কোনো রাজার মৃত্যু বা কোনো বড় ঘটনার লক্ষণ। এগুলো যে **কঠিন বস্তু, ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে** — তা জানা ছিল না। বরং প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অস্বীকার করে এসেছে যে আকাশ থেকে পাথর পড়তে পারে, আর ফরাসি অ্যাকাডেমি এমন দাবিদারদের উপহাস করেছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উল্কাপিণ্ড হলো পাথুরে ও ধাতব বস্তু, যা সেকেন্ডে কয়েক দশ কিলোমিটার গতিতে বায়ুমণ্ডলে ঢোকে, আর বাতাসের চাপ ও তাপে তাদের অধিকাংশই পুরোপুরি পুড়ে যায়। প্রতিদিন ঢোকা ভরের পরিমাণ আনুমানিক **একশো টন**। 1803 সালে ফ্রান্সের লেগল ঘটনার পর উল্কাপাত বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি আকাশের বস্তুগুলোর দুটি ভিন্ন কাজ আলাদা করেছে: স্থির সৌন্দর্য, আর **চলমান নিক্ষেপ**। আরবিতে যে শব্দটি এসেছে তার অর্থ নির্দিষ্টভাবে পাথর ছুড়ে মারা — আলো দিয়ে নয়, আগুন দিয়েও নয়। আকাশ থেকে জ্বলতে জ্বলতে নেমে আসা জিনিসকে নিক্ষিপ্ত পাথর বলা, আর তাও এমন এক সময়ে, যখন প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান এরও শতাব্দী পরে পর্যন্ত অস্বীকার করত যে আকাশে আদৌ পাথর আছে — এমন বর্ণনা কাকতালীয় হতে পারে না।

সূত্র Biot (1803) – the L'Aigle meteorite fall

প্রত্নতত্ত্ব

64 যুলকারনাইনের প্রাচীর — লোহা আর গলিত তামা

আমার কাছে লোহার পাত আনো — অবশেষে যখন সে দুই পাহাড়ের মাঝের ফাঁক সমান করে দিল, তখন বলল: হাপরে ফুঁ দাও। অবশেষে যখন সে তাকে আগুন বানিয়ে ফেলল, তখন বলল: আমার কাছে গলিত তামা আনো, আমি তার উপর ঢেলে দিই।

সূরা আল-কাহফ — আয়াত 96

লোহার উপর গলিত তামা ঢালা ফাঁকগুলো ভরে দেয় আর মরিচা ঠেকায়

সহজ কথায়

যুলকারনাইন দুই পাহাড়ের মাঝে একটি দেয়াল গড়লেন: **লোহার টুকরোগুলো** ঠেসে সাজালেন, তারপর আগুন জ্বালালেন যতক্ষণ না সেগুলো লাল হয়ে উঠল, তারপর তার উপর ঢাললেন **গলিত তামা**। এটিই হুবহু সেই পদ্ধতি, যা দিয়ে মরিচা-না-ধরা অত্যন্ত শক্ত সংকর ধাতু তৈরি হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ধাতু সম্পর্কে জ্ঞান ছিল সহজ-সরল: লোহা গরম থাকতেই পেটানো হয়, আর তামা ঢালা হয় ছাঁচে। **দুটি ধাতুকে গলিয়ে এক কাঠামোয় মিশিয়ে দেওয়ার** ভাবনাটি নির্মাণকৌশল হিসেবে জানা ছিল না, আর একটিকে উত্তপ্ত অবস্থায় অন্যটির উপর কেন ঢালতে হবে, তাও জানা ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উত্তপ্ত লোহার উপর গলিত তামা ঢাললে যা তৈরি হয় তা **তামা দিয়ে ঝালাই বা ব্রেজিংয়ের** মতো: তরল তামা কৈশিক ক্রিয়ায় টুকরোগুলোর ফাঁকে ঢুকে পড়ে, সেগুলোকে শক্ত করে বাঁধে আর বাতাস বের করে দেয়। ফলাফল একটি নিরেট, অখণ্ড পিণ্ড, যাতে কোনো ফাঁপা জায়গা নেই। তামার আবরণ আবার **লোহাকে বাতাস ও আর্দ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে, আর তাই মরিচা ঠেকায়** — এটিই আজ ব্যবহৃত ধাতব প্রলেপের মূলনীতি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ধাপগুলোর ক্রমই এখানে বিস্ময়, আর এটি এমন এক প্রকৌশলগত ক্রম যার বদলে অন্য কিছু চলে না: 1) **লোহার পাত** — আরবি শব্দটির অর্থ বড় খণ্ড, অর্থাৎ ভার বহনকারী কাঠামোটি লোহার। 2) **ফুঁ দাও** — অর্থাৎ তাপ বাড়াতে বাতাস জোগানো, ঢালাইখানায় হাপর ঠিক এ কাজটিই করে। 3) **অবশেষে যখন সে তাকে আগুন বানিয়ে ফেলল** — অর্থাৎ লোহা সেই লাল তাপমাত্রায় পৌঁছাল, যেখানে তা জোড়া লাগা মেনে নেয়। 4) **তারপর তার উপর গলিত তামা ঢালা**। ঠান্ডা লোহার উপর তামা ঢালা হলে কোনো বন্ধনই তৈরি হতো না। বাণীটি ঢালার আগের তাপের শর্তটিই বর্ণনা করছে — আর সেটিই গোটা প্রক্রিয়ার প্রাণ।

সূত্র ASM Handbook 6 – *Welding, Brazing, and Soldering*

65

কক্ষপথ

সূর্য চাঁদকে ধরতে পারে না

সূর্যের জন্য সংগত নয় যে সে চাঁদকে গিয়ে ধরবে, আর রাতও দিনকে অতিক্রম করে যায় না; প্রত্যেকেই এক কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।

সূরা ইয়াসিন — আয়াত 40

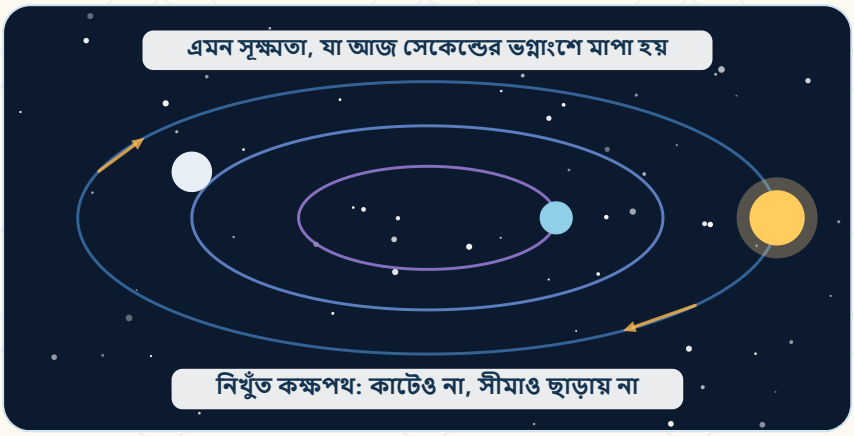

প্রতিটি জ্যোতিষ্ক নিজের পথে স্থির, পথ ছাড়ে না, অন্যকেও ধরে না

সহজ কথায়

মহাকাশের জ্যোতিষ্কগুলো চলে বিপুল গতিতে, তবু **একটি আরেকটির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় না**; রাত দিনকে না পেরিয়ে যায়, না পিছিয়ে পড়ে। এমন এক ব্যবস্থা, যা চোখের পলকের জন্যও এলোমেলো হয় না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জ্যোতিষ্কগুলোর গতি, তাদের কক্ষপথ কিংবা তাদের চলার নিয়ম — কোনো কিছুরই জ্ঞান ছিল না। গ্রহণকে ব্যাখ্যা করা হতো ক্রোধ বা সতর্কবার্তা বলে, **শত শত বছর আগে হিসাব করে বের করা যায় এমন নির্ধারিত সময়** বলে নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

জ্যোতিষ্কগুলোর কক্ষপথ এমন সূক্ষ্মতায় নিয়ন্ত্রিত যে জ্যোতির্বিদেরা বিস্মিত হন। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে নিজের কক্ষপথ পাড়ি দেয় সেকেন্ডে 30 কিলোমিটার বেগে, চাঁদ ঘোরে পৃথিবীকে ঘিরে — আর কোনো সংঘর্ষ ঘটে না। ব্যবস্থার নিখুঁততা এমন যে **এই শতকের গ্রহণগুলো সেকেন্ডের হিসাবে গণনা করা যায়**, আর হাজার বছর পরের গ্রহণ কয়েক দশ মিনিটের হিসাবে — এই পার্থক্যের কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির পরিবর্তন, কক্ষপথের কোনো শিথিলতা নয়। এই নিয়মনিষ্ঠার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে গোটা মহাকাশ-নৌচালনা: আজ ছোড়া একটি যান সাত বছর পরে আগে থেকেই হিসাব করা এক বিন্দুতে গিয়ে গ্রহের সঙ্গে মিলিত হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"**সংগত নয়**" কথাটিই নিখুঁততার জায়গা। এটি কেবল ঘটনাটি ঘটে না তা বলছে না, বরং **সম্ভাবনাকেই** অস্বীকার করছে — অর্থাৎ ব্যবস্থাটি নিজেই তা ঘটতে দেয় না; কাকতালীয়ভাবে ঘটেনি, ব্যাপারটি এমন নয়। আর এটিই তো **ভৌত সূত্রের** সংজ্ঞা। এরপর সূক্ষ্মতাটি লক্ষ করুন: অস্বীকার করা হলো সূর্যের চাঁদকে ধরা — অথচ এরা দুটি ভিন্ন কক্ষপথে; আর অস্বীকার করা হলো রাতের দিনকে অতিক্রম করা — অথচ এ দুটিই পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফল। কারণে ভিন্ন দুটি ঘটনাকে একটিই নিয়মের নিচে জড়ো করা হলো: "**প্রত্যেকেই এক কক্ষপথে সাঁতার কাটছে**" — দুই ক্ষেত্রেই কারণ একটিই: প্রতিটি জ্যোতিষ্ক নিজের কক্ষপথে বাঁধা।

সূত্র Newton – *Principia*, 1687 (orbital mechanics)

66

সূক্ষ্ম সমন্বয়

দয়াময়ের সৃষ্টিতে আপনি কোনো অসংগতি দেখবেন না

তিনিই সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। পরম দয়াময়ের সৃষ্টিতে আপনি কোনো অসংগতি দেখবেন না। আপনি আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন — কোনো ফাটল কি চোখে পড়ে?

সূরা আল-মুলক — আয়াত 3

- মাধ্যাকর্ষণ বল: একটু বাড়লেই বিশ্বজগৎ পিষে যেত
- নিউক্লিয় বল: একটু কমলে একটি মৌলও তৈরি হতো না
- বিশ্বজগতের আদি ঘনত্ব: কল্পনার অতীত এক সমন্বয়
- কৃষ্ণশক্তির ধ্রুবক: পদার্থবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম সংখ্যা

"আবার তাকান — কোনো ফাটল দেখতে পান?"

মহাবিশ্বের ধ্রুবকগুলো এমন সীমায় বাঁধা, যা সামান্যতম বিচ্যুতিও সয় না

সহজ কথায়

আয়াতটি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছে — মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে তাতে **কোনো ত্রুটি, ফাটল বা ঘাটতি** খুঁজে বের করুন। তারপর আবার বলছে: দ্বিতীয়বার তাকান। আর বিজ্ঞান আজ বলে, মহাবিশ্বের ধ্রুবকগুলো এমন নিখুঁতভাবে বাঁধা যা মন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মহাবিশ্বকে দেখা হতো সাধারণ সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে। "ভৌত ধ্রুবক" বলে কোনো ধারণাই ছিল না, ছিল না এ ধারণাও যে মহাবিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো সংখ্যার উপর, যার একটিও সামান্য বদলে গেলে সবকিছু ভেঙে পড়বে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান একে বলে **সূক্ষ্ম সমন্বয়** (Fine-Tuning)। মাধ্যাকর্ষণের বল যদি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেও ভিন্ন হতো, নক্ষত্র কখনো তৈরি হতো না, কিংবা মহাবিশ্ব তৎক্ষণাৎ চুপসে যেত; সবল নিউক্লিয় বল সামান্য ভিন্ন হলে কার্বনও থাকত না, অক্সিজেনও নয়; আর কৃষ্ণশক্তির ধ্রুবককে বলা হয় **সমগ্র পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্যপ্রাপ্ত সংখ্যা**। বড় বড় পদার্থবিজ্ঞানীরা এ কথা স্বীকার করেছেন — যেমন ফ্রেড হয়েল, যিনি বলেছিলেন, তিনি যা দেখছেন তা যেন "কোনো অতিমেধা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে খেলা করেছে"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি নিছক ঘোষণা নয়, বরং **পরীক্ষা করার এবং বারবার পরীক্ষা করার স্পষ্ট আহ্বান**: "আপনি দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন", তারপর "আরও দুইবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন"। অর্থাৎ এটি বাজি ধরছে যে নিবিড়তর যাচাই **একে খণ্ডন করবে না, বরং আরও দৃঢ় করবে**। আক্ষরিক অর্থেই তা-ই ঘটেছে: পর্যবেক্ষণযন্ত্র যত সূক্ষ্ম হয়েছে, সমন্বয় তত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরবি শব্দ "**ফুতুর**" মানে ফাটল ও চিড়, আর "**তাফাউত**" মানে বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য। সুতরাং আয়াতটি মহাবিশ্ব থেকে দুটি বৈশিষ্ট্য নাকচ করছে: অনুপাতের ত্রুটি আর কাঠামোর ফাটল — আর একজন পদার্থবিজ্ঞানী কোনো মহাজাগতিক মডেল যাচাই করার সময় ঠিক এ দুটোই খোঁজেন।

সূত্র Martin Rees – *Just Six Numbers*, 1999 · Weinberg (1989) – the cosmological constant problem

67

আলো ও সময়

নক্ষত্রের অবস্থানের শপথ — নক্ষত্রের নয়

অতএব আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অবস্থানসমূহের — আর নিশ্চয় এটি এক মহান শপথ, যদি আপনারা জানতেন।

সূরা আল-ওয়াকিয়া — আয়াত 75-76

নক্ষত্রের আলো বহু বছর ধরে পথ চলে, তাই আপনি দেখছেন তার পুরোনো অবস্থান, এখন সে যেখানে আছে তা নয়

সহজ কথায়

রাতের আকাশে কোনো নক্ষত্রের দিকে তাকালে আপনি আসলে নক্ষত্রটিকে দেখছেন না! আপনি দেখছেন **বহু বছর আগে তার থেকে বেরিয়ে আসা আলো**, হয়তো হাজার হাজার বছর আগের। হতে পারে নক্ষত্রটি নিজেই নিভে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে, অথচ আপনি এখনো তাকে দেখছেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

অ্যারিস্টটল ও তাঁর অনুসারীদের কাছে আলো কোনো সময় না নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবেই প্রকাশ পেত; এম্পিডোক্লিসের মতো গুটিকয় ছাড়া কেউ দ্বিমত করেননি, তাও কোনো প্রমাণ ছাড়া। নক্ষত্র বলতে যা আপনি দেখছেন তা-ই, ঠিক যেখানে দেখছেন সেখানেই — ব্যস, এইটুকুই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আলোর গতি সেকেন্ডে প্রায় 300,000 কিলোমিটার — দ্রুত বটে, কিন্তু **সীমিত**। সূর্যের পর আমাদের নিকটতম নক্ষত্রটি 4.2 আলোকবর্ষ দূরে, আর খালি চোখে আমরা যা দেখি তার কিছু কিছু হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে। তাই আজ রাতে আপনি যে আকাশ দেখছেন তা **পুরোনো ছবির একটি অ্যালবাম**, যার প্রতিটি নক্ষত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ের। এমন নক্ষত্রও সত্যিই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটেছে শতাব্দী আগে, অথচ তাদের আলো এখনো আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

শপথ করা হয়েছে নক্ষত্রগুলোর নয়, বরং **তাদের অবস্থানের** — এমন সুনির্দিষ্ট করার কোনো কারণই থাকে না, যদি না নক্ষত্র আর তার অবস্থানের মধ্যে সত্যিকারের কোনো পার্থক্য থাকে। এরপর পরের আয়াতটি স্পষ্ট করেই বলে দেয়: "আর নিশ্চয় এটি এক মহান শপথ, **যদি আপনারা জানতেন**" — অর্থাৎ এই শপথের মহত্ত্ব নির্ভর করছে এমন এক জ্ঞানের উপর, যা শ্রোতাদের কাছে ছিল না। একটি বক্তব্য খোলাখুলি বলছে: এখানে একটি রহস্য আছে, যা আপনারা পরে জানবেন। আর তা জানা গেছে।

সূত্র U.S. Naval Observatory – *Explanatory Supplement* (light-travel time)

পরিবেশবিদ্যা

68 আপনাদেরই মতো জাতি

আর যমীনে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, আর নিজের দুই ডানায় উড়ে এমন কোনো পাখিও নেই, যারা আপনাদেরই মতো এক একটি জাতি নয়

সূরা আনআম — আয়াত 38

নিয়ম, যোগাযোগ, শ্রমবিভাজন ও শিক্ষা আছে এমন সমাজ

প্রাণীরা বিক্ষিপ্ত কিছু ব্যক্তি নয়, বরং সুসংগঠিত সমাজ

সহজ কথায়

কুরআন প্রাণীদের **"জাতি"** বলেছে — আর জাতি মানে এমন একটি দল, যার নিজস্ব নিয়ম আছে, ভাষা আছে, রীতি আছে। আর বলেছে, তারা "আপনাদেরই মতো"। আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করছে, প্রাণীদের সমাজ অত্যন্ত সুসংগঠিত।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পিঁপড়া আর মৌমাছির দলবদ্ধ জীবন প্রাচীনেরা লক্ষ করেছিলেন; অ্যারিস্টটল তো তাদের মানুষের সঙ্গে এক শ্রেণিতেই রেখেছিলেন। কিন্তু সবটাই রয়ে গেল বাইরের বর্ণনা, যার পুরোটাকে ফিরিয়ে দেওয়া হতো একটি অপরিবর্তনীয় সহজাত প্রবৃত্তির দিকে: শেখা কোনো ভাষা নেই, হস্তান্তরিত কোনো সংস্কৃতি নেই, আঞ্চলিক কোনো উপভাষা নেই। আর পশু ও মানুষের ব্যবধান ছিল চূড়ান্ত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

প্রাণী-আচরণ বিজ্ঞান সত্যিকারের সমাজের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে: পিঁপড়া ও মৌমাছির মধ্যে কঠোর শ্রমবণ্টন; তিমি ও ডলফিনের জটিল যোগাযোগ-ভাষা, যার **আঞ্চলিক উপভাষা** পর্যন্ত আছে; শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে শিখে শিখে হস্তান্তরিত সংস্কৃতি; পাখিদের সুসংগঠিত পরিযান ও পালাবদল করা নেতৃত্ব; এমনকি পাতাকাটা পিঁপড়ার "কৃষি"-ব্যবস্থা, যারা মাটির নিচে খামারে ছত্রাকের চাষ করে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

মুজিযা দুটি শব্দে। "**জাতি**": আরবিতে এটি অভিন্ন স্বার্থে বাঁধা সুসংগঠিত দল, নিছক পশুপাল নয়। আর "**আপনাদেরই মতো**": অর্থাৎ নিজস্ব নিয়মওয়ালা সমাজ হওয়ায় আপনাদের মতো — বুদ্ধি ও শরিয়তি দায়িত্বে আপনাদের মতো নয়। অথচ সেদিন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান প্রাণীর সংস্কৃতি বা ভাষা মানতে অস্বীকার করত, একে অবৈজ্ঞানিক মানবারোপ গণ্য করত — তারপর প্রমাণের সামনে পিছু হটেছে। আর "নিজের **দুই ডানায়** উড়ে" কথাটি লক্ষণীয় নির্দিষ্টকরণ, কেননা তা দুই ডানা ছাড়া যা ওড়ে তাকে বাদ দেয়।

সূত্র Hölldobler & Wilson – *The Ants*, 1990 · Frans de Waal – *Are We Smart Enough…*, 2016

প্রাণিবিজ্ঞান

69 দুর্বলতম ঘর… আর স্ত্রী মাকড়সা

যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মতো — সে একটি ঘর বানিয়ে নিল; আর নিশ্চয়ই সব ঘরের মধ্যে দুর্বলতম হলো মাকড়সার ঘর

সূরা আনকাবুত — আয়াত 41

মাকড়সার ঘর

- স্ত্রীটি একাই তা বানায়
- পুরুষটি বানায় না
- কখনো পুরুষটিকেই খেয়ে ফেলে
- নিজের বাচ্চা খেয়ে ফেলে
- আদৌ নিরাপত্তা নেই যে ঘরে

তার সুতো ইস্পাতের চেয়ে শক্ত… আর তার ঘর সবচেয়ে দুর্বল

দুর্বলতা সুতোয় নয়, এই "ঘরের" ভেতরকার সম্পর্কে

সহজ কথায়

আমরা মাকড়সার যে ঘর দেখি, তা বানায় **পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী মাকড়সা**; পূর্ণবয়স্ক পুরুষের তাতে কোনো অংশ নেই। আর তা দুর্বলতম ঘর এ কারণে নয় যে তার সুতো দুর্বল — বরং এ কারণে যে তা **মমতাহীন, নিরাপত্তাহীন একটি ঘর**: স্ত্রী মাকড়সা তার সঙ্গীকে খেয়ে ফেলতে পারে, বাচ্চাদেরও।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মাকড়সা প্রতিটি ঘরের চেনা প্রাণী, আর তার জাল দুর্বলতার প্রকাশ্য উদাহরণ। কিন্তু জাল কে বোনে — পুরুষ না স্ত্রী — এই পার্থক্য, আর জালের ভেতরে যে হত্যাযজ্ঞ চলে, তা জানা ছিল না; এসব এমন খুঁটিনাটি, যা কেবল সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণেই ধরা পড়ে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

শিকারের যে জাল আমরা দেখি, তার বিপুল অধিকাংশই বোনে **পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী মাকড়সা**; ছোট অবস্থায় পুরুষ-স্ত্রী দুইই সুতো কাটে, কিন্তু পুরুষ পূর্ণবয়স্ক হলে অধিকাংশ প্রজাতিতে সে শিকারের জাল বোনা ছেড়ে দেয় এবং স্ত্রীর খোঁজে ঘুরে বেড়ানো ভবঘুরে হয়ে যায়। কয়েক ডজন প্রজাতিতে স্ত্রী মাকড়সা মিলনের পর পুরুষটিকে মেরে খেয়ে ফেলে, আর অন্য কিছু প্রজাতিতে বাচ্চারা মাকে খায়, কিংবা মা বাচ্চাদের। আর সুতোটি নিজে পরিচিত সবচেয়ে মজবুত উপাদানগুলোর একটি: ওজনের হিসাবে ইস্পাতের চেয়েও শক্ত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুর্বলতা যদি সুতোর মজবুতিতে হতো, তবে বিজ্ঞান এই বক্তব্য খণ্ডন করে দিত, কেননা প্রমাণিত যে মাকড়সার সুতো প্রকৃতির সবচেয়ে দৃঢ় বস্তুগুলোর একটি। কিন্তু আয়াত বলছে **ঘরের** কথা, সুতোর কথা নয়; আর আরবিতে ঘর মানে পরিবার, আশ্রয় ও নিরাপত্তা। পুরো প্রসঙ্গটিই **এমন এক নষ্ট সম্পর্ক নিয়ে, যা তার ধারককে কোনো উপকারেই আসে না**। কাজেই বর্ণনাটি সামাজিকভাবে নিখুঁত, বস্তুগতভাবে নয়। আর তা নিশ্চিত করে ক্রিয়াপদটির স্ত্রীলিঙ্গ রূপ: "**ইত্তাখাযাত** বাইতান" — ঘরটি সে-ই বানিয়েছে, পুরুষ নয়।

সূত্র Foelix – *Biology of Spiders* · Vollrath & Knight (2001), Nature 410

70

অণুজীববিজ্ঞান

এক ডানায় রোগ, অন্য ডানায় আরোগ্য

আপনাদের কারো পানীয়ে মাছি পড়লে তিনি যেন তা পুরোপুরি ডুবিয়ে দেন, তারপর তুলে ফেলেন; কেননা তার এক ডানায় রোগ আর অন্যটিতে আরোগ্য আছে

বর্ণনা করেছেন বুখারি — সহিহ

ব্যাকটেরিওফাজ (Bacteriophages): যে ভাইরাস কেবল ব্যাকটেরিয়াই মারে

1915 সালে আবিষ্কৃত — আজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত

ব্যাকটেরিওফাজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশিসংখ্যক জীব, আর তাদের একমাত্র কাজ ব্যাকটেরিয়া মারা

সহজ কথায়

মাছি জীবাণু বহন করে — এটা জানা কথা। কিন্তু হাদিস আরেকটি কথা বলছে: তার সঙ্গে **ঐ জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলার জিনিসও** আছে। আর বিজ্ঞান সত্যিই এমন অণুজীবের সন্ধান পেয়েছে, যাদের একমাত্র কাজ ব্যাকটেরিয়া শিকার করা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্বই জানা ছিল না — 1676 সালে লিউয়েনহুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আগে তা কেউ দেখেনি। কাজেই মাছির বহন করা "রোগ"-এর কথা জীবাণুতত্ত্বের হাজার বছর আগের। আর তার সঙ্গে **আরোগ্য** থাকার কথাটি বোঝার মতো কোনো কাঠামোই তখন ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ব্যাকটেরিওফাজ (Bacteriophages): অতিক্ষুদ্র ভাইরাস, যারা কেবল ব্যাকটেরিয়াকেই আক্রমণ করে ও মেরে ফেলে; 1915 সালে টোর্ট এবং 1917 সালে দ্যরেল এদের আবিষ্কার করেন। এরা **পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক জীব**, আর যেখানে ব্যাকটেরিয়া বেশি সেখানেই এরা জমে — অর্থাৎ মাছির গায়ে ও তার বাসস্থানে। ঘরোয়া মাছির গায়ে এদের সত্যিই পাওয়া গেছে। আর ফাজ-চিকিৎসা আজ প্রতিষ্ঠিত একটি চিকিৎসা-শাখা, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যর্থ হলে যা কাজে লাগানো হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

হাদিস কেবল আরোগ্যের কথা বলেই থামেনি, বরং **একটি ব্যবহারিক করণীয়** দিয়েছে: পুরোপুরি ডুবিয়ে দেওয়া। এখানেই ইঙ্গিতের জায়গা — কেননা ডুবানোর কোনো অর্থই হয় না, যদি না জীবাণুনাশকটিকে কাজ করার জন্য তরলে ছাড়তে হয়। এরপর **দুই ডানার** মধ্যে পার্থক্য: একটি বহন করে ক্ষতি, অন্যটি প্রতিকার। কথা বানিয়ে বলতে বসলে এমন ভাগ কারো মাথায় আসে না; স্বাভাবিক কথা হতো "মাছিতে রোগ আছে, ওষুধও আছে"। কিন্তু দুটিকে আলাদা ডানার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া এমন নির্দিষ্টকরণ, যা পরীক্ষার যোগ্য — আর বিজ্ঞান এসে তা সত্য প্রমাণ করেছে।

সূত্র Twort (1915) · d'Hérelle (1917) – bacteriophages · Leeuwenhoek – the first sight of bacteria, 1676 · Eliava Institute, Tbilisi – phage therapy

71

পৃথিবীর ভূত্বক

সেই পৃথিবী, যা ফাটলে ভরা

শপথ সেই আকাশের, যা ফিরিয়ে দেয়; আর সেই পৃথিবীর, যা ফেটে যায়।

সূরা আত-তারিক — আয়াত 11-12

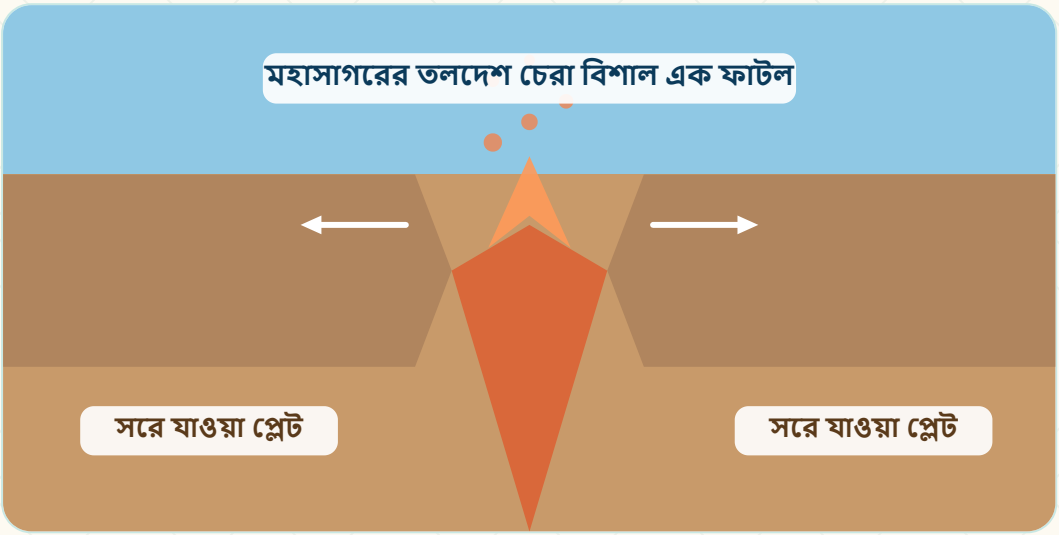

মহাসাগরের তলায় গোটা পৃথিবীকে জড়িয়ে থাকা ফাটলের এক শিকল, লম্বায় 65,000 কিলোমিটার

সহজ কথায়

পৃথিবী নিরেট, অখণ্ড কোনো গোলক নয়। তার ভূত্বক **ফাটা** — তাতে রয়েছে বিশাল সব ফাটল, যেগুলো গোটা গ্রহকে জড়িয়ে আছে, আর যেগুলো দিয়ে গভীর থেকে গলিত পাথর উঠে আসে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পৃথিবীকে ভাবা হতো একটিমাত্র নিরেট, জোড়া-লাগা বস্তু। আর গোটা পৃথিবীকে "ফাটলে ভরা" — অর্থাৎ ফাটা — বলার কোনো অর্থই তখন কারও অভিজ্ঞতায় ছিল না; চোখে পড়া ফাটল বলতে ছিল শুকনো জমির চৌচির হওয়া বা উপত্যকার খাত, এর বেশি কিছু নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

একে বলা হয় **মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরা** (Mid-Ocean Ridge): প্রায় 65,000 কিলোমিটার লম্বা আগ্নেয় ফাটলের একটি শিকল, যা টেনিস বলের সেলাইয়ের মতো গোটা গ্রহকে ঘিরে পাক খেয়ে যায়। তা থেকে গলিত পদার্থ উঠে এসে নতুন ভূত্বক গড়ে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে শব্দতরঙ্গ যন্ত্র (সোনার) দিয়েই এটি ধরা পড়ে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে শপথটি পৃথিবীকে বর্ণনা করছে **একটি সামগ্রিক, সহজাত বৈশিষ্ট্য** দিয়ে: "সেই পৃথিবী, যা ফেটে যায়" — যেমন যে জায়গার স্বভাবই গাছ জন্মানো, তাকে বলা হয় "গাছে ভরা"। এটি কোনো আকস্মিক ফাটলের কথা বলছে না, বরং ফাটলকেই গ্রহটির নিজের একটি বৈশিষ্ট্য বানিয়ে দিচ্ছে। আর ভূতাত্ত্বিক সত্যটি ঠিক এটাই: পৃথিবী এমন এক গ্রহ **যার ভূত্বক স্বভাবগতভাবেই ফাটা**, আর ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ও মহাদেশের চলাচলের মূলও সেটিই।

সূত্র Marie Tharp – the maps of the ocean floor · NOAA – the Mid-Ocean Ridge

72

সাগরতলের আগ্নেয়গিরি

প্রজ্বলিত সমুদ্র — পানির নিচে আগুন

শপথ তূর পর্বতের, আর লিখিত এক কিতাবের ... আর প্রজ্বলিত সমুদ্রের।

সূরা আত-তূর — আয়াত 1-6

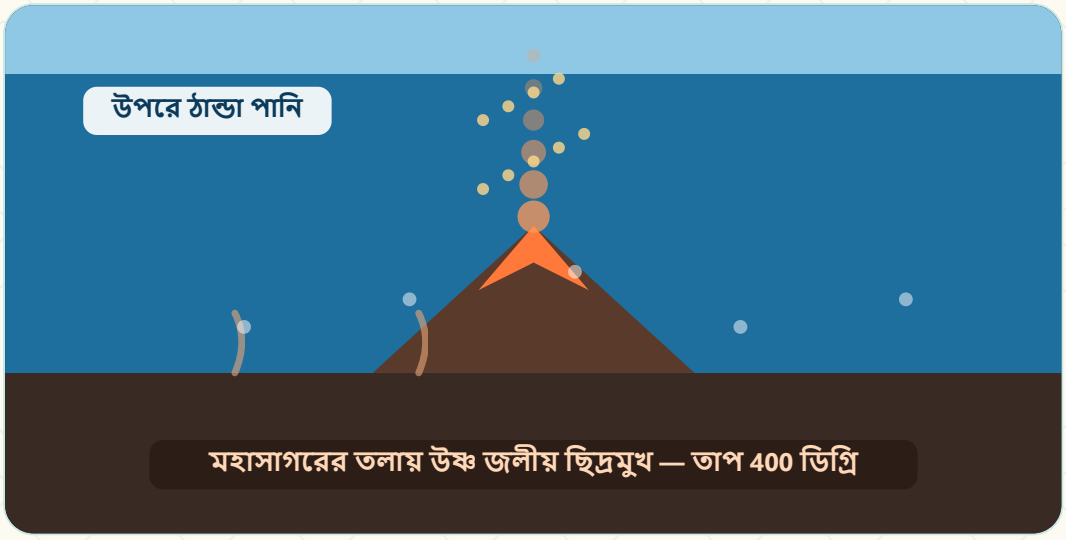

পৃথিবীর আগ্নেয় তৎপরতার 80 শতাংশের বেশি ঘটে সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে

সহজ কথায়

সমুদ্রের নিচে আগুন জ্বলছে! মহাসাগরের তলদেশে আছে আগ্নেয়গিরি ও ছিদ্রমুখ, যেগুলো চারশো ডিগ্রি তাপের পানি ছুড়ে দেয়। তাই সমুদ্র **প্রজ্বলিত** — নিচ থেকে আগুন ধরানো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পানি আর আগুন পরস্পর বিপরীত, এরা এক হতে পারে না — প্রত্যেক মানুষের কাছে এটি স্বতঃসিদ্ধ। সমুদ্র তো শীতলতা আর নিভিয়ে দেওয়ারই প্রতীক। সমুদ্রকে "প্রজ্বলিত" বলাটা শ্রোতাদের কাছে এমন এক দুর্বোধ্য কথা মনে হতো, বাস্তবে যার কোনো প্রতিরূপই নেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মহাসাগরের নিচে চলে গেছে বিশাল এক আগ্নেয় শৃঙ্খল, আর পৃথিবীর 80 শতাংশের বেশি আগ্নেয় উদ্গিরণ ঘটে পানির নিচে। 1977 সালে আবিষ্কৃত হয় **উষ্ণ জলীয় ছিদ্রমুখ**, যেগুলো 400 ডিগ্রির বেশি তাপের পানি ছুড়ে দেয়, অথচ প্রচণ্ড চাপে তা ফোটে না। আর এই আগুনগুলোর চারপাশে আছে গোটা একটি প্রাণজগৎ, যা সূর্যের আলোর উপর মোটেই নির্ভর করে না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আরবি ক্রিয়াটির অর্থ **চুলা ধরিয়ে তাকে আগুনে ভরে দেওয়া** — আর একই ধাতু থেকে এসেছে "আর যখন সমুদ্রগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে"। বর্ণনাটি আগুন ধরানোর ব্যাপারে স্পষ্ট, ভরে ওঠা বা বয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নয়। আর প্রজ্বলিত সমুদ্রের শপথটি একটি শপথমালার শেষ কড়ি — তূর পর্বত, লিখিত কিতাব, বায়তুল মামুর ও উঁচু ছাদ — অর্থাৎ তা এসেছে বাস্তব, বিদ্যমান জিনিসের প্রসঙ্গে। তাই এটি শপথ করছে উপস্থিত এক বাস্তবতার, যা মানুষ উদ্ঘাটন করেছে 1,350 বছর পরে।

সূত্র Corliss et al. (1979) – thermal springs on the Galápagos Rift

73

পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট

নিশ্চয়ই বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট — যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অচিরেই তারা জেনে যাবে।

সূরা আল-হিজর — আয়াত 95-96

নির্দিষ্ট শত্রুদের থেকে রক্ষার ওয়াদা — আর রক্ষা হলো

আল-আস	আল-আসওয়াদ	আল-আসওয়াদ	ওয়ালিদ	আল-হারিস
ধ্বংস হলো	ধ্বংস হলো	ধ্বংস হলো	ধ্বংস হলো	ধ্বংস হলো

সিরাতের কিতাবে নাম-ধরা পাঁচ নেতা... সবাই হিজরতের আগেই ধ্বংস

মক্কায় বিদ্রূপের নেতারা অল্প সময়ের মধ্যেই একের পর এক মারা গেল

সহজ কথায়

মক্কায় কিছু প্রসিদ্ধ লোক নবী ﷺ-কে নিয়ে বিদ্রূপের নেতৃত্ব দিত ও তাঁকে কষ্ট দিত। তখন একটি আয়াত নাযিল হলো: **তাদের বিরুদ্ধে আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট**। বেশি সময় যায়নি, তারা সবাই ধ্বংস হলো, প্রত্যেকে আলাদা কারণে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এরা ছিল কুরাইশের সরদার, মর্যাদা ও সম্পদের অধিকারী, নিজেদের শক্তি ও প্রভাবের চূড়ায়। আর নবী ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায়: অবরুদ্ধ ও নির্যাতিত, না ছিল সেনাবাহিনী, না ছিল কোনো আশ্রয়। তাদের কষ্ট ঠেকানোর কোনো মানবিক উপায়ই ছিল না, ধ্বংস করা তো দূরের কথা।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সিরাত ও ইতিহাসের কিতাবগুলো — যার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ইবনে হিশামের বর্ণনায় ইবনে ইসহাকের সিরাত — উল্লেখ করে যে বিদ্রূপের নেতা ছিল পাঁচজন, আর তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায় হিজরতের আগে বা তার আশপাশে খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে, এমন নানা কারণে যাদের মধ্যে কোনো মিল নেই: রোগ, মহামারি, দুর্ঘটনা, বিঁধে যাওয়া একটি কাঁটা, আর পচে যাওয়া একটি ক্ষত। এরপর তাদের কেউই আর দাওয়াতের বিরোধিতা করতে বেঁচে থাকেনি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই বাণীতে আছে **একটি নিশ্চয়তা**, কেবল দোয়া বা আশা নয়। আর নিশ্চয়তা এমন এক অঙ্গীকার, যা ভঙ্গ হতে পারে, আর তাতে সঙ্গে সঙ্গেই তার দাতা প্রতিপক্ষের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তাদের একজনও যদি বছরের পর বছর কষ্ট দিতে ও বিদ্রূপ করতে বেঁচে থাকত, তবে আয়াতটি তাদের পক্ষে নয়, তাদের বিরুদ্ধেই দলিল হয়ে দাঁড়াত। আর সবচেয়ে বড় কথা: এটি এমন এক প্রতিশ্রুতি, যা **শহরের সবচেয়ে দুর্বলদের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে** দেওয়া হয়েছিল — আর এই ধারা গোটা কুরআনজুড়েই ফিরে ফিরে আসে: "এই দল অচিরেই পরাজিত হবে আর পিঠ ফিরিয়ে পালাবে" নাযিল হয়েছিল মক্কায়, বদরের বহু বছর আগে, আর নবী ﷺ তা পাঠ করেছিলেন বদরের দিনে — এবং তা ঘটে গেল।

74

বিশ্বজগতের পরিণতি

আকাশ গুটানো হবে কাগজের মতো

সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেভাবে লিখিত দলিলের পাতা গুটানো হয়।
যেভাবে প্রথম সৃষ্টি শুরু করেছিলাম, সেভাবেই তা ফিরিয়ে আনব।

সূরা আল-আম্বিয়া — আয়াত 104

বিশ্বজগৎ একটি বিন্দু থেকে ছড়িয়েছে... আর গুটিয়ে আবার বিন্দুতেই ফিরবে

সহজ কথায়

আয়াতটি বলছে, বিশ্বজগতের পরিণতি হবে **গুটিয়ে যাওয়া** — অর্থাৎ সংকুচিত হওয়া ও পেঁচিয়ে যাওয়া, যেমন আপনি একটি কাগজ পেঁচিয়ে নেন। তারপর বলছে এক আশ্চর্য কথা: এই পরিণতি হবে হুবহু **সূচনার মতোই**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

"বিশ্বজগৎ কীভাবে শেষ হবে?" — এমন কোনো প্রশ্নই তখন দিগন্তে ছিল না, কারণ মানুষের ধারণায় বিশ্বজগৎ ছিল অনাদি ও অনন্ত, যার শুরুও নেই, শেষও নেই। আর পরিণতির আকৃতির সঙ্গে সূচনার আকৃতি জোড়ার মতো কোনো কাঠামোই তখন ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে বিশ্বজগতের পরিণতির সবচেয়ে পরিচিত দৃশ্যকল্পগুলোর একটি **"মহাসংকোচন"** (Big Crunch): মহাকর্ষ প্রসারণকে হারিয়ে দেয়, আর বিশ্বজগৎ নিজের উপরেই সংকুচিত হতে হতে ফিরে যায় তার প্রথম অবস্থায় — অতি-ঘন একটি বিন্দুতে। অর্থাৎ **পরিণতি হলো সূচনার উল্টো প্রতিচ্ছবি**।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

অলৌকিকতা এখানে আয়াতের দ্বিতীয় অর্ধে: "যেভাবে প্রথম সৃষ্টি শুরু করেছিলাম, সেভাবেই তা ফিরিয়ে আনব।" এই বাক্যটি একটি নিয়ম কায়েম করছে: **পরিণতির আকৃতি = সূচনার আকৃতি**। আর এর মধ্য দিয়েই তা আমাদের পরোক্ষে জানিয়ে দিচ্ছে, বিশ্বজগৎ তার শুরুতে ছিল **গুটানো** — অর্থাৎ একটি বিন্দুতে সংকুচিত — আর মহাবিস্ফোরণ মডেল ঠিক এ কথাই বলে। একটিমাত্র আয়াত সূচনা ও পরিণতি দুটোই দিয়ে দিল, এমন এক যুগে যখন কারও মনে বিশ্বজগতের শুরুও ছিল না, শেষও ছিল না।

সূত্র Ryden – *Introduction to Cosmology* · The Big Crunch

75

পালসার

যে তারা কড়া নাড়ে আর ভেদ করে

শপথ আকাশের এবং তারিকের — রাতে যে কড়া নেড়ে আসে — আর আপনি কী জানেন, তারিক কী? তা সেই ভেদকারী তারা।

সূরা আত-তারিক — আয়াত 1-3

স্পন্দনশীল তারা: হাতুড়ির অব্যর্থ ঘায়ের মতো নিয়মিত স্পন্দন পাঠায়

সহজ কথায়

কিছু তারা এমন সংকেত পাঠায়, যা **দরজায় নিয়মিত কড়া নাড়ার মতো**: টক... টক... টক... মানুষের বানানো সূক্ষ্মতম ঘড়ির চেয়েও নিখুঁত নিয়মে। আর কুরআন এমন তারার নাম দিয়েছে "তারিক" — অর্থাৎ যে কড়া নাড়ে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের কাছে তারা ছিল নীরব, নিশ্চল আলোর বিন্দু — না শব্দ, না স্পন্দন, না ভেদ করার ক্ষমতা। আর "তারক" শব্দটি, যার অর্থ বারবার শব্দ তুলে আঘাত করা, আকাশের কোনো তারার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সে যুগের যে কোনো শ্রোতার কাছে ছিল অর্থহীন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1967 সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোসেলিন বেল মহাকাশ থেকে বিস্ময়কর নিয়মে পুনরাবৃত্ত বেতার সংকেত ধরেন — এতটাই নিয়মিত যে দলটি প্রথমে ভেবেছিল এগুলো বুদ্ধিমান কোনো সত্তার বার্তা, আর নাম দিয়েছিল LGM-1। পরে দেখা গেল, এগুলো **স্পন্দনশীল নিউট্রন তারা** (Pulsars): বিস্ফোরিত তারার অবশেষ, যা প্রায় প্রতি সেকেন্ডে একবার নিজ অক্ষে ঘোরে — দ্রুততমগুলো সেকেন্ডে কয়েকশ বার — আর বাতিঘরের মতো মহাশূন্য ঝেঁটিয়ে যাওয়া দুটি রশ্মি ছুড়ে দেয়। আর তাদের সংকেতকে শব্দে রূপান্তর করা হলে তা হয় হুবহু **নিয়মিত কড়া নাড়া**।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুটি শব্দ একসঙ্গে আর কোনো অবকাশ রাখে না: "তারিক" = যে বারবার কড়া নাড়ার শব্দ তোলে, আর "সাকিব" = যে ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায়। স্পন্দনশীল তারা আক্ষরিক অর্থেই দুটি বর্ণনাই মেলায়: তার সংকেত নিয়মিত কড়া নাড়া, আর তা হাজার হাজার আলোকবর্ষ ভেদ করে ছায়াপথের ধূলি পেরিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছে যায়। বরং শপথের পরপরই এল একটি বিস্ময়সূচক প্রশ্ন: "আর আপনি কী জানেন, তারিক কী?" — অর্থাৎ এটি এমন কিছু, **যা জানার কোনো উপায় আপনার নেই**। আর তা-ই ছিল, 1967 সাল পর্যন্ত।

সূত্র Hewish, Bell et al. (1968) – a rapidly pulsating radio source

76

বিশ্বজগতের গঠন

যে আকাশ বোনা পথে ভরা

শপথ বোনা পথে ভরা আকাশের।

সূরা আয-যারিয়াত — আয়াত 7

বিশ্বজগতের বিরাট মানচিত্র: ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছায়াপথ নয়, বরং সুতো ও গিঁটের বোনা জাল

সহজ কথায়

আপনি যদি খুব দূর থেকে গোটা বিশ্বজগতের দিকে তাকাতেন, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তারা দেখতেন না। দেখতেন **কাপড়ের বুনন বা সুতোর জালের** মতো কিছু: ছায়াপথের লম্বা লম্বা সুতো, আর তাদের মাঝে বিশাল কালো শূন্যতা। আর আরবি "হুবুক" শব্দের অর্থ: **পথে ভরা নিপুণ বুনন**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের কাছে আকাশ ছিল মসৃণ একটি গম্বুজ, যাতে আলোর বিন্দু বসানো — কোনো গঠন নেই, আকার নেই, বিন্যাস নেই। বিশ্বজগতের আদৌ একটি "সামগ্রিক আকৃতি" থাকতে পারে, এ প্রশ্নই তখন ওঠেনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে মানমন্দিরগুলো লক্ষ লক্ষ ছায়াপথের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি করেছে (SDSS প্রকল্প ও 2dF জরিপ), আর ফল এল বিস্ময়কর: ছায়াপথগুলো এলোমেলোভাবে ছড়ানো নয়, বরং সাজানো আছে **"মহাজাগতিক জালে" (Cosmic Web)** — ছায়াপথের বিশালাকার সুতো ও দেয়াল, যা ঘিরে রেখেছে প্রকাণ্ড ফাঁকা শূন্যতা। আর তাতে যে ছবি দাঁড়ায়, তা বিস্ময়কর রকম বোনা কাপড়ের মতো।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"হুবুক" হলো "হিবাক"-এর বহুবচন, আর আরবি অভিধানে এর অর্থ: নিপুণ বুননে বোনা কোনো জিনিসের ভেতরের পরস্পর-জড়ানো পথ — যেমন পানির ঢেউয়ের দাগ কিংবা বালির ভাঁজ। আর আজ ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক পরিভাষাটিও ঠিক এটিই: Filaments, অর্থাৎ **সুতো**। চৌদ্দ শতাব্দী পরে এত বিরল ও সুনির্দিষ্ট একটি অর্থে আরবি শব্দের সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষার এই মিল কাকতালীয়ভাবে ঘটার মতো জিনিস নয়।

সূত্র Bond, Kofman & Pogosyan (1996) – the cosmic web, Nature 380 · Sloan Digital Sky Survey

77

কৃষ্ণগহ্বর

যারা লুকায়, ছোটে আর ঝেঁটিয়ে নেয়

আমি শপথ করছি লুকিয়ে যাওয়া তারাগুলোর — যারা ছোটে ও ঝেঁটিয়ে নেয়।

সূরা আত-তাকভীর — আয়াত 15-16

কৃষ্ণগহ্বর মহাজাগতিক ঝাড়ুর মতো তার চারপাশের গ্যাস ও তারা গিলে ফেলে

সহজ কথায়

মহাশূন্যে এমন কিছু বস্তু আছে, যাদের মধ্যে তিনটি গুণ: তারা **অদৃশ্য হয়ে যায়**, দেখা যায় না; প্রচণ্ড গতিতে **ছোটে**; আর চারপাশের সবকিছু **ঝেঁটিয়ে নিয়ে** গিলে ফেলে। আল্লাহ এখানে ঠিক এই তিনটি গুণেরই শপথ করছেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

গোটা দুনিয়ায় **অদৃশ্য** কোনো মহাজাগতিক বস্তুর ধারণাই ছিল না। বস্তু হয় দেখা যায়, তাই তার অস্তিত্ব আছে; নয়তো দেখা যায় না, তাই তার অস্তিত্ব নেই। আকাশে এমন বিশাল কিছু থাকতে পারে, যা কোনো চোখ কখনো দেখে না, অথচ চারপাশের সবকিছু গিলে ফেলে — এ কারও কল্পনায়ই আসেনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কৃষ্ণগহ্বর: এমন বস্তু, যার ঘনত্ব এতটাই অকল্পনীয় যে আলো পর্যন্ত তার হাত থেকে ছাড়া পায় না; তাই স্বভাবতই সেগুলো **সম্পূর্ণ অদৃশ্য**। সেগুলো নিজ নিজ ছায়াপথে ঘোরে ও ছুটে চলে, আর গ্যাস, ধূলি ও তারা টেনে নিয়ে গিলে ফেলে। প্রথম কৃষ্ণগহ্বরের সরাসরি ছবি তোলা হয় 2019 সালে (M87 ছায়াপথে), আর এগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণের কাজ 2020 সালে নোবেল পুরস্কার পায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

তিনটি শব্দই বিস্ময়কর রকম সূক্ষ্ম: "খুন্নাস" এসেছে খানাসা থেকে, অর্থ **লুকিয়ে যাওয়া ও গুটিয়ে যাওয়া**; "জাওয়ার" অর্থ **ছুটে চলা, গতিশীল**; "কুন্নাস" এসেছে কানাসা থেকে, অর্থ **চারপাশের সব জড়ো করে গিলে ফেলা** (এ থেকেই এসেছে ঝাড়ুর আরবি শব্দ, আর সেই গর্তের শব্দও, যাতে হরিণ গিয়ে লুকায়)। দুই আয়াতে তিনটি গুণ, আর সবগুলোই খাটে একটিমাত্র জিনিসের উপর, যা বিংশ শতাব্দীর আগে জানাই ছিল না। আর মনে রাখুন, কুরআনে শপথ কেবল মহান কোনো কিছুরই করা হয়।

সূত্র Event Horizon Telescope (2019) – the first image of M87* · Nobel Prize in Physics 2020

পৃথিবীর গঠন

78 পৃথিবী তার ভার বের করে দেয়

যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, এবং পৃথিবী তার ভার বের করে দেবে।

সূরা আয-যিলযাল — আয়াত 1-2

ভূমিকম্প ও পাতের নড়াচড়াই ধাতু আর তেলকে আমাদের নাগালে তুলে এনেছে

সহজ কথায়

আজ আমরা যে সোনা, ধাতু ও তেল উত্তোলন করি, তার সবই ছিল পৃথিবীর গভীরে পোঁতা। যা সেগুলোকে পৃষ্ঠের কাছে তুলে এনেছে তা হলো **ভূমিকম্প ও পৃথিবীর নড়াচড়া** — লক্ষ লক্ষ বছর ধরে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ভূমিকম্প ছিল নিছক বিপর্যয়: ধস, ভূমি দেবে যাওয়া আর মৃত্যু। কেউ একে কোনো উপকারের সঙ্গে, কিংবা কোনো কল্যাণ বের করে আনার সঙ্গে মেলায়নি। আর "তার ভার" কথাটি যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের ভাণ্ডার বোঝায়, শ্রোতাদের কাছে তার কোনো স্পষ্ট অর্থ ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পৃথিবীর অধিকাংশ অর্থনৈতিক খনি অবস্থিত **টেকটনিক পাতের সীমানায়** এবং ভূকম্পন ও আগ্নেয় তৎপরতার অঞ্চলে। পাতের নড়াচড়াই ধাতুসমৃদ্ধ শিলাকে গভীর থেকে ভূত্বকে ঠেলে তোলে, আর উত্তপ্ত তরলই সোনা ও তামাকে শিরায় শিরায় ঘনীভূত করে। এই তৎপরতা না থাকলে পৃথিবীর সব ভাণ্ডার চিরকাল আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যেত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি এমন দুটি ঘটনাকে জুড়ে দেয় যা সাধারণ বুদ্ধি জোড়ে না: প্রকম্পন থেকে ভার বেরিয়ে আসা। খনিবিদ্যা ঠিক এ কথাই স্থির করে। আর "ভার" শব্দটি বিস্ময়করভাবে নিখুঁত: মূল্যবান ধাতু — সোনা ও প্লাটিনাম — **মৌলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঘন**, এবং লোহার সঙ্গে এদের বাঁধন গভীর; তাই যেদিন পৃথিবীর স্তরগুলো আলাদা হলো, এরা লোহার পিছু পিছু কেন্দ্রে নেমে গেল আর ভূত্বককে প্রায় শূন্য করে রেখে গেল। কোনো শক্তি ওপরে না তুললে এরা আমাদের কাছে পৌঁছায় না। যে ভৌত বৈশিষ্ট্য এদের আলাদা করে, সেই নামেই এদের ডাকা হলো।

79

ভাইরাসবিজ্ঞান

একটি মশা, আর তার ঊর্ধ্বে যা আছে

নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা কিংবা তার ঊর্ধ্বে যা আছে, তার দৃষ্টান্ত দিতে

সূরা বাকারা — আয়াত 26

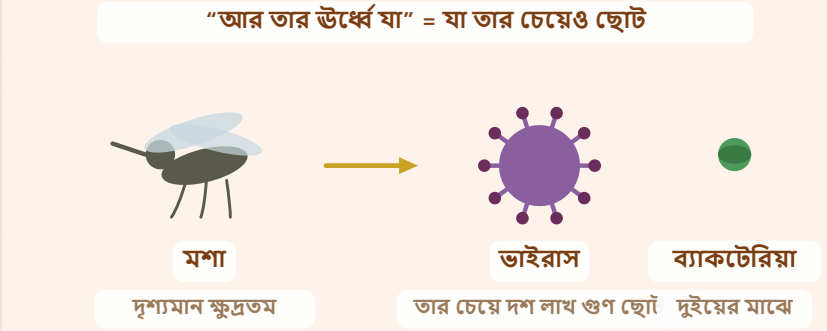

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মাপে মশা এক দৈত্য

সহজ কথায়

কুরআন দৃষ্টান্ত দিয়েছে মানুষ চোখে দেখতে পায় এমন সবচেয়ে ছোট জিনিস দিয়ে — মশা — তারপর বলেছে: **"আর তার ঊর্ধ্বে যা আছে"**। আরবিতে "ফাওক" (ঊর্ধ্বে) শব্দটি **ক্ষুদ্রতায় আরও এগিয়ে যাওয়া** অর্থেও আসে, অর্থাৎ: আর তার চেয়েও যা ছোট।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মশাই ছিল সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতার শেষ সীমা: চোখ যাকে দেখতে পায় এবং যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলাদা করে চিনতে পারে, এমন ক্ষুদ্রতম প্রাণী। এর চেয়ে ছোট প্রাণের কথা কল্পনাতেই আসত না, কেননা যা দেখা যায় না তার অস্তিত্ব জানা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত অবস্থা এমনই ছিল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মশা তুলনামূলকভাবে বিশাল এক প্রাণী: লম্বায় প্রায় 6 মিলিমিটার। কেবল তার শরীরেই বাস করে **লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া**, আর তার গায়ে থাকে ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে শতগুণ ছোট ভাইরাস। দেখা গেছে, একটিমাত্র মশার গড়ন অত্যন্ত জটিল: শত শত লেন্স দিয়ে গড়া পুঞ্জাক্ষি, এমন এক শুঁড় যাতে ছেদন, শোষণ আর রক্ত জমাট বাঁধতে না দেওয়ার উপাদান ঢোকানোর জন্য ছয়টি আলাদা যন্ত্র আছে, আর এমন ডানা যা সেকেন্ডে 600 বার ঝাপটায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

প্রসঙ্গই ফয়সালা করে দেয়। আয়াতটি এসেছে এ কথা বোঝাতে যে, আল্লাহ **ক্ষুদ্র** বস্তু দিয়ে দৃষ্টান্ত দিতে লজ্জা করেন না — মাছি ও মাকড়সার উল্লেখ নিয়ে যারা ঠাট্টা করেছিল তাদের জবাবে। কাজেই প্রসঙ্গের সঙ্গে মেলে এমন অর্থ হলো: আর তার চেয়ে **ক্ষুদ্রতায় আরও গভীরে** যা আছে, তা দিয়েও নয়। আর এই ব্যবহার বিশুদ্ধ আরবি, যেমন বলা হয় "মূর্খতায় এ লোক তার ঊর্ধ্বে"। কাজেই আয়াতটি পরোক্ষভাবে প্রমাণ করছে, চোখে দেখা ক্ষুদ্রতম জিনিসের চেয়েও ছোট সৃষ্টি আছে — এমন এক সময়ে, যখন ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের শেষ সীমাই ছিল মশা।

সূত্র Leeuwenhoek (1674-1676) – the microscopic world

ভূতত্ত্ব

80 লুতের জাতি — যার উপরটা করা হলো নিচ

যখন আমার আদেশ এল, আমি তার উপরটাকে নিচ করে দিলাম, আর তার উপর বর্ষণ করলাম স্তরে স্তরে সাজানো পোড়ামাটির পাথর।

সূরা হুদ — আয়াত 82

যে অঞ্চল দেবে গেল ও উল্টে গেল, তারপর তীব্র লবণাক্ত পানিতে ডুবল

সহজ কথায়

আয়াতটি বলছে, লুতের জাতির শহর **উল্টে গিয়েছিল ওলটপালট হয়ে**, তারপর তার উপর নেমেছিল একটির উপর একটি সাজানো পাথর। ভূতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, ঠিক ওই অঞ্চলেই এটি কীভাবে ঘটে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

দেবে যাওয়া আর উল্টে যাওয়াকে বোঝা হতো নিছক অদৃশ্য শাস্তি হিসেবে, কোনো প্রাকৃতিক কার্যপ্রণালী ছাড়াই। জানা ছিল না যে ওই অঞ্চল বিশাল এক ভূ-চ্যুতির উপর পড়েছে, কিংবা তার নিচে জমে আছে গ্যাস, খনিজ আলকাতরা আর গন্ধক।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মৃত সাগরের অঞ্চল পড়েছে **মৃত সাগরের রূপান্তর-চ্যুতির** উপর — পৃথিবীর সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকম্প-চ্যুতিগুলোর একটি — আর এটিই এই গ্রহের সবচেয়ে নিচু শুকনো ভূমি। অঞ্চলটি প্রাকৃতিক আলকাতরা, গন্ধক ও দাহ্য গ্যাসে সমৃদ্ধ। গবেষকরা মনে করেন, প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পে **মাটি তরল হয়ে দেবে যায়** এবং তার স্তরগুলো উল্টে যায়, সেই সঙ্গে জ্বলন্ত পদার্থ ছিটকে উঠে অঞ্চলটির উপর নেমে আসে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

তিনটি শব্দই গোটা বর্ণনাটি বহন করছে। "**আমি তার উপরটাকে নিচ করে দিলাম**": স্তরগুলোর পূর্ণ উল্লম্ব উল্টে যাওয়া, নিছক ভেঙে ফেলা নয় — আর দেবে যাওয়া ও উল্টে যাওয়ার ভূতাত্ত্বিক বর্ণনা ঠিক এটিই। "**সিজ্জিল**": এমন একটি শব্দ যা পাথর আর শক্ত হয়ে যাওয়া কাদা, দুটিকেই ধরে রাখে। আর "**মানদুদ**": অর্থাৎ একটির উপর আরেকটি স্তরে স্তরে ঠাসা — ওই অঞ্চলের স্তরীভূত পাললিক শিলার এ এক নিখুঁত বর্ণনা। অর্থাৎ পাঠটি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাকৃতিক কার্যপ্রণালীর বর্ণনা দিচ্ছে, কোনো ভাসা-ভাসা কল্পচিত্র নয়।

সূত্র Bab edh-Dhra – the southern Dead Sea plain · The Dead Sea – the lowest land on earth

প্রত্নতত্ত্ব

81 ইরাম, স্তম্ভের নগরী — চাপা পড়া শহর

আপনি কি দেখেননি, আপনার রব আদ জাতির সঙ্গে কী করেছিলেন? স্তম্ভের অধিকারী ইরাম, যার মতো আর কিছু দেশে-দেশে সৃষ্টি করা হয়নি?

সূরা আল-ফাজর — আয়াত 6-8

উঁচু বুরুজওয়ালা এক দুর্গ, হাজার হাজার বছর পর যা রুবউল খালির বালির নিচ থেকে বেরিয়ে এল

সহজ কথায়

কুরআন এমন এক মহানগরীর কথা বলেছে যার **স্তম্ভ** ছিল, যার মতো কিছু আর নির্মিত হয়নি, আর বলেছে সেটি ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষ একে কিংবদন্তি বলেই গুনে এসেছে... যতক্ষণ না উপগ্রহের রাডার রুবউল খালির বালির নিচে এমন এক চাপা পড়া জনপদ দেখাল, যা মরুভূমি লুকিয়ে রেখেছে বলে কেউ ভাবেইনি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

রুবউল খালিতে অন্তহীন বালু ছাড়া কিছুই ছিল না। পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা "আদ" ও "ইরাম"-কে আরবদের কিংবদন্তির মধ্যেই গুনতেন, কারণ তাদের কোনো চিহ্ন ছিল না, অন্য কোনো সূত্রেও উল্লেখ ছিল না। আর মরুভূমি এমন কোনো গোপন কথা রাখে না যা তার উপরিতল থেকে দেখা যায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1992 সালে নিকোলাস ক্ল্যাপের নেতৃত্বে একটি দল নাসার মহাকাশযানের রাডার-ছবি ব্যবহার করে, আর বালির নিচে ফুটে ওঠে **প্রাচীন কাফেলা-পথ, যেগুলো একটিমাত্র বিন্দুতে এসে মিলেছে** — ওমানের জোফার প্রদেশের **শিসর**-এ। খননে বেরিয়ে আসে অষ্টভুজ এক দুর্গ, যার **উঁচু বুরুজ** ছিল, আর নিচের একটি চুনাপাথরের গর্তে ধসে পড়া এক শহরের চিহ্ন। বিশ্বের সংবাদপত্র খবরটি ছাপে "উবার: বালির আটলান্টিস" নামে। কিন্তু সেটি সংবাদপত্রের শিরোনাম, প্রত্নতাত্ত্বিকদের রায় নয়: শিসরকে ইরাম বলে চিহ্নিত করা প্রমাণিত হয়নি, আর কুরআন যে শহরের কথা বলেছে তার অবস্থান আজও অজানা।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কুরআনের বর্ণনা শহরটিকে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে আলাদা করেছে: "**স্তম্ভের অধিকারী**" — অর্থাৎ থাম বা উঁচু বুরুজ। এটি যেকোনো শহরের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়; আরব উপদ্বীপের জনপদ ছিল মাটির ঘর আর তাঁবু। তারপর যোগ করেছে: "**যার মতো আর কিছু দেশে-দেশে সৃষ্টি করা হয়নি**" — অর্থাৎ তার স্থাপত্যের অনন্যতা। আর বালির নিচ থেকে সত্যিই উঁচু বুরুজ বেরিয়েছে, যদিও শিসরই যে ইরাম, তা এখনো প্রমাণিত নয়। সবচেয়ে বড় কথা, কুরআন একে বলেছে **বাস্তব ইতিহাস** হিসেবে, কিংবদন্তি হিসেবে নয় — এমন এক সময়ে যখন এর পক্ষে কারও কোনো প্রমাণ ছিল না, আর চৌদ্দ শতাব্দী ধরে এটিই ছিল তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ, যতক্ষণ না রাডার এল।

সূত্র Nicholas Clapp – *The Road to Ubar*, 1998 · NASA radar imagery and the search for Ubar

দ্বিতীয় পর্ব

মুহাম্মদ ﷺ-এর যেসব ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে

বহু দূরের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি ﷺ যেসব খবর দিয়েছিলেন, তাঁর সাহাবিগণ সেগুলো নিজেদের কিতাবে লিখে রেখেছিলেন, তারপর সেগুলো দুনিয়ার চোখের সামনে ঠিক তেমনই ঘটেছে যেমন তিনি বলেছিলেন — অক্ষরে অক্ষরে।

19 প্রমাণ

82

বিজয়

কনস্টান্টিনোপল অবশ্যই বিজিত হবে

কনস্টান্টিনোপল অবশ্যই বিজিত হবে। কতই না উত্তম হবে তার সেই সেনাপতি, আর কতই না উত্তম হবে সেই বাহিনী

বর্ণনা করেছেন আহমাদ, আর বুখারি তাঁর আত-তারিখ গ্রন্থে — একদল আলিম সহিহ বলেছেন

কনস্টান্টিনোপল: প্রাচীন দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গনগরী

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছিলেন, **কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে**, আর যিনি তা জয় করবেন সেই সেনাপতি ও তাঁর বাহিনীর প্রশংসা করেছিলেন। আট শতাব্দীরও বেশি পরে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তা জয় করেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কনস্টান্টিনোপল ছিল **পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যের রাজধানী**, আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরী: বিশাল তিন স্তরের প্রাচীর, লোহার শিকল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া এক উপসাগর, আর তিন দিকে ঘিরে থাকা সমুদ্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে বিশটিরও বেশি অবরোধ সয়ে টিকে ছিল। আর যিনি এ কথা বলেছিলেন, তিনি তখন মদিনায়, আর তাঁর রাষ্ট্রের কোনো নৌবহরই ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1453 সালের 29 মে একুশ বছর বয়সী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ নগরীটি জয় করেন, আর সে কারণেই তাঁর উপাধি হয় "আল-ফাতিহ" অর্থাৎ বিজেতা। তিনি এমন এক দানব কামান ব্যবহার করেন, যার নজির কেউ দেখেনি, আর শিকল এড়াতে **জাহাজগুলোকে ডাঙার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যান** চর্বি মাখানো কাঠের পাটাতনে। ঘটনাটি বিশ্ব-ইতিহাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলোর একটি, আর একেই মধ্যযুগের সমাপ্তি ধরা হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

হাদিস কেবল বিজয়ের খবর দিয়েই থামেনি, বরং **বিজেতা ও তাঁর বাহিনীর প্রশংসা করেছে আগেভাগেই** — এতে ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়, কেননা তা বক্তব্যের সত্যতাকে বেঁধে দেয় এমন এক লোকের গুণের সঙ্গে, যার জন্মই তখনো হয়নি। আট শতাব্দী ধরে মুসলিম সেনাপতিরা এই সম্মানের জন্য প্রতিযোগিতা করেছেন: মুআবিয়া ও সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক নগরী অবরোধ করেছেন, হারুনুর রশিদের বাহিনী 165 হিজরিতে তার উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছেও পার হয়নি, কেউই তা জয় করতে পারেননি — **আর প্রতিটি ব্যর্থ চেষ্টাই ছিল হাদিসটিকে মিথ্যা প্রমাণ করার সুযোগ, সত্য প্রমাণ করার নয়**। তারপর বিজয় এল একুশ বছরের এক তরুণের হাতে, এমন এক প্রযুক্তিতে যা কেউ কল্পনাও করেনি।

সূত্র Runciman – *The Fall of Constantinople 1453* · The fall of Constantinople, 29 May 1453

সাম্রাজ্যের পতন

83 কিসরা ধ্বংস হলে তার পরে আর কোনো কিসরা নেই

কিসরা ধ্বংস হলে তার পরে আর কোনো কিসরা নেই, আর কায়সার ধ্বংস হলে তার পরে আর কোনো কায়সার নেই। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাদের দুজনের ধনভাণ্ডার অবশ্যই আল্লাহর পথে ব্যয় করা হবে

বর্ণনা করেছেন বুখারি ও মুসলিম — মুত্তাফাকুন আলাইহি

বলা হয় যখন তারা শক্তির চূড়ায়

পারস্য ও রোম শাসন করছে
পরিচিত দুনিয়ার অর্ধেক
আর মুসলিমরা মদিনায়
টাকাহীন এক নবজাত রাষ্ট্র

আর ঘটল তাঁর কথামতোই

ইয়াজদিগার্দ — শেষ কিসরা
পারস্য মুছে গেল আর ফিরল না
আর রোম হারাল শাম ও মিসর
আর দুজনের সম্পদ বায়তুল মালে

বলা আর ঘটার ব্যবধান: ত্রিশ বছরেরও কম

শতাব্দী ধরে শাসন করা দুই সাম্রাজ্য… একটি নিঃশেষ হলো, অন্যটি গুটিয়ে গেল

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছিলেন, **পারস্যের সম্রাট মারা গেলে তার পরে তার মতো আর কোনো সম্রাট আসবে না**, রোমের সম্রাটের বেলায়ও তাই, আর তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে ব্যয় করা হবে। সবই ঘটেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পারস্য ও রোম ছিল নির্বিবাদে **দুনিয়ার দুই মহাশক্তি**, পূর্ব ও পশ্চিম নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া, অগণিত সৈন্য ও ধনভাণ্ডারের মালিক। আর মুসলিমরা তখন মদিনার এক ছোট্ট জামাত — রাষ্ট্র নেই, সেনাবাহিনী নেই, ধনভাণ্ডার নেই, এই দুই বিশাল সাম্রাজ্যের মাঝখানে আটকে থাকা। ঠিক সেই অবস্থায় এই কথা বলা হয়েছিল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

651 খ্রিষ্টাব্দে **তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ** নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাসানীয় রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পতন ঘটে, আর তারপর পারস্যে ঐ উপাধিধারী কোনো সম্রাট আর কোনোদিন দাঁড়ায়নি। রোমের রাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়নি, কিন্তু **সিরিয়া, মিসর ও উত্তর আফ্রিকা হারিয়ে** গুটিয়ে যায়, আর ঐসব ভূখণ্ডে কায়সারের কোনো কর্তৃত্ব আর থাকেনি। উমরের খিলাফতকালে কিসরার ধনভাণ্ডার মদিনায় আনা হয় ও বণ্টন করা হয়; তখন তিনি বলেছিলেন: "যারা এসব পৌঁছে দিয়েছে, তারা নিশ্চয়ই আমানতদার।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুই বাক্যের সূক্ষ্ম পার্থক্যটি লক্ষ করুন। কিসরার ব্যাপারে বলা হয়েছিল "তার পরে আর কোনো কিসরা নেই" — আর **পারস্য চিরতরে শেষ হয়ে গেছে**। কায়সারের ব্যাপারেও সেই একই কথা — অথচ **রোম শেষ হয়নি, বরং ইসলামের ভূখণ্ড থেকে গুটিয়ে গেছে**। আর এটিই হাদিসের প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ: কথা তো তাকে নিয়েই, যে ঐ ভূমি শাসন করে ও তা নিয়ে বিবাদ করে। এর চেয়েও সূক্ষ্ম ব্যাপার হলো, হাদিস কেন্দ্রে রেখেছে **ধনভাণ্ডারকে, ভূমিকে নয়**: "তাদের দুজনের ধনভাণ্ডার অবশ্যই আল্লাহর পথে ব্যয় করা হবে" — এই বাক্যটির উপরেই তিনি শপথ করেছিলেন। দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দুই সম্রাটের সম্পদের প্রতিশ্রুতি, এমন এক মানুষের মুখে, যিনি নিজের রাতের খাবারই পেতেন না।

সূত্র الطبري – «تاريخُ الرُّسُلِ والمُلوك» · Yazdegerd III – the last Sasanian king, d. 651

84

অভ্যন্তরীণ ফিতনা

আম্মারকে হত্যা করবে সীমালঙ্ঘনকারী দল

হায় আম্মার! তাকে হত্যা করবে সীমালঙ্ঘনকারী দল। সে তাদের ডাকবে জান্নাতের দিকে, আর তারা তাকে ডাকবে জাহান্নামের দিকে

বর্ণনা করেছেন বুখারি ও মুসলিম — মুত্তাফাকুন আলাইহি

বলা হয় মদিনার মসজিদ নির্মাণের সময় — 1 হিজরি

1 হিজরি — **36 বছর** — **37 হিজরি**

আম্মার ইট বয়ে নিচ্ছেন — **সিফফিনে নিহত**

যেদিন ঘটল, হাদিসই দুই দলের চূড়ান্ত দলিল হলো

এমনকি সেই যুদ্ধেই তারা তা নিয়ে তর্ক করেছে

হিজরতের প্রথম বছরে বলা এক ভবিষ্যদ্বাণী, যা ঘটেছে ছত্রিশ বছর পরে

সহজ কথায়

মসজিদ নির্মাণের সময় নবী ﷺ আম্মার ইবনে ইয়াসির সম্পর্কে বলেছিলেন, **তাঁকে হত্যা করবে এক যালিম দল**। ছত্রিশ বছর পরে সিফফিনের যুদ্ধে আম্মার নিহত হন — আর মানুষ জেনে গেল, সীমালঙ্ঘনকারী কারা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এই কথা যখন বলা হয়, মুসলিমরা তখন **মদিনায় নিজেদের প্রথম দিনগুলোতে পরস্পরকে ভালোবাসা একটিমাত্র জামাত** — তাঁদের মধ্যে না ছিল ফিতনা, না বিভেদ, আর প্রত্যেকেই নিজের হাতে মসজিদ গড়ছেন। মুসলিমরা পরস্পরে লড়বে, আর একজন মহান সাহাবি মুসলিমদের হাতেই নিহত হবেন — এ ভাবনা তখন কারো মনের ধারেকাছেও ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আম্মার ইবনে ইয়াসির 37 হিজরিতে সিফফিনের যুদ্ধে নিহত হন, তখন তাঁর বয়স নব্বইয়ের কোঠায়, আর তিনি ছিলেন আলি ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে। **তিনি নিহত হয়েছেন জানাজানি হতেই শামের বাহিনীতে প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হয়ে যায়**, কেননা হাদিসটি তাঁদের মধ্যে পরিচিত ও প্রচলিত ছিল। হাদিসটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম দুটিতেই আছে, আর একদল সাহাবি থেকে এত অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত যে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই ভবিষ্যদ্বাণীর সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো, **বিবদমান দুই পক্ষই এটি জানত ও এর দলিল দিত** — কাজেই এটি ঘটনার পরে লিখে রাখা কোনো খবর নয়, বরং ঘটনার কয়েক দশক আগে থেকেই প্রচলিত; এমনকি এর বাস্তবায়ন দুই বাহিনীর একটিতে সত্যিকারের সংকট তৈরি করেছিল। হাদিসটি যদি সিফফিনের পরে বানানো হতো, তবে যে পক্ষকে তা দোষী সাব্যস্ত করে, সে পক্ষ তা কিছুতেই মেনে নিত না। আর নবী ﷺ নাম নিয়েছেন **নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির**, বলেছেন **তাঁর মৃত্যুর ধরন** (হত্যা, রোগ নয়), আর দিয়েছেন **হত্যাকারীদের পরিচয়** (সীমালঙ্ঘনকারী দল, অর্থাৎ যালিম মুসলিম, কাফির নয়)। তিনটি শর্তই একসঙ্গে ঘটেছে।

রাজনীতি

85 আমার এই ছেলে নেতা... তার মাধ্যমে আল্লাহ দুই দলের মীমাংসা করবেন

নিশ্চয়ই আমার এই ছেলে একজন নেতা, আর আশা করা যায় আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বিশাল দলের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন

বর্ণনা করেছেন বুখারি — সহিহ

বলা হয় যখন হাসান ছোট শিশু

না দুই দল, না লড়াই
আর গোটা উম্মত এক
আর শিশুটি বালেগ হয়নি
আর কোনো পদও নেই

→

41 হিজরি — ঐক্যের বছর

উম্মত দুই বাহিনীতে ভাগ হলো
হাসান সন্ধির জন্য সরে দাঁড়ান
তাই মুসলিমরা এক হলো
আর নাম হলো: ঐক্যের বছর

সক্ষম থেকেও খিলাফত ছেড়ে দিলেন — রক্তপাত বাঁচল

প্রাথমিক ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মীমাংসা, আর তার কারিগরের নাম বলা হয়েছিল তিনি বড় হওয়ার আগেই

সহজ কথায়

নবী ﷺ তাঁর নাতি হাসানকে কোলে নিলেন, তখন তিনি ছোট্ট শিশু, আর বললেন: **আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বিশাল দলের মীমাংসা করে দেবেন**। প্রায় চল্লিশ বছর পরে তিনি ঠিক তা-ই করলেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

উম্মতের মধ্যে তখন দুটি দল ছিলই না — ছিল নিজেদের নবীর পেছনে একটিমাত্র জামাত। আর যে শিশুটিকে নিয়ে কথা, সে তখনো বড়ই হয়নি, কী হবে তা-ও কেউ জানে না। হাদিসটি একসঙ্গে তিনটি অজানা বিষয়ের খবর দিচ্ছে: উম্মত **বিভক্ত হবে**, সেই বিভক্তি **মীমাংসায় গিয়ে শেষ হবে**, আর এই নির্দিষ্ট শিশুটিই তা সম্পন্ন করবে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

40 হিজরিতে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হওয়ার পর হাসানের হাতে খিলাফতের বাইআত নেওয়া হয়, আর তিনি ছিলেন এক বিশাল বাহিনীর শীর্ষে। এরপর **মুসলিমদের রক্তপাত ঠেকাতে 41 হিজরিতে তিনি তা মুআবিয়ার হাতে ছেড়ে দেন**, ফলে বছরের পর বছর যুদ্ধের পরে উম্মত একজন মানুষের নেতৃত্বে এক হয়ে যায়। গোটা ইসলামি ইতিহাসে সেই বছরটির নাম রাখা হয়েছে **"আমুল জামাআহ", অর্থাৎ ঐক্যের বছর**। হাদিসটি সহিহ বুখারিতে আছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই একটিমাত্র বাক্য কী কী দাবি করছে, ভেবে দেখুন: যে উম্মত এখনো ভাগই হয়নি, তাতে **আসন্ন এক ফিতনার** ঘোষণা; **যে মানুষটি তা শেষ করবেন** তাঁকে নির্দিষ্ট করা, অথচ তিনি তখন কথা না-ফোটা শিশু; আর **পদ্ধতিটিও** নির্দিষ্ট করা — যুদ্ধে জয় নয়, মীমাংসা। শেষেরটিই সবচেয়ে বিস্ময়কর: বাহিনী ও বৈধতা যাঁর হাতে, তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক কাজ তো লড়াই করা। নবীর ﷺ নাতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সক্ষম থাকা অবস্থাতেই তিনি ছেড়ে দেবেন — **যে কাজের জন্য তাঁর নিজের কিছু অনুসারীই তাঁকে দোষারোপ করেছিলেন** — আর তারপর সেটিকেই বলা হচ্ছে "নেতৃত্ব" ও "মীমাংসা"; এ এমন এক রায়, যা প্রতিটি রাজনৈতিক প্রত্যাশার বিপরীত। আর তা অক্ষরে অক্ষরে ঘটেছে।

রাজনীতি

86 খিলাফত ত্রিশ বছর... তারপর রাজতন্ত্র

আমার উম্মতে খিলাফত ত্রিশ বছর, তারপর এর পরে রাজতন্ত্র

বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও তিরমিজি — আলবানি সহিহ বলেছেন

পুরোপুরি ত্রিশ বছরে পাঁচজন খলিফা... তারপর শাসনব্যবস্থাই বদলে গেল

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছিলেন, নবুওয়াতের আদর্শে খিলাফত টিকবে কেবল **ত্রিশ বছর**, তারপর শাসন রূপ নেবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রাজতন্ত্রে। হিসাব মিলেছে হুবহু।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

তখন গোটা পৃথিবীর শাসনব্যবস্থাই ছিল বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র: পারস্য, রোম, আবিসিনিয়া, ইয়েমেন। দিগন্তে অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আর যে ব্যবস্থা তখনো শুরুই হয়নি, তার জন্য **বছরের হিসাবে একটি আয়ু** ঠিক করে দেওয়া, তারপর বলা যে তা অন্য কিছুতে গিয়ে ঠেকবে — এ এমন এক ঝুঁকিপূর্ণ নির্দিষ্টকরণ, যা গুনে-হিসাব করে যাচাই করা যায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নবীর ﷺ ওফাতের মধ্য দিয়ে 11 হিজরিতে খিলাফত শুরু হয়: আবু বকর দুই বছর তিন মাস, তারপর উমর সাড়ে দশ বছর, তারপর উসমান প্রায় বারো বছর, তারপর আলি প্রায় পাঁচ বছর, তারপর হাসান প্রায় ছয় মাস — 41 হিজরিতে তিনি ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত। **মোট: পুরোপুরি ত্রিশ বছর।** এরপর শাসন হয়ে গেল উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রাজতন্ত্র, প্রথমে উমাইয়াদের মধ্যে, তারপর আব্বাসিদের মধ্যে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি একটি **মাপা যায় ও মিথ্যা প্রমাণ করা যায় এমন সংখ্যা**, ব্যাখ্যার সুযোগ রাখা কোনো ঢালাও বর্ণনা নয়। মেয়াদ দুই বছর বেশি বা কম হলেই ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যেত। আরও বিস্ময়কর, হাদিস বলেনি "তারপর ইসলাম শেষ হয়ে যাবে", বলেনি "তারপর কুফর ছেয়ে যাবে" — বলেছে "তারপর **রাজতন্ত্র**", অর্থাৎ রাষ্ট্র টিকে থেকেই শাসনের রূপটি বদলে যাবে। আর ঠিক তা-ই ঘটেছে: ইসলামি রাষ্ট্র টিকে থেকেছে ও বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু শাসক নির্বাচনের পদ্ধতিটি বদলে গেছে। রাজনৈতিক বর্ণনার এই নিখুঁততা সংখ্যার নিখুঁততার চেয়ে কম নয়।

87

নগর ও নির্মাণ

রাখালেরা উঁচু দালান তোলায় পাল্লা দেবে

দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে, আর আপনি দেখবেন খালি পায়ের, বস্ত্রহীন, নিঃস্ব মেষ-রাখালেরা দালান তোলায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে চাইছে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — জিবরিলের হাদিস

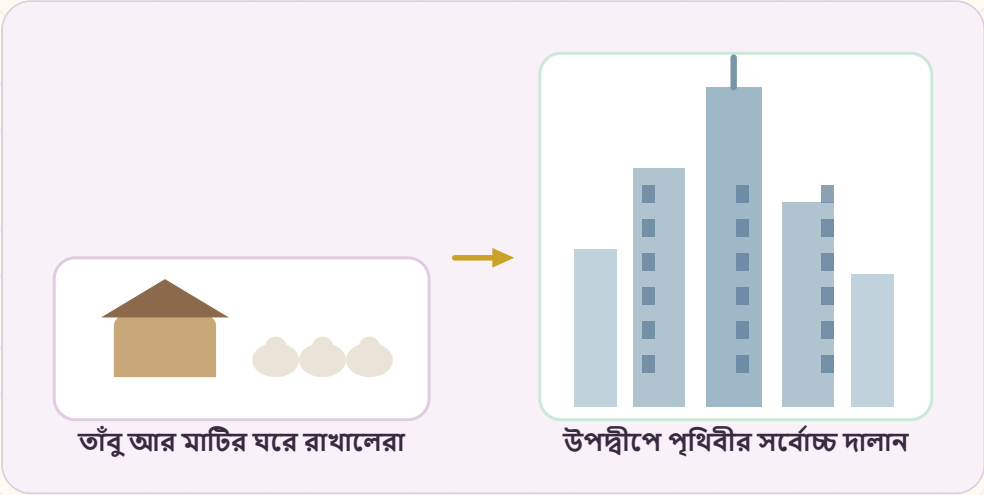

আজ পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু দালানটি দাঁড়িয়ে আছে সেই মরুভূমিতে, যার ঘর ছিল পশমের আর মাটির

সহজ কথায়

নবী ﷺ জানিয়েছেন, শেষ যুগের একটি আলামত হলো **দরিদ্র, খালি পায়ের মেষ-রাখালেরা** উঁচু দালান তোলায় পাল্লা দেবে। আর এটিই আজ আপনি নিজের চোখে দেখছেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সে যুগে আরব উপদ্বীপ ছিল পৃথিবীর বসতিপূর্ণ ভূখণ্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র: নদী নেই, ফসল নেই, জানা কোনো খনিজও নেই। এর অধিবাসীরা ছিল রাখাল, চারণভূমির পিছু পিছু ঘুরে বেড়াত; ঘর ছিল পশম আর মাটির, একতলার বেশি নয়। এই ভূমি একদিন সম্পদ ও নির্মাণের কেন্দ্র হবে — কেউ তা কল্পনাও করেনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বিশ শতকের তিরিশের দশকে উপদ্বীপে তেল আবিষ্কৃত হয়, আর দুই প্রজন্মেই এর অবস্থা বদলে যায়। আজ দুবাইয়ের **বুরজ খলিফা** ৪২৪ মিটার উঁচু হয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ দালান, নির্মাণাধীন **জেদ্দা টাওয়ার** এক কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আর মক্কার **আবরাজুল বাইত** ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে বিশাল দালানগুলোর একটি। আর "সবচেয়ে উঁচু" হওয়ার প্রতিযোগিতা ঠিক ওই অঞ্চলেরই ঘোষিত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটি বাক্যেই তিনটি শর্ত একে সাধারণ প্রজ্ঞাবাক্য নয়, ভবিষ্যদ্বাণী বানিয়ে দেয়। প্রথম: **কারা এটি করবে তার পরিচয়** নির্দিষ্ট করা — "খালি পায়ের, বস্ত্রহীন, নিঃস্ব মেষ-রাখাল"; অর্থাৎ নির্মাতা **দরিদ্ররাই**, নির্মাণে দীর্ঘ ঐতিহ্যওয়ালা কোনো ধনী জাতি নয়। দ্বিতীয়: ক্রিয়াপদ **"পাল্লা দেবে"** — আরবি রূপটি পারস্পরিক, যা কেবল উঁচু নির্মাণ নয়, **উচ্চতায় পাল্লা দেওয়াকেই** বোঝায়। তৃতীয়: এটি বলা হয়েছে **এক বিরাট পরিবর্তনের আলামত** হিসেবে, অর্থাৎ এমন অস্বাভাবিক কিছু যা নিদর্শন গণ্য হওয়ার যোগ্য। আর যিনি রুক্ষ মরুভূমির দিকে তাকিয়ে বলেন, এর অধিবাসীরা একদিন পৃথিবীর সর্বোচ্চ দালান নিয়ে পাল্লা দেবে — তিনি অনুমান থেকে কথা বলছেন না।

জলবায়ু ও পরিবেশ

৪৪ যতক্ষণ না আরবের ভূমি আবার তৃণভূমি ও নদী হয়ে ফেরে

কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না সম্পদ বেড়ে উপচে পড়ে, যতক্ষণ না আরবের ভূমি আবার তৃণভূমি ও নদীতে ফিরে যায়।

মুসলিম বর্ণিত — সহিহ

আরবের বালির নিচে প্রাচীন নদীখাত, যা উপগ্রহ উন্মোচন করেছে

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, আরবের ভূমি সবুজ তৃণভূমি ও বহমান নদীতে **ফিরে যাবে**। মূল শব্দটি হলো **"ফিরে যাবে"** — অর্থাৎ আগে তা এমনই ছিল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরব উপদ্বীপ লিখিত ইতিহাসেরও আগে থেকে রুক্ষ মরুভূমি, আর এর অধিবাসীরা এর অন্য কোনো অবস্থা জানত না। এর সুদূর অতীতের জলবায়ু জানার কোনো উপায়ই ছিল না। আর এটি তৃণভূমিতে ফিরে যাবে বলার অর্থ **একদা তা তৃণভূমিই ছিল** — সংবাদটি ঠিক এখানেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উপগ্রহ ও ভূভেদী রাডার আরবের বালির নিচে উন্মোচন করেছে **প্রাচীন নদীখাতের এক বিশাল জাল**, যাকে বলা হয় জীবাশ্ম-নদী; এর সবচেয়ে বড় দুটি ওয়াদি আল-বাতিন ও ওয়াদি আর-রুম্মা। প্রাচীন জলবায়ুর গবেষণা প্রমাণ করেছে, উপদ্বীপ বারবার আর্দ্র যুগ পার করেছে (সর্বশেষটি প্রায় 6,000 বছর আগে), যখন সেখানে হ্রদ, নদী, চারণভূমি ও বড় প্রাণী ছিল। শুকিয়ে যাওয়া হ্রদের পাশে জলহস্তী ও কুমিরের হাড় এবং পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। আর জলবায়ুচক্র ভবিষ্যতে আর্দ্রতা ফিরে আসার ইঙ্গিত দেয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটি শব্দই মুজিজা বহন করছে: **"ফিরে যাবে"**। এটি একসঙ্গে দুটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করে: এমন এক ভূতাত্ত্বিক **অতীত** সম্পর্কে সংবাদ, যা কারও জানা ছিল না; আর এমন এক **ভবিষ্যৎ** সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, যা এখনো ঘটেনি। বলা হতো "হয়ে যাবে", তবে তা কেবল ভবিষ্যতের কথা হতো। আর হাদিসের ভেতরের ইঙ্গিতটি লক্ষ করুন: এর সঙ্গে জোড়া হয়েছে "সম্পদ বেড়ে উপচে পড়বে" — আর এই অর্ধেকটি তেলের মাধ্যমে সত্যিই ঘটে গেছে, আর সেই তেলই আজ সেখানকার বিশাল বনায়ন ও কৃষি প্রকল্পের অর্থ জোগাচ্ছে।

আগ্নেয়গিরি

89 হিজাজের ভূমি থেকে বেরোনো এক আগুন

কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না হিজাজের ভূমি থেকে এমন এক আগুন বেরোয়, যা বুসরার উটের গর্দান আলোকিত করে দেবে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — মুত্তাফাক আলাইহি

এক ঐতিহাসিক অগ্ন্যুৎপাত, যা উৎসগ্রন্থে ও লাভার স্তরে লিপিবদ্ধ

সহজ কথায়

নবী ﷺ জানিয়েছেন, হিজাজের ভূমি থেকে এমন এক আগুন বেরোবে, যার আলো কয়েকশ কিলোমিটার দূরে শামের **বুসরা** শহর পর্যন্ত পৌঁছাবে। 1256 খ্রিস্টাব্দে তা ঘটেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

হিজাজ মরুভূমির দেশ, এর মানুষ জীবনে আগ্নেয়গিরি দেখেনি। "আগ্নেয়গিরি" শব্দটিই তাদের পরিবেশে অজানা ছিল। আর **আগুন বেরোনোর স্থান** এবং **আলোর বিস্তার** — অন্য দেশের একটি নির্দিষ্ট শহরের নাম ধরে — বলে দেওয়া এমন খুঁটিনাটি, যা নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া বলা যায় না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

654 হিজরির জুমাদাল আখিরা / 1256 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মদিনার পূর্বে **হাররা রাহাতে** একটি অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, যা বায়ান্ন দিন চলে, আর তা থেকে তেইশ কিলোমিটার দীর্ঘ লাভার নদী বয়ে যায়। সমকালীন ঐতিহাসিকেরা — আবু শামা, কুরতুবি ও নববি — এর বর্ণনা দিয়েছেন, আর ইবনে কাসির তাঁদের সংবাদ নিজের "আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া"-তে উদ্ধৃত করেছেন; তাঁরা লিখেছেন যে **এর আলো বুসরা, তাইমা ও মক্কা থেকে দেখা গিয়েছিল**, আর মানুষ রাতে তার আলোয় দেখত। ভূতত্ত্ববিদেরা হাররা রাহাতের লাভাপ্রবাহ পরীক্ষা করে সেগুলোর কাল এই ঘটনার সঙ্গেই মিলিয়েছেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

বর্ণনার সূক্ষ্মতা লক্ষ করুন: শুধু "এক বিরাট আগুন" বলা হয়নি, বরং **দৃশ্যমান ফলটি** নির্দিষ্ট করা হয়েছে: "**বুসরার উটের গর্দান আলোকিত করে দেবে**"। বুসরা দক্ষিণ শামের একটি শহর, মদিনা থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে। আর বিশেষ করে **উটের গর্দানের** বিবরণটি বোঝার আগ পর্যন্ত অদ্ভুত লাগে: দিগন্তের দূরের আভা কেবল সেসব জিনিসকেই আলোকিত করে যা দিগন্তরেখার উপরে ওঠে, আর কাফেলার সবচেয়ে উঁচু জিনিস উটের গর্দান। ছয় শতাব্দী পরে ঐতিহাসিকেরা ঠিক এটিই বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি বহু স্বতন্ত্র উৎসে লিপিবদ্ধ, আর পাথরে ভূতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত।

সূত্র Camp, Hooper, Roobol & White (1987) – *The Madinah eruption* · «ابن كثير – «البداية والنهاية»

আধুনিক জীবন

৯০ সময় ঘনিয়ে আসবে

কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না সময় ঘনিয়ে আসে; ফলে বছর হবে মাসের মতো, মাস হবে সপ্তাহের মতো, আর সপ্তাহ হবে এক দিনের মতো।

আহমদ ও তিরমিজি বর্ণিত — আলবানি সহিহ বলেছেন

যা এক মাস নিত, এখন তা দুই ঘণ্টা নেয়

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, সময় **ঘনিয়ে আসবে**, ফলে বছর হবে মাসের মতো আর মাস হবে সপ্তাহের মতো। আমরা এটিই যাপন করছি: যাতে আগে মাস লাগত, এখন লাগে ঘণ্টা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের অভিজ্ঞতায় সময় ছিল অপরিবর্তনীয়। উট আর ঘোড়ায় সফর, চিঠি পথে মাসের পর মাস, খবর পৌঁছাত মৌসুম পেরিয়ে। এই অনুপাত কখনো বদলাতে পারে — তা ভাবাই যেত না; এগুলো ছিল জীবনের অটল ধ্রুবক।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কাফেলা যা এক মাসে পাড়ি দিত, উড়োজাহাজ তা দুই ঘণ্টায় পাড়ি দেয়। যে চিঠি মাসের পর মাস নিত, তা এখন এক সেকেন্ডেরও কমে পৌঁছে যায়। গ্রন্থাগারে যে অনুসন্ধানে সারা জীবন লাগত, তা মিনিটে শেষ হয়। এই ত্বরণ সমাজবিজ্ঞানে **"কাল-স্থান সংকোচন"** (Time-Space Compression) নামে গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে; এটি একটি স্বীকৃত পরিভাষা, যা পরিবহন ও যোগাযোগের গতি দূরত্বের উপলব্ধিতে কী প্রভাব ফেলে তা বর্ণনা করে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

প্রকাশভঙ্গিটিই মুজিজা। বলা হয়নি "বরকত কমে যাবে", কিংবা "আয়ু দ্রুত কেটে যাবে" — দুটিই সম্ভাব্য ও গ্রহণযোগ্য পাঠ। বরং ব্যবহার করা হয়েছে **ক্রমিক এক গাণিতিক অনুপাতের** রূপ: বছর → মাস, মাস → সপ্তাহ, সপ্তাহ → দিন, দিন → ঘণ্টা। অর্থাৎ প্রতি ধাপে সময়ের একক সংকুচিত হয়ে নামে প্রায় এক-দশমাংশে। আর আরবি ক্রিয়াপদ **"ঘনিয়ে আসা"** পারস্পরিক রূপের, যা প্রান্তগুলোর পরস্পরের কাছে আসা বোঝায় — এটি দূরত্ব সংকোচনের সূক্ষ্ম বর্ণনা, কেবল বরকত কমার নয়। আর বিশ শতকে ভূগোলবিদ ডেভিড হার্ভে যে "কাল-স্থান সংকোচন" পরিভাষাটি গড়েছেন, তা প্রায় এই বাক্যেরই আক্ষরিক অনুবাদ।

সূত্র David Harvey – *The Condition of Postmodernity*, 1989 · Time-space compression

অর্থনীতি

91 সম্পদ এত বাড়বে যে সদকা নেওয়ার কেউ থাকবে না

কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না আপনাদের মধ্যে সম্পদ বেড়ে উপচে পড়ে, এমনকি সম্পদের মালিককে ভাবিয়ে তোলে — কে তার সদকা গ্রহণ করবে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — মুত্তাফাক আলাইহি

নবী ﷺ-এর পেটে পাথর বাঁধা থেকে... গ্রহীতাহীন উদ্‌বৃত্ত পর্যন্ত

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, এমন এক যুগ আসবে যখন সম্পদ এত বাড়বে যে **সদকা গ্রহণ করবে এমন একজন গরিব খুঁজে পেতে সম্পদের মালিককে হয়রান হতে হবে**। ইতিহাসে এটি একাধিকবার ঘটেছে, আজও ঘটছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এই কথাগুলো বলা হয়েছিল এমন এক সমাজে **যা সত্যিই ক্ষুধায় ভুগছিল**: খন্দকের দিনে সাহাবিরা পেটে পাথর বাঁধতেন, আর আহলুস সুফফা গা ঢাকার মতো কাপড়ও পেতেন না। সম্পদ এত উপচে পড়বে যে কোনো গরিবই পাওয়া যাবে না — সেদিন এই ধারণাটিই অকল্পনীয় ছিল। আর সেই সময় পর্যন্ত মানবজাতির গোটা ইতিহাস ছিল অভাবের ইতিহাস, প্রাচুর্যের নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উমর ইবনে আবদুল আজিজের খিলাফতে এটি স্পষ্টভাবে ঘটেছিল; ঐতিহাসিকেরা এমনকি লিখেছেন যে তাঁর কর্মচারীরা সম্পদ নিয়ে ঘুরতেন কিন্তু নেওয়ার কাউকে পেতেন না, তাই সেই অর্থে তাঁরা দাস মুক্ত করেছেন ও অবিবাহিতদের বিয়ে দিয়েছেন। আর আমাদের যুগে: উপসাগরীয় দেশগুলোতে সম্পদ এতটাই উপচে পড়ে যে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায় **জাকাতের খাত খুঁজে বের করা**; আন্তর্জাতিক দাতব্য তহবিল ঘোষণা করে যে তাদের উদ্‌বৃত্ত আছে, যা নিজ দেশে বিতরণ করা যাচ্ছে না; আর আধুনিক অর্থনীতিতে সমস্যার নাম **"অতি-উৎপাদন"** ও "অতি-ভোগ"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে ভবিষ্যদ্বাণীটি "মানুষ ধনী হয়ে যাবে" নয় — তা তো সাধারণ প্রত্যাশা — বরং সম্পূর্ণ উল্টে যাওয়া এক সমীকরণ: **নেওয়া নয়, দেওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে**। এটি অবস্থার উন্নতি নয়, সমাজের গঠনেরই উল্টে যাওয়া। আর আরবি ক্রিয়াপদ **"ভাবিয়ে তোলে"** সূক্ষ্ম: অর্থ হলো তাকে উদ্বিগ্ন করে ও তার মন ব্যস্ত রাখে — অর্থাৎ সমস্যাটি মানসিক ও প্রশাসনিক, বস্তুগত নয়। আর সমকালীন জাকাত তহবিলগুলো যখন ঘোষণা করে যে উদ্‌বৃত্ত আছে অথচ খাত নেই, তখন এটিই ঠিক তার বর্ণনা। এ কথা বলা হয়েছিল এমন এক জাতিকে, যারা দিনের খাবারটুকুও পেত না।

বিজয়

92 আপনারা মিসর জয় করবেন — অধিবাসীদের প্রতি সদয় হবেন

আপনারা মিসর জয় করবেন; সেটি এমন ভূমি, যেখানে কিরাতের নাম চলে। জয় করলে এর অধিবাসীদের সঙ্গে সদাচরণ করবেন, কারণ তাদের রয়েছে দায়িত্ব ও আত্মীয়তার বন্ধন।

মুসলিম বর্ণিত — সহিহ

মিসর: জয়ের প্রায় দশ বছর আগেই নবী ﷺ এর অধিবাসীদের বিষয়ে ওসিয়ত করেছেন

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, মুসলিমরা **মিসর জয় করবে**; আর সেখানে পা রাখার আগেই তিনি এর অধিবাসীদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। একটি চিহ্নও দিয়েছেন: এটি এমন ভূমি, যেখানে **"কিরাত"** ব্যবহৃত হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সে সময় মিসর ছিল সুরক্ষিত এক রোমান প্রদেশ, আর ইসলামি রাষ্ট্র ছিল নবীন, তখনো উপদ্বীপের বাইরে যায়নি। আরবরা মিসরকে চিনত বাণিজ্যের সূত্রে, এর ব্যবস্থার খুঁটিনাটি জানত না। আর কোনো দেশের অধিবাসীদের বিষয়ে **তা জয়ের আগেই** ওসিয়ত করার অর্থ নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করা যে তা জয় হবেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

20 হিজরিতে উমরের খিলাফতকালে আমর ইবনুল আসের হাতে মিসর বিজিত হয়। আর **কিরাত** হলো গ্রিক-মিসরীয় উৎসের একটি পরিমাপ-একক, যা আজও মিসরে জমি মাপতে (1 কিরাত = ফাদ্দানের 1/24 অংশ) এবং সোনার ক্ষেত্রে (21 ও 24 ক্যারেট) ব্যবহৃত হয়। এটি এমন এক একক **যা আরব দেশগুলোর মধ্যে মিসর ছাড়া আর কোথাও এতটা প্রচলিত নয়**। ঐতিহাসিকেরা বরাবর লিখে এসেছেন যে এই পরিভাষা মিসরবাসীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উল্লিখিত চিহ্নটিই প্রমাণ: "**এমন ভূমি, যেখানে কিরাতের নাম চলে**"। এটি এক স্থানীয় প্রচলনের মাধ্যমে পরিচয় দেওয়া, আর তা এমন এক দেশের মানুষের, যেখানে মুসলিমরা তখনো পা রাখেনি — এ ধরনের খুঁটিনাটি কেবল তিনিই বলেন যিনি জানেন। এরপর আরও বিস্ময়কর কারণটি: "কারণ তাদের রয়েছে **দায়িত্বের বন্ধন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক**" — আত্মীয়তার ইঙ্গিত ইসমাইল আলাইহিস সালামের মা হাজেরার দিকে, যিনি মিসরীয়, এবং নবী ﷺ-এর পুত্র ইবরাহিমের মা মারিয়া কিবতিয়ার দিকে। অর্থাৎ ওসিয়তটি দাঁড়িয়ে আছে বাস্তব এক আত্মীয়তার উপর। একটি জাতির সঙ্গে সদাচরণের ওসিয়ত, তাদের দেশ জয়ের প্রায় দশ বছর আগে — এমন একজনের কাছ থেকে, কথাটি বলার দিনে যাঁর কোনো সেনাবাহিনীই ছিল না।

নির্দিষ্ট ব্যক্তি

93 উয়াইস আল-কারানি — যাঁকে তিনি দেখেননি, তাঁর বর্ণনা

আপনাদের কাছে ইয়েমেনবাসীর সাহায্যকারী দলের সঙ্গে আসবে উয়াইস ইবনে আমির, মুরাদ গোত্রের, তারপর কারান শাখার। তার শ্বেতরোগ ছিল, তা থেকে সে সুস্থ হয়েছে — এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ছাড়া। তার এক মা আছেন, যাঁর প্রতি সে অনুগত।

মুসলিম বর্ণিত — সহিহ

পাঁচ নিদর্শন, আগেই নির্ধারিত

- তাঁর নাম: উয়াইস ইবনে আমির
- তার গোত্র: মুরাদ, তারপর কারান
- শ্বেতরোগ ছিল, সেরে গেছে
- এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা বাকি
- শুধু মায়ের প্রতি অনুগত

উমর বছর কয়েক পরে এসব চিহ্নেই তাঁকে পেলেন

উমর ইবনুল খাত্তাব হজের মৌসুমে তাঁর খোঁজ করে গেছেন, যতক্ষণ না পেয়ে যান

সহজ কথায়

নবী ﷺ এমন একজনের বর্ণনা দিয়েছেন **যাঁকে তিনি কখনো দেখেননি, সাক্ষাৎও করেননি**: তাঁর নাম, তাঁর গোত্র, তিনি এক রোগ থেকে সুস্থ হয়েছেন — শুধু একটি মুদ্রার সমান ছোট দাগ ছাড়া, আর তিনি মায়ের প্রতি অনুগত। পরে উমর এই সব চিহ্নসহই তাঁকে খুঁজে পান।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

উয়াইস ছিলেন ইয়েমেনের এক অখ্যাত মানুষ — মর্যাদা নেই, নামডাক নেই — আর নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ হয়নি (এ কারণেই তিনি সাহাবি নন, তাবেয়ি)। ইয়েমেন আর মদিনার মধ্যে দীর্ঘ পথ, সেখানকার এক-একজন মানুষের খবর জানার কোনো উপায় ছিল না। আর বর্ণনায় রয়েছে **অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক দৈহিক চিহ্ন**, যা কেবল তিনিই জানতে পারেন যিনি তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখেছেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বছরের পর বছর ইয়েমেনবাসীর সাহায্যকারী দলের মধ্যে উয়াইসের খোঁজ করেছেন, যতক্ষণ না তাঁর দেখা পান। তিনি তাঁর নাম ও গোত্র জিজ্ঞেস করেন, তারপর শ্বেতরোগের কথা জিজ্ঞেস করে দেখেন বিষয়টি ঠিক যেমন বলা হয়েছিল তেমনই; এরপর জিজ্ঞেস করেন: "আপনার কি মা আছেন?" তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উমর তাঁর কাছে নিজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা চাইলেন। পুরো ঘটনাটি **সহিহ মুসলিমে** রয়েছে, এ বিষয়ে বর্ণিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোর একটি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একজন মানুষের মধ্যে মিলে গেছে পাঁচটি স্বতন্ত্র চিহ্ন। নাম ও বংশ হয়তো অনুমানকারীর মিলে যেতেও পারে, কিন্তু চতুর্থ চিহ্নটিই নির্ণায়ক: "**তার শ্বেতরোগ ছিল, তা থেকে সে সুস্থ হয়েছে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ছাড়া**" — এটি একটি অতীত রোগের বর্ণনা, তা থেকে আরোগ্যের বর্ণনা, আর নির্দিষ্ট মাপের অবশিষ্টাংশের বর্ণনা। এক চিহ্নেই তিনটি তথ্য, আর তা অন্য দেশের এক মানুষের শরীর সম্পর্কে। বিস্ময়কর হলো, নবী ﷺ উমরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন **তাঁর কাছে দোয়া চান** — ফলে আমিরুল মুমিনিন বছরের পর বছর এক অখ্যাত রাখালকে খুঁজেছেন, নিজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করাতে। একটি চিহ্নও ভুল হলে সাহাবিদের চোখের সামনেই গোটা সংবাদটি ভেঙে পড়ত।

94

নৌ-ইতিহাস

প্রথম যে বাহিনী সমুদ্রে যাবে

আমার উম্মতের যে বাহিনী প্রথম সমুদ্রপথে অভিযান করবে, তারা জান্নাত নিশ্চিত করে নিয়েছে ... তারপর তিনি বললেন: আপনি প্রথমদের একজন।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — মুত্তাফাক আলাইহি

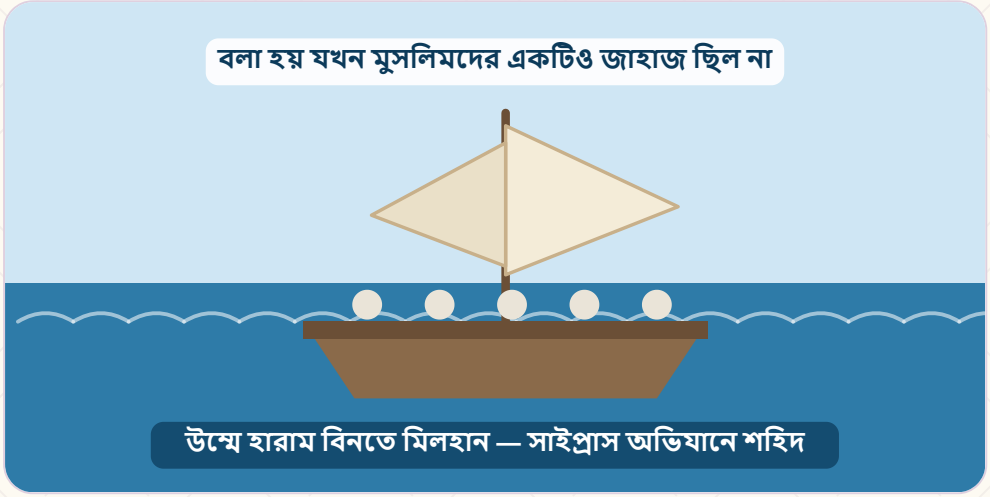

ইসলামের প্রথম নৌ-অভিযান — সাইপ্রাস, ২৪ হিজরি

সহজ কথায়

নবী ﷺ স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর উম্মতের একটি বাহিনী **সমুদ্রে যাত্রা করছে**। উম্মে হারাম দোয়া চাইলেন যেন তিনি তাদের মধ্যে থাকেন; তিনি বললেন: **"আপনি প্রথমদের একজন।"** আর তা-ই হয়েছিল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবরা ছিল স্থলের জাতি, সমুদ্রের নয়। জাহাজ ছিল না, নৌ-যুদ্ধের জ্ঞানও ছিল না; তাদের সংস্কৃতিতে সমুদ্র ছিল ভয়ের বস্তু, যা এড়িয়ে চলা হতো। এমনকি উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর গোটা খিলাফতকালে মানুষের নিরাপত্তার ভয়ে সমুদ্র-অভিযানের অনুমতি দেননি। তাই ইসলামি নৌবাহিনীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অত্যন্ত অসম্ভাব্য।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

২৪ হিজরিতে উসমান ইবনে আফফান মুয়াবিয়াকে সমুদ্র-অভিযানের অনুমতি দেন; প্রথম ইসলামি নৌবহর গড়ে ওঠে এবং **সাইপ্রাসে** অভিযান চালায়। তার সঙ্গে গিয়েছিলেন **উম্মে হারাম বিনতে মিলহান** রাদিয়াল্লাহু আনহা; তীরে নামার পর তাঁর জন্য আনা বাহনটি তাঁকে ফেলে দিলে তিনি মারা যান এবং সেখানেই সমাহিত হন। তাঁর কবর আজও সাইপ্রাসে "হালা সুলতান তেক্কে" নামে পরিচিত, মানুষ তা জিয়ারত করে। ঘটনাটি সহিহাইনে রয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটি ছোট বাক্যে তিন স্তরের সংবাদ। প্রথম: এই উম্মতের আদৌ **একটি নৌবাহিনী** থাকবে — অথচ এরা মরুভূমির জাতি, জাহাজই নেই। দ্বিতীয়: একজন নির্দিষ্ট নারী **তাতে থাকবেন** — যিনি তখন মদিনায়, সমুদ্রের কথা ভাবছেনই না। তৃতীয় ও সবচেয়ে সূক্ষ্ম: তিনি থাকবেন **"প্রথমদের"** মধ্যে, পরবর্তীদের মধ্যে নয় — অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে **প্রথম অভিযানেই**, কোনো পরের যুদ্ধে নয়। তিনি চেয়েছিলেন দ্বিতীয় দলে থাকতে, কিন্তু তিনি বললেন: "আপনি প্রথমদের একজন।" নির্দিষ্টকরণটি ঠিক জায়গাতেই পড়ল। আর সংবাদের প্রায় বিশ বছর পর তিনি সেই অভিযানেই মারা যান।

ফিরকা ও ফিতনা

95 খারিজিরা — আর যার এক হাত নারীর স্তনের মতো

আপনাদের মধ্যে এমন এক দল বেরোবে, যাদের নামাজের তুলনায় আপনারা নিজেদের নামাজকে তুচ্ছ মনে করবেন ... তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি ছাড়াবে না; তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তির শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — মুত্তাফাক আলাইহি

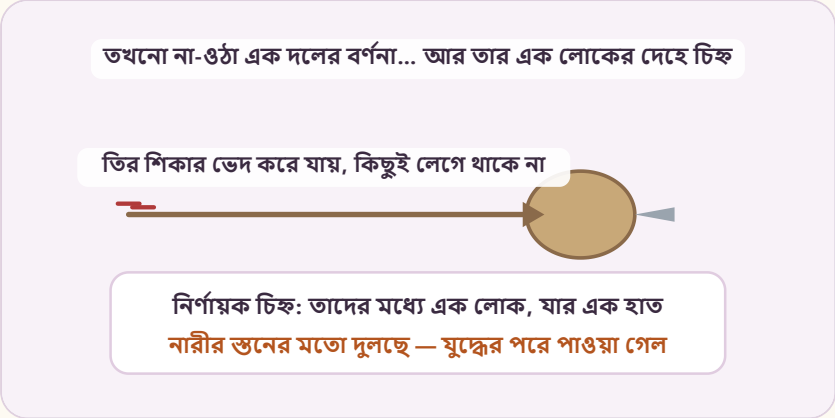

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহতদের মধ্যে তাকে খুঁজতে আদেশ দেন, যতক্ষণ না পাওয়া গেল

সহজ কথায়

নবী ﷺ এমন এক দলের বর্ণনা দিয়েছেন, যারা মুসলিমদের মধ্য থেকেই বেরোবে: বাইরে তাদের ইবাদত কঠোর, তারা কুরআন পড়ে, অথচ তারা **দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়**। আর তিনি একটি চিহ্ন দিলেন: তাদের মধ্যে থাকবে এমন একজন, যার হাত অসম্পূর্ণ ও অদ্ভুত আকারের।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

তখন উম্মতে কোনো ফিরকা ছিল না, বিভাজনও ছিল না। আর এমন এক দলের ধারণা, **যারা কঠোর ইবাদত ও দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া একসঙ্গে মেলায়** — বাইরে থেকে তা স্ববিরোধীই ঠেকত; কারণ প্রত্যাশা তো এই যে, পথভ্রষ্ট ইবাদতে শিথিল হবে, বাড়াবাড়িকারী নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

খারিজিরা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে আত্মপ্রকাশ করে; তারা মুসলিমদের কাফির ঘোষণা করে ও তাদের রক্ত হালাল মনে করে, অথচ দীর্ঘ নামাজ ও বেশি তিলাওয়াতের জন্য তারা ছিল প্রসিদ্ধ। আলি ৩৪ হিজরিতে **নাহরাওয়ানে** তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের পর তিনি বর্ণিত সেই লোকটিকে খুঁজতে আদেশ দেন; নিহতদের মধ্যে খোঁজা হয়, শেষে পাওয়া যায় — এমন এক ব্যক্তি, যার এক হাত নারীর স্তনের মতো। আলি তাকবির দিয়ে বললেন: "আল্লাহ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসুল পৌঁছে দিয়েছেন।" ঘটনাটি সহিহ মুসলিমে রয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উপমাটিই অত্যন্ত সূক্ষ্ম: "**তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায় যেভাবে তির শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়**"। তির যখন শিকারের শরীর ভেদ করে বেরোয়, তখন তা বেরোয় **পরিষ্কার, তাতে রক্ত বা মাংসের কিছুই লেগে থাকে না** — এটি তারই বর্ণনা, যে দ্বীনের ভেতর দিয়ে চলে যায় অথচ তার কিছুই সঙ্গে থাকে না, যদিও সে তাতে ছুটে চলে প্রবল বেগে। কিন্তু নির্ণায়ক হলো **দৈহিক চিহ্নটি**: এমন এক দলের নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির হাতে এক বিরল বিকৃতি — যে দল তখনো জন্মায়নি, আর এমন এক যুদ্ধে, যা তখনো ঘটেনি। আর এটি **তৎক্ষণাৎ যাচাইযোগ্য** এক চিহ্ন — এ কারণেই আলি নিজে নিহতদের মধ্যে তা খুঁজেছেন। না পাওয়া গেলে গোটা সেনাবাহিনীর সামনেই সংবাদটি ভেঙে পড়ত।

96

জাতি ও জনগোষ্ঠী

ছোট চোখ ও চওড়া মুখের এক জাতি

কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না আপনারা এমন এক জাতির সঙ্গে লড়েন যাদের জুতা পশমের, আর যতক্ষণ না আপনারা তুর্কিদের সঙ্গে লড়েন — ছোট চোখ, লালচে মুখ, চ্যাপ্টা নাক, যেন তাদের মুখ স্তরে-স্তরে মোড়া ঢাল।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — মুত্তাফাক আলাইহি

আরবরা তখন দেখেনি এমন জাতির সূক্ষ্ম নৃতাত্ত্বিক বর্ণনা

"ছোট চোখ · চওড়া মুখ · চ্যাপ্টা নাক"

মঙ্গোল আক্রমণ — সপ্তম হিজরি শতক

মধ্য এশিয়ার জনগোষ্ঠীর চেহারা, আরবরা তা দেখার শত শত বছর আগেই বর্ণিত

সহজ কথায়

নবী ﷺ এমন এক জাতির বর্ণনা দিয়েছেন যাদের সঙ্গে মুসলিমরা লড়বে, আর বর্ণনা দিয়েছেন **তাদের মুখের গড়নের**: ছোট চোখ, চওড়া গোলাকার মুখ, খাটো চ্যাপ্টা নাক। এগুলোই মধ্য এশিয়ার জনগোষ্ঠী ও মোঙ্গলদের বৈশিষ্ট্য।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

উপদ্বীপের আরবরা নিজেদের ছাড়া দেখত কেবল রোমান, পারসিক ও হাবশিদের — এদের সবার চেহারা এই বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আর এশীয় তৃণভূমির জনগোষ্ঠী ছিল পারস্যের ওপারে সুদূর প্রাচ্যে, তাদের খবর উপদ্বীপে পৌঁছাত না। আরবদের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না — যুদ্ধও নয়, বাণিজ্যও নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসে এমন তিনটি শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা এসেছে, যা আজ পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিত: **সরু চোখের পাতার ফাঁক ও কোণের ভাঁজ**, **উঁচু গালের হাড়সহ চওড়া চ্যাপ্টা মুখ**, আর **নিচু নাসাসেতুর খাটো নাক**। আর যুদ্ধ সত্যিই ঘটেছে: সপ্তম হিজরি শতকের মোঙ্গল আগ্রাসন, যা 656 হিজরিতে বাগদাদ ধ্বংস করে, তারপর 658 হিজরিতে **আইন জালুতে** পরাজিত হয়। এর আগে প্রথম শতক থেকেই মুসলিমরা মাওয়ারাউন্নাহরে তুর্কিদের সঙ্গে লড়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি **নৃতাত্ত্বিক** বর্ণনা, রাজনৈতিক বা সামরিক নয়। আর এটি এমন একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যে থেমে থাকেনি, যা দৈবক্রমে মিলে যেতে পারে; বরং একত্র করেছে **পরস্পর-সংলগ্ন চারটি বৈশিষ্ট্য**, যা একসঙ্গে এমন এক নির্দিষ্ট মুখাবয়ব গড়ে তোলে, আজকের নরগোষ্ঠীবিদ্যা যা চেনে। আর শেষ উপমাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম: "যেন তাদের মুখ **স্তরে-স্তরে মোড়া ঢাল**" — মিজান্ন মানে ঢাল, আর মুতরাকা সেই ঢাল, যাতে চামড়ার স্তর চড়ানো হয়েছে, ফলে তা হয়ে উঠেছে চওড়া, গোলাকার, অল্প উঁচু। আরব মরুভূমির একজন মানুষ চীনের ওপারে বসবাসকারী এক জাতির চেহারার বর্ণনা দেবেন, তারপর জানাবেন যে তাঁর উম্মত তাদের সঙ্গে লড়বে — এতে অনুমানের কোনো প্রবেশপথই নেই।

97

সমাজ

তারা মদ পান করবে, আর তাকে ডাকবে অন্য নামে

আমার উম্মতের কিছু লোক অবশ্যই মদ পান করবে, আর তারা তাকে তার নিজের নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকবে।

আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন — আলবানি সহিহ বলেছেন

নাম বদলে যায়, যাতে হারাম জিনিসটি গ্রহণ করা সহজ হয়ে ওঠে

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, তাঁর উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, কিন্তু তারা **তাকে মদ বলে ডাকবে না** — তারা তাকে অন্য নাম দেবে, যাতে তা সহজে গলা দিয়ে নামে আর তাকে জায়েজ বলে দেখানো যায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মদকে খোলাখুলি তার নিজের নামেই ডাকা হতো, আর কবিতায় তা নিয়ে গর্ব করা হতো। কেউ তাতে লজ্জা পেত না, কারও তার নাম লুকানোর প্রয়োজনও পড়ত না। তাই হাদিসটি একটি নির্দিষ্ট **মানসিক ও সামাজিক আচরণের** ভবিষ্যদ্বাণী করছে: মানুষ নিষেধাজ্ঞা স্বীকার করবে, তারপর নাম বদলে তাকে পাশ কাটিয়ে যাবে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সমাজবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানে এটি **"শিষ্টোক্তি"** (Euphemism) নামে পরিচিত একটি পরিঘটনা: কোনো বস্তুর নাম বদলে দেওয়া, যাতে তার ধাক্কা হালকা হয় বা তার ওপরের নিষেধাজ্ঞা এড়ানো যায়। আমাদের চারপাশ এর উদাহরণে ভরা: "স্পিরিট", "স্বাস্থ্যকর ওয়াইন", অ্যালকোহলযুক্ত "এনার্জি ড্রিংক", "গাঁজানো তেঁতুল", আর "অ্যালকোহল-মুক্ত বিয়ার" যাতে তবু কিছু পরিমাণ থেকেই যায়। একই নীতি সুদের বেলায় ("ইন্টারেস্ট", "বিনিয়োগ-মুনাফা") আর অন্যান্য হারামের বেলায়ও কাজে লাগানো হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে ভবিষ্যদ্বাণীটি কোনো **কাজের** নয়, বরং **একটি ভাষাগত কৌশলের** — আর এটি অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও কঠিন। "কিছু লোক মদ পান করবে" বলা তো একটি প্রত্যাশিত কথা। কিন্তু **ফাঁকি দেওয়ার পদ্ধতিটি** নির্দিষ্ট করে দেওয়া — বিধান অস্বীকার নয়, বরং নাম বদলে ফেলা — এমন এক মানসিক ও সামাজিক কার্যপ্রণালীর বর্ণনা, যা সেই সমাজে চোখেই পড়ত না। আর আজ তা সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের একটি পুরো অধ্যায়। এটি আরেকটি হাদিসের সঙ্গেও মিলে যায়, যাতে তাকে নিন্দা করা হয়েছে যে "নিজের দেওয়া কোনো নামে হারামকে হালাল করে নেয়" — বিধান একটিই, তার রূপ যতই হোক।

সূত্র Allan & Burridge – *Euphemism and Dysphemism*, 1991 · Euphemism

সভ্যতা

98 তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ ধরেই চলবে

তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি ধরে চলবে, বিঘতে বিঘতে আর হাতে হাতে; এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে ঢোকে, তোমরাও তাদের পিছু পিছু ঢুকবে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

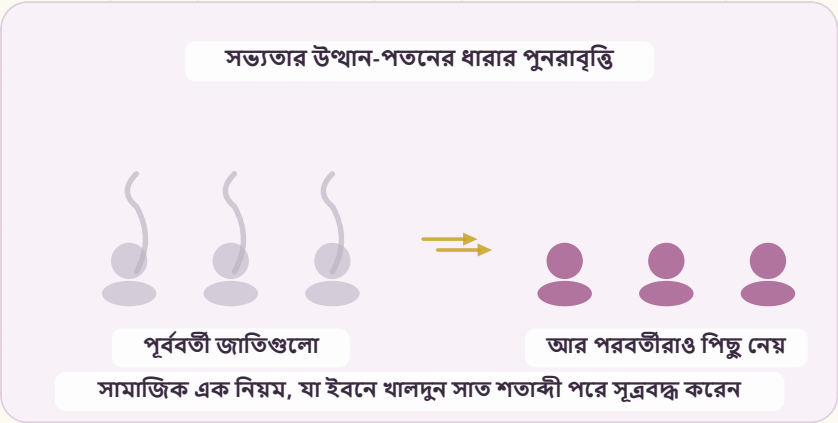

জাতিগুলো তাদের পূর্বসূরিদের ভুল এমনভাবে আবার করে যে ঐতিহাসিকেরা বিস্মিত হন

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, এই উম্মত তার পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে **পদে পদে** অনুকরণ করবে — এমনকি সেই অর্থহীন কাজগুলোতেও, যাতে কোনো উপকারই নেই।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রচলিত ধারণা ছিল, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পথ আছে, আর মুসলিমরা তাদের দ্বীনের কারণে অন্যেরা যে গর্তে পড়েছে তাতে পড়া থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছেন। ব্যতিক্রমহীনভাবে সব জাতির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোনো "নিয়মের" ধারণাই তখন ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান একেই বলে **সভ্যতার চক্র**। ইবনে খালদুন সাত শতাব্দী পরে তাঁর "মুকাদ্দিমা"-য় একে সূত্রবদ্ধ করেন, আর এরই ওপর অসওয়াল্ড স্পেংলার ও আর্নল্ড টয়েনবি বিশ শতকে তাঁদের তত্ত্ব দাঁড় করান: **জাতিগুলো উত্থান, বিলাসিতা ও বিলয়ের একই রকম স্তর পেরিয়ে যায়** এবং প্রায় অনিবার্যভাবে পূর্বসূরিদের ভুলগুলোই আবার করে। সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যক্তির আচরণেও এর সমান্তরাল একটি পরিঘটনা লক্ষ করেছেন, যার নাম দিয়েছেন **পালের আচরণ** (Herd Behaviour)।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সূক্ষ্মতাটি রয়েছে শেষ শর্তে: "**এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে ঢোকে, তোমরাও তাদের পিছু পিছু ঢুকবে**"। হাদিস উপকারী জিনিসের অনুকরণের কথা বলছে না — তা তো যুক্তিসংগত ও প্রশংসনীয় — বরং **যাতে কোনো উপকার নেই, কোনো অর্থও নেই** তার অনুকরণের কথা বলছে, এমনকি যাতে স্পষ্ট ক্ষতি আছে। সমাজবিজ্ঞানীরা আজ ঠিক এটিই বর্ণনা করেন আচরণের সেই হুজুগগুলো নিয়ে, যা কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর ক্রিয়াপদের জোরালো কসম-রূপটিও লক্ষ করুন: **এটি ঘটবেই বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে, কোনো সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হচ্ছে না**। আর তা ঘটেছে এমনভাবে যে কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।

সূত্র Asch (1951) – the conformity experiments · Herd behaviour

শক্তির ভারসাম্য

99 জাতিগুলো একে অপরকে ডাকবে... আর স্রোতের ফেনা

অচিরেই জাতিগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকবে, যেমন ভোজনকারীরা তাদের খাবারের পাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকে। বলা হলো: সেদিন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব? তিনি বললেন: না, সেদিন তোমরা বরং অনেক হবে — কিন্তু তোমরা হবে স্রোতের ফেনার মতো ফেনা।

আবু দাউদ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন — আলবানি সহিহ বলেছেন

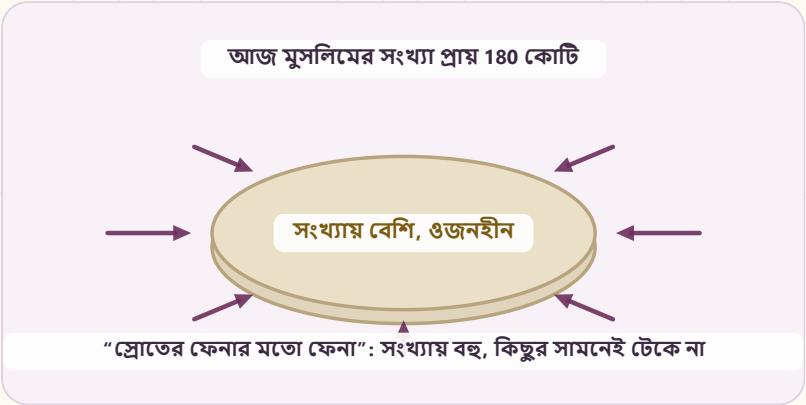

হাদিস অস্বীকার করেছে যে কারণটি সংখ্যায় কম হওয়া — আর আসল কারণটি বলে দিয়েছে

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, জাতিগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকবে, যেমন ভোজনকারীরা খাবারের পাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: সংখ্যায় কম বলে? তিনি বললেন: **না, তোমরা তো অনেকই হবে** — কিন্তু কোনো ওজন নেই, কোনো প্রভাবও নেই।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সেই সম্প্রদায় তখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে ওঠার পথে। এক প্রজন্মের ভেতরেই তারা পারস্য, শাম, মিসর ও উত্তর আফ্রিকা উন্মুক্ত করে ফেলে। তাই আসন্ন এক দুর্বলতার ভবিষ্যদ্বাণী — তাও আবার **সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে** — ঘটনার দৃশ্যমান গতির সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হয়েছিল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আজ মুসলিমের সংখ্যা প্রায় **দুইশ কোটি**, অর্থাৎ পিউ রিসার্চ সেন্টারের হিসাবে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় **26%**; তাদের হাতে বিশ্বের বৃহত্তম জ্বালানি-মজুদ আর কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান। তবু বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক, শিল্প ও অর্থনৈতিক উৎপাদনে তাদের অংশ নিজেদের সংখ্যার তুলনায় নগণ্য, আর তাদের ভূমিগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে সংঘাতপীড়িত ও পরনির্ভর অঞ্চলগুলোর অন্যতম। **সংখ্যা আছে, সভ্যতার ওজন নেই** — হাদিস ঠিক এই সমীকরণটিই বর্ণনা করেছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই হাদিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এটি **ভুল ব্যাখ্যাটি আগেই ধরে ফেলে স্পষ্টভাবে তা নাকচ করেছে**। যখন জিজ্ঞাসা করা হলো "সেদিন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব?" তিনি হ্যাঁ বলেননি — বললেন "না, সেদিন তোমরা বরং অনেক হবে।" তিনি সংখ্যাকে সমীকরণ থেকে একেবারেই বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন যে **ত্রুটি গুণে, পরিমাণে নয়**। আর **"স্রোতের ফেনা"** উপমাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম: ফেনা হলো বন্যা যে ফেনা আর খড়কুটো নিজের উপরিতলে বয়ে নেয় — দেখতে প্রচুর, অথচ ওজনহীন; কোথাও থিতু হয় না, আর যেদিকে ঠেলে দেওয়া হয় সেদিকেই যায়, নিজের ইচ্ছেমতো নয়। তারপর হাদিসের বাকি অংশে তিনি কারণটিও বলে দিয়েছেন: "দুর্বলতা... দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর প্রতি অনীহা" — এ এক মানসিক রোগনির্ণয়, সামরিক নয়।

আগেই নাম-বলা এক প্রশ্ন

100 “তাহলে তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে?” — জিজ্ঞাসার আগেই নাম-বলা প্রশ্ন

শয়তান তোমাদের কারও কাছে এসে বলে: এটি কে সৃষ্টি করেছে? ওটি কে সৃষ্টি করেছে? — এমনকি সে বলে বসে: তাহলে তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? কেউ সেখানে পৌঁছে গেলে সে যেন আল্লাহর আশ্রয় চায় এবং থেমে যায়।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

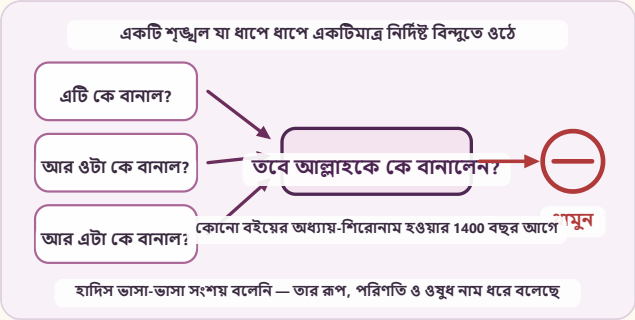

রূপ, শেষ বিন্দু আর প্রতিকার — তিনটিই একটিমাত্র বাক্যে

সহজ কথায়

হাদিসটি এক অদ্ভুত জিনিসের বর্ণনা দিচ্ছে: এমন এক সংশয়, যা **একবারে আসে না, আসে শিকলের মতো** — প্রতিটি কড়া পরেরটিকে জন্ম দেয়, যতক্ষণ না তা একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নে গিয়ে থামে: **“তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?”** আর এটিই গোটা আধুনিক নাস্তিক্যবাদের সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত আপত্তি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

নবী ﷺ-এর পরিবেশে এই প্রশ্নটি চালুই ছিল না। তাঁর বিরোধীরা ছিল **মুশরিক**, নাস্তিক নয়: তারা স্রষ্টাকে স্বীকার করত আর তাঁর সঙ্গে অন্যদেরও পূজা করত — “আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে: আল্লাহ।” বিরোধটি ছিল **ইবাদত কার প্রাপ্য** তা নিয়ে, **আদৌ কোনো স্রষ্টা আছেন কি না** তা নিয়ে নয়। মক্কায় কেউ এ প্রশ্ন করেছে — এমন কোনো বর্ণনাই নেই। অর্থাৎ হাদিসটি এমন এক সংশয়ের বর্ণনা দিচ্ছে **যা তার নিজের সময়ে ছিলই না**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

এই প্রশ্নটিই পরে হয়ে উঠল **আধুনিক নাস্তিক আপত্তির সবচেয়ে বড় পতাকা**। **বার্ট্রান্ড রাসেল** তাঁর 1927 সালের বক্তৃতা “কেন আমি খ্রিষ্টান নই”-এ এটি উত্থাপন করেন এবং প্রথম-কারণ যুক্তি ত্যাগ করার কারণ হিসেবে একেই দাঁড় করান। **রিচার্ড ডকিন্স** 2006 সালে *দ্য গড ডিলিউশন*-এর **চতুর্থ** অধ্যায়ের অক্ষ বানান এটিকেই — “কেন প্রায় নিশ্চিতভাবেই কোনো ঈশ্বর নেই” — তাঁর বিখ্যাত **“চূড়ান্ত বোয়িং 747”** যুক্তিতে, যেখানে তিনি বলেন, নকশাকারের অনুকল্প সঙ্গে সঙ্গেই আরও বড় একটি সমস্যা দাঁড় করিয়ে দেয়: **“নকশাকারকে নকশা করল কে?”**

আর দর্শনের উত্তরটিও ঠিক তাই, যার নির্দেশ হাদিস দিয়েছে: **থেমে যাওয়া**। কারণ প্রশ্নটি নিজের ভেতরেই একটি যৌক্তিক ত্রুটি বয়ে বেড়ায় — সে আগে ধরে নেয় যে স্রষ্টা নিজেই সৃষ্ট, তারপর তাঁর স্রষ্টার খোঁজ করে। আর যে শিকল কখনো শেষ হয় না তা কিছুই ব্যাখ্যা করে না: প্রতিটি জিনিসের যদি কারণ লাগে, তবে কোনো কিছুই কখনো অস্তিত্ব পাবে না। যুক্তিবিদেরা একে বলেন **অনবস্থা দোষ**।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

হাদিসের তিনটি জিনিস অনুমানের নাগালের বাইরে:

1 — রূপ। তিনি বলেননি “মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে সংশয়ে পড়বে” — এ তো এমন এক সাধারণ কথা, যা সব যুগেই খাটে। তিনি বর্ণনা করেছেন **শিকলবদ্ধ প্রশ্নের একটি গঠন**: এক প্রশ্ন টেনে আনে আরেক প্রশ্ন, সেটি টেনে আনে তৃতীয়টিকে।

2 — শেষ বিন্দু। আর শিকলটি যে শেষ স্টেশনে গিয়ে থামে, তিনি তার শব্দ ধরেই তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সত্যিই সেটিই শেষ স্টেশন: এই দিকে “আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?”-এর পরে আর কোনো প্রশ্নই অবশিষ্ট থাকে না।

3 — প্রতিকার। তিনি তর্কের নির্দেশ দেননি, দিয়েছেন শিকলটি ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ — আর এটিই সেই যৌক্তিক উত্তর, যেখানে দর্শন পৌঁছেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে: ত্রুটি প্রশ্নে, উত্তরে নয়।

আর একটি সীমা অবশ্যই বলে রাখা দরকার: এটি অন্তরের এক পরিঘটনার সংবাদ, বস্তুজগতের কোনো তথ্যের নয়; একে কোনো অণুবীক্ষণ মাপে না, কোনো দাঁড়িপাল্লাও ওজন করে না। কিন্তু এটি **পুরোপুরি খণ্ডনযোগ্য**: এই প্রশ্ন যদি এই রূপে আর বিতর্কের এই জায়গায় দেখা না দিত, তবে সংবাদটি ভেঙে পড়ত। আর তা দেখা দিয়েছে, এবং শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত নাস্তিক্যবাদী বইটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হয়ে উঠেছে। **তাহলে তাঁকে কে জানাল?**

সূত্র Bertrand Russell — *Why I Am Not a Christian*, 1927 · Richard Dawkins — *The God Delusion*, 2006 · Infinite regress — the logical fault in the question

তৃতীয় পর্ব

তাওরাত ও ইনজিলের সুসংবাদসমূহ

যেসব পাঠ আজও আহলে কিতাবের নিজেদের গ্রন্থে লেখা রয়েছে, আর যেগুলো আগামী এক নবির বর্ণনা দেয় — যাঁর গুণাবলি সমগ্র ইতিহাসে কেবল একজন মানুষের সঙ্গেই মেলে, আর অন্য কারও সঙ্গে নয়।

11 প্রমাণ

101

দ্বিতীয় বিবরণ

তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মতো এক নবি

আমি তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মতো একজন নবি দাঁড় করাব, আর আমার কালাম তার মুখে দেব; আর আমি তাকে যা আদেশ করব, সে তাদের তা-ই বলবে।

দ্বিতীয় বিবরণ — অধ্যায় 18, আয়াত 18

তাদের ভাইদের মধ্য থেকে

বনি ইসরাইল ইসহাক থেকে
আর তাদের ভাই ইসমাঈলের বংশ
সুতরাং নবী আরবদের মধ্য থেকে
বনি ইসরাইল থেকে নয়

→

মূসার মতো

পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত
বাবা ও মা... জন্ম ও মৃত্যু
নেতা, যোদ্ধা ও বিধানদাতা
আর জাতিকে নিয়ে হিজরত করলেন

"আমার কালাম তার মুখে দেব" — যা ওহি হয় তা-ই হুবহু বলেন

একটি পাঠেই তিনটি শর্ত: ভাইদের মধ্য থেকে, মূসার মতো, আর যা তাঁর মুখে দেওয়া হবে তা-ই বলবেন

সহজ কথায়

আল্লাহ মূসাকে আগামী এক নবির ওয়াদা দিচ্ছেন, যাঁর তিনটি গুণ: তিনি হবেন বনি ইসরাইলের **ভাইদের** মধ্য থেকে, তাদের মধ্য থেকে নয়; তিনি হবেন **মূসার মতো**; আর তিনি **সেই কালামই বলবেন যা তাঁর মুখে রাখা হবে**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ইহুদিরা শত শত বছর ধরে এই নবির অপেক্ষা করেছে, আর যিনিই আবির্ভূত হয়েছেন তাঁকেই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। যোহনের সুসমাচারে আছে, তারা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞাসা করল: "আপনি কি এলিয়?" তিনি বললেন, না। "আপনি কি **সেই নবি**?" তিনি বললেন, না। — এতে বোঝা গেল, "সেই নবি" ছিলেন অপেক্ষিত এক নির্দিষ্ট তৃতীয় ব্যক্তি, মসীহও নন, এলিয়ও নন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

তাওরাতের ভাষায় "**তাদের ভাইয়েরা**" অর্থ চাচাতো ভাই, এক পিতার ছেলে নয় — বনি ইসরাইল ইসহাকের বংশ, আর তাদের ভাইয়েরা ইসমাঈলের বংশ, অর্থাৎ আরবরা। আর "**তোমার মতো**"—এর সূক্ষ্ম তুলনা মুহাম্মদ ﷺ-কেই দেয়: তিনি মাতা-পিতা থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্মেছেন, বিয়ে করেছেন ও সন্তান হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ এক শরিয়ত এনেছেন, নিজ জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন ও শাসন করেছেন, নিজ শহর থেকে হিজরত করেছেন, আর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। আর দ্বিতীয় বিবরণ নিজেই শেষ করে: "**মূসার মতো কোনো নবি ইসরাইলে আর দাঁড়ায়নি**" (34:10) — এতে বনি ইসরাইলের সব নবিই তুলনা থেকে বাদ পড়ে যান।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

তৃতীয় শর্তটিই নির্ণায়ক: "**আর আমার কালাম তার মুখে দেব, আর আমি তাকে যা আদেশ করব সে তাদের তা-ই বলবে**"। এ হলো এমন এক নবির বর্ণনা যিনি **অক্ষরে অক্ষরে লিখিয়ে দেওয়া পাঠ** উচ্চারণ করেন, তার ভাবার্থ নয়। আর কুরআনের বর্ণনা ঠিক এটিই: "**আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না; তা তো কেবল ওহি, যা পাঠানো হয়**"। আর মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর সর্বপ্রথম যা নাজিল হয়েছিল তা ছিল গ্রহণ করার সরাসরি আদেশ: "পড়ুন।" এরপর বাইবেলের পাঠটি শেষ হয় কঠিন এক সতর্কবাণীতে: "আর এমন হবে যে, আমার নামে সে যে কথা বলবে তা যে ব্যক্তি শুনবে না, আমি তার কাছে তার হিসাব নেব।" সুতরাং এটি কেবল সুসংবাদ নয়, বরং **অনুসরণের বাধ্যবাধকতা**।

যদি বলা হয়: 15 নম্বর আয়াতে তো আছে "তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদের মধ্য থেকে" — উত্তর এই যে, 18 নম্বর আয়াত পরোক্ষ সর্বনামে "**তাদের ভাইদের**"-এ সরে আসে; আর দ্বিতীয় বিবরণ নিজেই অন্য এক জাতিকে ভাই বলে: "**তোমাদের ভাই এষৌর সন্তানরা**" (2:4)। আর বনি ইসরাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য হলে ব্যতিক্রম যোগ করা হতো, যেমন বাদশাহর ব্যাপারে যোগ করা হয়েছে: "কোনো বিদেশি নয়, যে তোমার ভাই নয়" (17:15)।

102

দ্বিতীয় বিবরণ

আর তিনি ফারান পর্বত থেকে ঝলমল করে উঠলেন

প্রভু সিনাই থেকে এলেন, আর সাঈর থেকে তাদের ওপর উদিত হলেন; তিনি ফারান পর্বত থেকে ঝলমল করে উঠলেন, আর দশ হাজার পবিত্রজনের সঙ্গে এলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ — অধ্যায় 33, আয়াত 2

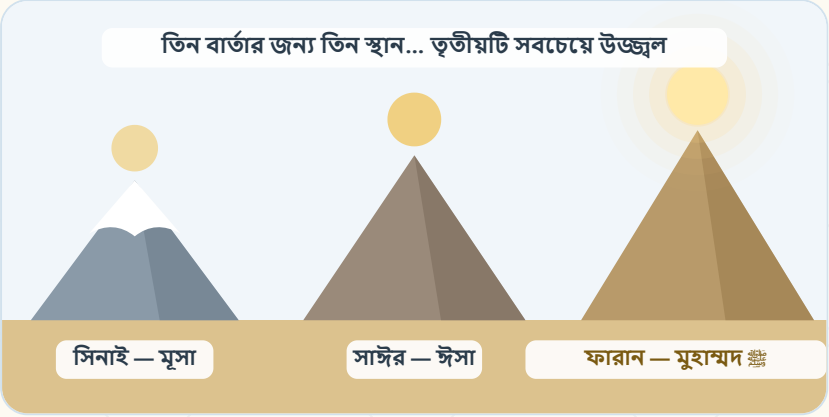

আলোর তিনটি স্তর: তিনি উদিত হলেন... তারপর ঝলমল করে উঠলেন

সহজ কথায়

তাওরাতের একটি পাঠ ক্রমানুসারে তিনটি পর্বতের নাম নেয়: **সিনাই**, যেখানে আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বলেছেন; তারপর **সাঈর** — ইদোমের পর্বতমালা, যার উদয়কে মসীহ আলাইহিস সালামের বার্তার ওপর ধরা হয় — তারপর **ফারান**। আর ফারান — স্বয়ং তাওরাতের পাঠ অনুসারে — সেই ভূমি যেখানে ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরেরা বসতি করেছিলেন: মক্কা ও তার চারপাশ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের গ্রন্থে এই পাঠ পড়ে আসছে। আর যে সমস্যার সমাধান তাদের কাছে আজও হয়নি: **তৃতীয় ঘটনাটি কী?** প্রভুর সিনাই থেকে আসা মানে তাওরাত, আর সাঈর থেকে তাঁর উদিত হওয়া মানে ইনজিল — তাহলে ফারান থেকে কী ঝলমল করে উঠল? ওই অঞ্চলে আগের দুটির সমকক্ষ কোনো ধর্মীয় ঘটনা ঘটেইনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ফারান স্বয়ং তাওরাতেই একটি নির্দিষ্ট স্থান। আদিপুস্তকে (21:21) ইসমাঈল সম্পর্কে এসেছে: "**আর তিনি ফারানের প্রান্তরে বসতি করলেন, আর তাঁর মা মিসর দেশ থেকে তাঁর জন্য একজন স্ত্রী নিলেন**।" সুতরাং তাদেরই পাঠ অনুসারে এটি ইসমাঈলের বংশধরদের আবাসভূমি। মুসলিম ভূগোলবিদগণ এবং বাইবেলের অভিধানগুলো ফারানের প্রান্তরকে উত্তর হিজাজ, সিনাই উপদ্বীপ ও এ দুইয়ের মধ্যবর্তী ভূমিতে নির্দেশ করে। আর ওই প্রান্তর থেকে বিশ্বজনীন বার্তাবাহী কোনো নবি বের হননি, একমাত্র মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

অর্থের জায়গাটি ক্রিয়াগুলোর ক্রমবৃদ্ধিতে, আর হিব্রুতে তা ইচ্ছাকৃত: "**এলেন**", তারপর "**উদিত হলেন**", তারপর "**ঝলমল করে উঠলেন**" — আর ঝলমল করে ওঠাই সবচেয়ে প্রবল ও সবচেয়ে দূর-বিস্তৃত আলো। পাঠটি তিনটি বার্তাকে ঊর্ধ্বক্রমে সাজায় আর শেষটিকেই সবচেয়ে উজ্জ্বল করে। এরপর যোগ করে: "**তাঁর ডান হাত থেকে তাদের জন্য এক অগ্নিময় বিধান বের হলো**" — অর্থাৎ এই শেষ আগমনের সঙ্গে **একটি শরিয়ত** আছে, কেবল উপদেশ নয়। আর মূসার পরে পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত — ইবাদত, লেনদেন ও বিচার সবকিছুর বিধান — নিয়ে আসা একমাত্র নবি মুহাম্মদ ﷺ।

হবক্কূক

103 পবিত্রজন ফারান পর্বত থেকে

আল্লাহ তাইমান থেকে এলেন, আর পবিত্রজন ফারান পর্বত থেকে। তাঁর মহিমা আকাশমণ্ডল ঢেকে দিল, আর পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পূর্ণ হলো।

হবক্কূক — অধ্যায় 3, আয়াত 3

ফারান পর্বত — তাওরাতের পাঠ অনুসারে ইসমাঈলের আবাসভূমি — নাম নিয়েছেন খ্রিষ্টপূর্ব যুগের এক হিব্রু নবি

সহজ কথায়

বনি ইসরাইলের একজন নবি বলছেন, পবিত্রজন আসবেন **ফারান পর্বত** থেকে — আর ফারান, স্বয়ং তাওরাতের পাঠ অনুসারে, সেই প্রান্তর যেখানে ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরেরা বসতি করেছিলেন। আর পাঠটি তার সঙ্গে জুড়ে দেয় ইদোমের প্রান্তে অবস্থিত **তাইমান**-কে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আহলে কিতাবের কাছে এই পাঠের ব্যাখ্যা কখনোই আয়ত্তে আসেনি। তাইমাও বনি ইসরাইলের ভূমির অংশ নয়, ফারানও নয়, আর তাদের ইতিহাসে এ দুই জায়গা থেকে কোনো নবি বেরই হননি। কেউ কেউ একে সিনাইয়ে আল্লাহর আগমনের কাব্যিক বর্ণনা হিসেবে পড়তে চেয়েছেন — কিন্তু এখানে সিনাইয়ের উল্লেখই নেই, অথচ ফারানের নাম ধরে উল্লেখ আছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

তাইমা আজ উত্তর-পশ্চিম সৌদি আরবের একটি প্রসিদ্ধ মরূদ্যান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নগরী, যা একসময় হিজাজ ও শামের মধ্যকার কাফেলা-পথের প্রধান বিরতিস্থল ছিল, আর যেখানে খ্রিষ্টপূর্ব যুগের ধ্বংসাবশেষ ও শিলালিপি রয়েছে। আর **ফারান** ইসমাঈলের সেই প্রান্তর, যেমনটি আদিপুস্তক বলেছে। সুতরাং পাঠটি ইদোম থেকে পুবে **ইসমাঈলের প্রান্তরের** দিকে সরে আসে — আর ওই প্রান্তর থেকে বিশ্বজনীন বার্তাবাহী কোনো নবি বের হননি, একমাত্র মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুটি বিষয় এই পাঠকে কাকতালীয়তার ঊর্ধ্বে তুলে দেয়। প্রথমত, এটি **ফারানের নাম নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবরণের পাঠের সঙ্গে মিলে যায়** — ভিন্ন দুই যুগের ভিন্ন দুই নবি একই স্থানের দিকে ইঙ্গিত করছেন। নিজেদের ভূমির বাইরের একটি জায়গার ওপর দুই স্বতন্ত্র সাক্ষীর মিলে যাওয়া প্রবল প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, পাঠের বাকি অংশ: "**আর পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পূর্ণ হলো**" — অর্থাৎ এই আগমনের প্রভাব **বিশ্বজনীন, স্থানীয় নয়**। আর ওই ভূমি থেকে এমন কিছু বের হয়নি যা পৃথিবীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে, একমাত্র ইসলাম ছাড়া — যার মাধ্যমে দিনের প্রতিটি ঘণ্টায় প্রতিটি মহাদেশে আজান ও তাসবিহ উচ্চারিত হয়।

যিশাইয়

104 কায়দারের জনপদ... আর সেলার অধিবাসীরা

প্রান্তর আর তার নগরগুলো নিজেদের কণ্ঠ তুলুক, সেই জনপদগুলো যেখানে কায়দার বাস করে; সেলার অধিবাসীরা গান গাক, তারা পর্বতশিখর থেকে জয়ধ্বনি করুক।

যিশাইয় — অধ্যায় 42, আয়াত 11

তাওরাতে "কায়দার" কে?

- কেদার ইসমাঈলের দ্বিতীয় পুত্র
- "আর এরা ইসমাঈলের পুত্রদের নাম... নবায়োত ও কায়দার"
- আদিপুস্তক 25:13
- আর কুরাইশ কায়দার ইবনে ইসমাঈলের বংশ

সুতরাং নতুন গান ওঠে আরবের জনপদ থেকে

আর সেলা: মদিনার কাছে এক জায়গা, আজও এই নামেই

যিশাইয় কায়দারের জনপদগুলোকে নতুন গান গাইতে আহ্বান করছেন

সহজ কথায়

যিশাইয় বলছেন: প্রান্তর নিজের কণ্ঠ তুলুক, **সেই জনপদগুলো যেখানে কায়দার বাস করে**। আর কায়দার — তাওরাতের পাঠ অনুসারে — ইসমাঈলের পুত্র, আর আদনানি আরবদের পূর্বপুরুষ, যাঁদের মধ্যে কুরাইশও আছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

যিশাইয়ের বিয়াল্লিশতম অধ্যায় এমন এক "বান্দা"-র কথা বলে যাঁকে আল্লাহ মনোনীত করেন, যিনি জাতিগুলোর কাছে ন্যায়বিচার নিয়ে আসেন, আর যিনি পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত ক্লান্তও হন না, ভেঙেও পড়েন না। আহলে কিতাব তাঁর পরিচয় নিয়ে মতভেদ করে এসেছে। কিন্তু পাঠটি নিজেই **স্থান** নির্দিষ্ট করে দেয়: কায়দারের জনপদ আর সেলা।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

"**কায়দার**"-এর নাম আদিপুস্তকে (25:13) ইসমাঈলের বারো ছেলের মধ্যে এসেছে। আর আদনানি আরবরা — যাঁদের মধ্যে কুরাইশ ও বনু হাশিম — তাঁরই বংশধর। আর উত্তর উপদ্বীপের অঞ্চলটিকে অ্যাসিরীয় শিলালিপিতে সত্যিই "কেদার" নামে ডাকা হয়েছে। আর "**সেলা**" (যা অনুবাদে "শৈল" করা হয়েছে) একটি পরিচিত স্থান: **সালা পর্বত**, যা মদিনার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, যার পাশে আহযাবের খন্দক খনন করা হয়েছিল, আর যা আজও সেই নামেই দাঁড়িয়ে আছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

অধ্যায়টি 1 নম্বর আয়াতে শুরু হয় "দেখো আমার বান্দা, যাঁকে আমি ধরে রেখেছি" দিয়ে — আর "বান্দা" সেই উপাধি যা কুরআনে মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে সঙ্গেই চলে: "পবিত্র তিনি, যিনি রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন **তাঁর বান্দাকে**", "আর যখন **আল্লাহর বান্দা** তাঁকে ডাকতে দাঁড়ালেন"। এরপর 10 নম্বর আয়াত বলে: "**প্রভুর উদ্দেশে নতুন গান গাও**" — অর্থাৎ নতুন এক শরিয়ত, পুরোনোর সংস্কার নয়। এরপর এই গানের মানুষদের চিহ্নিত করে: কায়দারের জনপদ আর সেলার অধিবাসীরা — **দুটিই নিখাদ আরব ভূখণ্ড**, একটি কুরাইশের বংশ আর অন্যটি মদিনার একটি পর্বত। একই পাঠে নবি ﷺ-এর বংশ, তাঁর হিজরতের শহর, তাঁর উপাধি "বান্দা", আর নতুন শরিয়তের আহ্বান — এতগুলোর একত্র হওয়া কাকতালীয়তার কোনো সুযোগ রাখে না।

যিশাইয়

105 গাধার আরোহী আর উটের আরোহী

তখন তিনি দেখলেন আরোহীদল — জোড়া অশ্বারোহী, গাধার আরোহীদল, উটের আরোহীদল; আর তিনি অতিশয় মনোযোগ দিয়ে কান পাতলেন।

যিশাইয় — অধ্যায় 21, আয়াত 7

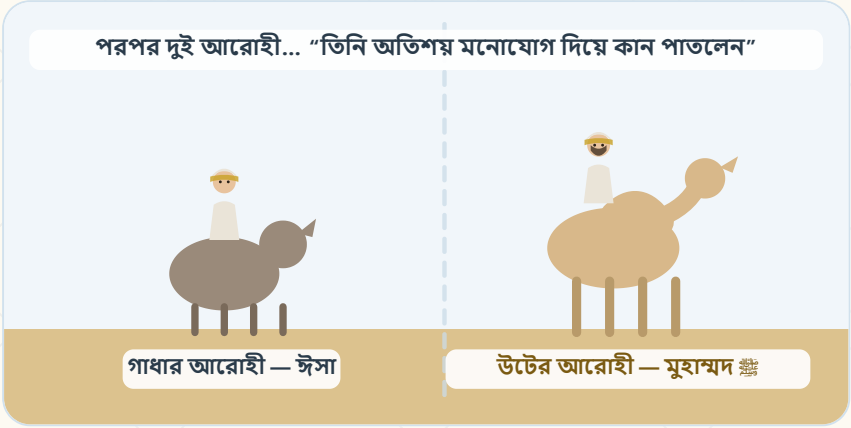

একটি পাঠ যা দুই নির্দিষ্ট আরোহীর নাম নেয় আর তাঁদের কথা শোনার আদেশ দেয়

সহজ কথায়

যিশাইয়ের পুস্তকের একটি দর্শন, যেখানে নবি **দুজন আরোহী** দেখেন: একজন গাধার ওপর আর অন্যজন উটের ওপর; আর তাঁকে আদেশ দেওয়া হয় যেন তিনি তাঁদের কথা গভীর মনোযোগে শোনেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আহলে কিতাবের কাছে এই পাঠের ব্যাখ্যা করা হয়েছে বাবিলের পতনের দর্শন হিসেবে। কিন্তু দৃশ্যটি নিজেই দৃষ্টি কাড়ে: দুজন স্বতন্ত্র আরোহী, যাঁদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাঁদের বাহন দিয়ে, আর নবিকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের কথা শুনতে — আর শোনা হয় কোনো বার্তার জন্য, যুদ্ধের সংবাদের জন্য নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

গাধার আরোহী সেই নিদর্শন, যা আহলে কিতাব মসীহ আলাইহিস সালামের জন্য চেনে। সখরিয় (9:9) বলে: "দেখো, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন... বিনম্র, আর গাধার ওপর আরোহী", আর সুসমাচারগুলো লিপিবদ্ধ করেছে যে মসীহ সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করেই গাধায় চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন। তাহলে প্রথমজন যদি মসীহ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাঁর পরে আসা **সেই উটের আরোহী** কে, যাঁর কথা শোনার আদেশ নবিকে ঠিক তেমনই দেওয়া হয়েছে যেমন প্রথমজনের কথা শোনার? উট আরবদের বাহন, আর মসীহের পরে উটওয়ালা কোনো জাতি থেকে কোনো নবি আসেননি, একমাত্র মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

শক্তিটা **জোড় বাঁধা আর ক্রমে**। উটের আরোহীর উল্লেখ একা আসেনি যে কেউ বলবে এটি কোনো কাফেলার সাধারণ উল্লেখ — তাঁকে গাধার আরোহীর সঙ্গে একই দৃশ্যে, আর ঠিক তাঁর পরেই জোড়া হয়েছে। আহলে কিতাব মেনে নিয়েছে যে "গাধার আরোহী" একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নবুয়তি নিদর্শন — তাহলে একই পাঠে তাঁর সঙ্গীটি নিরর্থক কোনো খুঁটিনাটি হতে পারে না। আর শোনার আদেশ — "**আর তিনি অতিশয় মনোযোগ দিয়ে কান পাতলেন**" — জানায় যে যা আসছে তা **শোনার আর মানার মতো কথা**, দেখার মতো দৃশ্য নয়। আর অধ্যায়ের বাকি অংশে আছে "**আরব দেশ সম্পর্কে ভারবাণী**", আর দেদান ও তাইমার নাম, আর "**কায়দারের মহিমা**" — পুরো প্রসঙ্গটিই আরব।

106

যিশাইয়

আমি লেখাপড়া জানি না

আর সেই পুস্তক এমন একজনকে দেওয়া হয় যে লেখাপড়া জানে না, আর বলা হয়: অনুগ্রহ করে এটি পড়ুন; আর সে বলে: আমি লেখাপড়া জানি না।

যিশাইয় — অধ্যায় 29, আয়াত 12

যিশাইয় 29:12		হেরা গুহা
"এটি পড়ুন"		"পড়ুন"
তখন সে বলে:	→	আর তিনি ﷺ বললেন:
"আমি লেখাপড়া জানি না"		"আমি পড়তে জানি না"
খ্রিস্টপূর্ব বহু শতাব্দী		610 খ্রিস্টাব্দ

সেই একই আদেশ... সেই একই জবাব

একটি দৃশ্য, যার বর্ণনা হয়েছে ঘটে যাওয়ার এক হাজার বছরেরও আগে

সহজ কথায়

যিশাইয়ের একটি পাঠ একটি দৃশ্যের বর্ণনা দেয়: একটি পুস্তক এমন এক ব্যক্তিকে দেওয়া হয় **যে পড়তে পারে না**, আর তাকে বলা হয়: "এটি পড়ুন।" সে উত্তর দেয়: "আমি লেখাপড়া জানি না।" আর ঠিক এটিই ঘটেছিল হেরা গুহায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এই পাঠ নবি ﷺ-এর জন্মের শত শত বছর আগে থেকেই আহলে কিতাবের গ্রন্থে ছিল, অথচ এর এমন কোনো বাস্তবায়ন ছিল না যার দিকে ইঙ্গিত করা যায়। তারা একে বনি ইসরাইলের নিজেদের কিতাব বোঝার ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রতীকী ইঙ্গিত হিসেবে পড়ত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হেরা গুহায়, 610 খ্রিষ্টাব্দে, জিবরাইল মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন: "**পড়ুন**।" তিনি বললেন: "**আমি তো পড়তে জানি না**।" তিনি তাঁকে চেপে ধরলেন, তারপর বললেন: "পড়ুন।" তিনি বললেন: "আমি তো পড়তে জানি না" — তিন বার। এরপর নাজিল হলো: "পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" ঘটনাটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণিত, আর সিরাতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলোর একটি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

মিলটি কেবল অর্থে নয়, বরং **গোটা দৃশ্যের গঠনে**: পড়ার আদেশ, অপারগতার উত্তর, আর তা-ও এমন একজনের কাছ থেকে যে পড়ে না। আর এর জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত লাগে: প্রতিশ্রুত নবি হবেন **নিরক্ষর, পড়েনও না লেখেনও না**। আর এটিই সেই গুণ, যা কুরআন মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলে আর যাকেই দলিল বানায়: "**আর আপনি এর আগে কোনো কিতাব পাঠ করেননি আর নিজ ডান হাতে তা লেখেননি; তা হলে মিথ্যাচারীরা সন্দেহের সুযোগ পেত**।" লক্ষ করুন, এখানে নিরক্ষরতা কোনো ঘাটতি নয়, বরং **প্রমাণ**: তিনি যদি পড়ুয়া-লিখিয়ে হতেন, তবে বলা হতো তিনি নকল করেছেন আর টুকেছেন। আর যিশাইয়ের পাঠ সেই অপারগতাকেই নিদর্শন বানায়, ত্রুটি নয়।

পরমগীত

107 আর তিনি সর্বাংশে মাহামাদ্দিম

হিক্কো মামতাক্কিম ওয়া-কুল্লো মাহামাদ্দিম; জেহ দোদি ওয়া-জেহ রেঈ, বনোত ইয়েরুশালায়িম।

পরমগীত — অধ্যায় 5, আয়াত 16 (হিব্রু পাঠ)

মূল হিব্রু পাঠ

מַחֲמַדִּים

উচ্চারণ: মাহামাদ্দিম

আর অনুবাদে করা হলো: "সর্বাংশে মনোহর"

নাম মূল পাঠে আছে... অনুবাদে উধাও

হিব্রু শব্দটি ঠিক যেমন আজকের প্রামাণ্য সংস্করণগুলোতে দাঁড়িয়ে আছে

সহজ কথায়

পরমগীতের হিব্রু পাঠে **"মাহামাদ্দিম"** শব্দটি আসে — আর এর হিব্রু ধাতু ח־מ־ד সেই একই ধাতু যা আরবি হ-ম-দ, যা থেকে "মুহাম্মদ" ও "আহমদ" গঠিত। অনুবাদে একে করা হয় "সর্বাংশে মনোহর", আর এভাবেই ধাতুটি গলে যায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পরমগীত কাব্যিক চিত্রকল্পে একজন প্রিয়তমের বর্ণনা দেয়, আর তাঁর বর্ণনা শেষ হয় এই শব্দেই: "তাঁর মুখ অতি মধুর, **আর তিনি সর্বাংশে মাহামাদ্দিম**।" এই পাঠকে আল্লাহ ও তাঁর জাতির সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে বোঝা হয়েছে, কিংবা নিছক প্রেমের কবিতা হিসেবে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হিব্রুতে প্রত্যয় **"-ইম"** বহুবচনেরও, আবার মহিমারও — যেমন "এলোহিম", আল্লাহর নাম বহুবচনে অথচ উদ্দেশ্য একজন। আর এই শব্দের হিব্রু ধাতু ח־מ־ד (হ-ম-দ) সেই একই ধাতু যা আরবি হ-ম-দ। আর এখানে "-ইম" প্রামাণ্য বিশ্লেষণে সাধারণ বহুবচন, যেমন একই আয়াতের "মামতাক্কিম"। **আর একটি সীমায় থামুন:** একে "মুহাম্মদ"-এর নাম ধরে পড়া একটি অনুমিত সিদ্ধান্ত, ব্যাকরণের বিধান নয়। আর প্রতিষ্ঠিত এটুকুই যে ধাতুটি আজও হিব্রুতে টিকে আছে, আর অনুবাদগুলো তাকে গলিয়ে দেয়, যাতে পাঠক তা দেখতেই না পান।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দলিলের জোর এখানেই যে ধাতুটি **মূলে টিকে আছে, মুছে ফেলা হয়নি** — সে কেবল অনুবাদে গলে গেছে। আর এমনটা প্রায়ই ঘটে: যেসব ব্যক্তিনাম নিজ ভাষায় অর্থ বহন করে, সেগুলো অনুবাদ হয়ে যায় আর নামটি হারিয়ে যায়। কোনো আরবি পাঠে যদি "আবদুল্লাহ" নামটি থাকত, তার অনুবাদ হতো "আল্লাহর বান্দা" আর ব্যক্তিটি উধাও হয়ে যেত। কুরআন জানিয়েছে যে তাঁর নাম ﷺ তাদের কাছে লিখিত আছে: "**যারা অনুসরণ করে সেই রাসুলের, সেই নিরক্ষর নবির, যাঁকে তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইনজিলে লিখিত পায়**", আর এ-ও যে ঈসা সুসংবাদ দিয়েছেন "**আমার পরে আগমনকারী এক রাসুলের, যাঁর নাম আহমদ**"। এ হলো কুরআনের দাবি, আর এই হিব্রু শব্দটি **এমন এক সাক্ষী যা তাকে কাছে নিয়ে আসে** — একা ফয়সালা করে দেওয়া প্রমাণ নয়।

সূত্র *Biblia Hebraica* – Song of Songs 5:16 · Strong's Hebrew 4261 – *maḥmad*

মথির সুসমাচার

108 তা তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে অন্য এক জাতিকে দেওয়া হবে

> এজন্য আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহর রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, আর এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে যে তার ফল উৎপন্ন করবে।
>
> **মথির সুসমাচার — অধ্যায় 21, আয়াত 43**

পাঠটি এক জাতির কথা বলছে, বনি ইসরাইলের কোনো দলের নয়

বনি ইসরাইল		অন্য এক জাতি
নবুয়ত তাদের মধ্যে	→	"যে তার ফল দেবে"
পরপর বহু শতাব্দী		তাদের বংশ থেকে নয়
"তোমাদের থেকে নেওয়া হবে"		"আর এক জাতিকে দেওয়া হবে"

রাজমিস্ত্রিরা যে পাথর বাতিল করল, তা-ই কোণের প্রধান পাথর

নবুয়তের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় সরে যাওয়া — স্বয়ং ইনজিলের পাঠ অনুসারে

সহজ কথায়

মসীহ আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে বললেন যে **আল্লাহর রাজ্য তাদের কাছ থেকে নিয়ে অন্য এক জাতিকে দেওয়া হবে**, যে তা-ই করবে যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে। অর্থাৎ নবুয়ত বনি ইসরাইল থেকে বেরিয়ে অন্যদের কাছে চলে যাবে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

নবুয়ত বনি ইসরাইলের মধ্যে — তারা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর — শত শত বছর ধরে অবিচ্ছিন্ন ছিল: ইউসুফ, মূসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান, যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল ও অন্যরা। তারা বিশ্বাস করত, নবুয়ত তাদের বংশে সুরক্ষিত এমন এক অধিকার যা কখনো তাদের ছেড়ে যাবে না। এ কারণেই তারা অস্বীকার করেছিল যে আরবদের মধ্য থেকে কোনো নবি প্রেরিত হবেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মুহাম্মদ ﷺ প্রেরিত হয়েছেন **ইসমাঈলের বংশ** থেকে — অর্থাৎ ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের অন্য শাখা থেকে। ফলে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নবুয়ত ইসহাকের বংশ থেকে ইসমাঈলের বংশে সরে গেল। আর তাঁর হাতে এমন এক নতুন জাতি দাঁড়াল যা আগে ছিলই না, আর যা পৃথিবীর সব মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। আর কুরআন ঠিক এই জায়গাটিতেই জন্ম নেওয়া হিংসার দিকে ইঙ্গিত করেছে: "**নাকি তারা মানুষকে হিংসা করে সেই অনুগ্রহের জন্য যা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন?**"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"জাতি" শব্দটিই নির্ণায়ক। তিনি বলেননি "তোমাদের মধ্যকার কোনো দলকে দেওয়া হবে", বলেননি "কোনো নেক অবশিষ্টাংশকে" — তিনি বলেছেন "**এক জাতিকে**", আর গ্রিকে (এথনোস) এর অর্থ **অন্য এক জনগোষ্ঠী**। এই পাঠের আগে আছে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উপমা, যার শ্রমিকেরা তাদের কাছে পাঠানো বার্তাবাহকদের হত্যা করল, তারপর পুত্রকেও হত্যা করল — ফলে তারা এরই যোগ্য হলো যে তা তাদের কাছ থেকে কেড়ে অন্যদের হাতে দেওয়া হবে। আর ঠিক তার আগেই আসে: "**যে পাথরটি রাজমিস্ত্রিরা বাতিল করেছিল, সেটিই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠেছে**" (আয়াত 42), তারপর কারণবাচক শব্দ দিয়ে তারই ওপর রায়টি শাখা মেলে: "এজন্য আমি তোমাদের বলছি..." (আয়াত 43) — অর্থাৎ বাতিল করা শাখাটির ওপরই দাঁড়াবে ইমারত। আর ইসমাঈলের বংশ নবুয়তের প্রতিটি তালিকায় বাদ পড়ে যাওয়া সেই শাখা — যতক্ষণ না সেখান থেকেই এলেন শেষ নবি।

আদিপুস্তক

109 বারোজন সর্দার... আর এক মহাজাতি

আর ইসমাঈলের বিষয়ে, আমি তোমার কথা শুনলাম: দেখো, আমি তাকে বরকত দিয়েছি, আর তাকে ফলবান করব, আর তাকে অতিশয় বৃদ্ধি করব; তার থেকে বারোজন সর্দার জন্মাবে, আর আমি তাকে এক মহাজাতি করব।

আদিপুস্তক — অধ্যায় 17, আয়াত 20

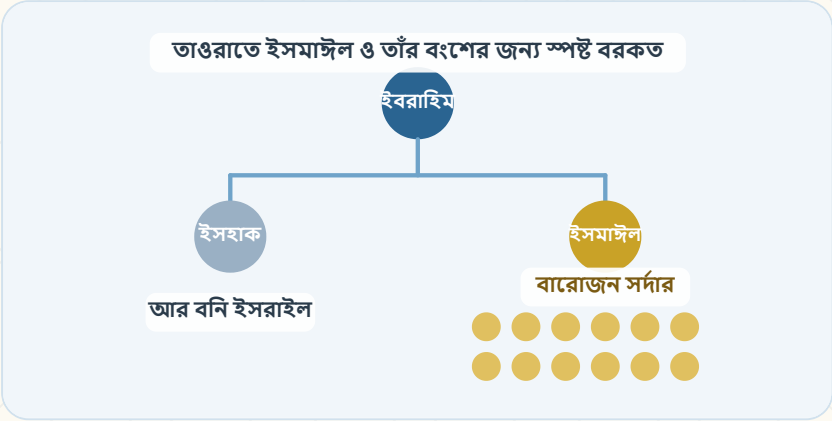

একটি পাঠ যা ইসমাঈলের জন্য বরকত, বংশ আর এক মহাজাতির স্বীকৃতি দেয়

সহজ কথায়

স্বয়ং তাওরাত উল্লেখ করে যে আল্লাহ **ইসমাঈল**-কে বরকত দিয়েছেন, আর ওয়াদা করেছেন যে তাঁর ঔরস থেকে **বারোজন সর্দার** বের হবেন, আর তিনি তাঁকে **এক মহাজাতি** করবেন। সুতরাং বরকত কেবল ইসহাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বনি ইসরাইলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল যে গোটা প্রতিশ্রুতি ইসহাক ও তাঁর বংশেই, আর ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরেরা অঙ্গীকারের বাইরে। এরই ভিত্তিতে আরবদের দিক থেকে আসা যেকোনো ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যাখ্যান করা হতো। কিন্তু পাঠটি ইসমাঈলের জন্য স্বতন্ত্র এক বরকতের স্বীকৃতিতে স্পষ্ট।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ইসমাঈলের বারো ছেলের নাম আদিপুস্তকে (25:13-16) এসেছে, আর তালিকাটি শেষ হয় এই কথায়: "**নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বারোজন সর্দার**" — আর এরাই উত্তর আরবের সুপরিচিত গোত্রগুলো, যাদের কয়েকটির নাম অ্যাসিরীয় শিলালিপিতে এসেছে। আর **এক মহাজাতি**-র ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে ইসলামে: এমন এক জাতি যা ইসমাঈলের বংশ থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর পুব ও পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই পাঠ সেই মূল যুক্তিটিকেই ভেঙে দেয়, যা দিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত প্রত্যাখ্যান করা হতো। স্বয়ং তাওরাত যদি ইসমাঈলের জন্য **বরকত**, **বিশাল বংশ** ও **এক মহাজাতি** স্বীকার করে, তবে তাঁর শাখাকে নবুয়ত থেকে বাদ দেওয়ার কোনো ভিত্তিই থাকে না। আর ওয়াদার ক্রমটি লক্ষ করুন: বরকত, তারপর ফলবান হওয়া ও বৃদ্ধি, তারপর বারোজন সর্দারে নেতৃত্ব, তারপর **"এক মহাজাতি"** — সেই লক্ষ্য, যা দিয়ে এটি শেষ হয়। আর আদিপুস্তক (21:21) জানায় যে ইসমাঈল বসতি করেছিলেন **ফারানের প্রান্তরে** — ঠিক সেই জায়গা, যেখান থেকে দ্বিতীয় বিবরণের পাঠে আলো "ঝলমল করে উঠেছিল"। পাঠগুলো একে অন্যকে সত্যায়ন করে আর একই দিকে ইঙ্গিত করে।

একটি তুলনা

110 মূসার মতো — যে তুলনা ফয়সালা করে দেয়

আর ইসরাইলে মূসার মতো আর কোনো নবী উত্থিত হননি, যাঁকে সদাপ্রভু মুখোমুখি হয়ে জানতেন

দ্বিতীয় বিবরণ — অধ্যায় 34, পদ 10

বৈশিষ্ট্য	মূসা	মুহাম্মদ ﷺ
স্বাভাবিক জন্ম	✔	✔
বাবা ও মা	✔	✔
স্ত্রী ও সন্তান	✔	✔
পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত	✔	✔
নেতা ও যোদ্ধা	✔	✔
নিজ শহর থেকে হিজরত	✔	✔

"তোমার মতো" — তাওরাত অস্বীকার করে যে তিনি বনি ইসরাইলের

সাতটি গুণ, যা দুজনে মেলে, তৃতীয় কারও মধ্যে নয়

সহজ কথায়

তাওরাত **মূসার মতো** একজন নবীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আর মিলিয়ে দেখলে সেই গুণগুলো একত্র পাওয়া যায় মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যে, অন্য কোনো নবীর মধ্যে নয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আহলে কিতাব "মূসার মতো সেই নবী"-র অপেক্ষায় থেকেছে, অথচ তাঁর পরিচয়ে কখনো একমত হতে পারেনি। এ পদের জন্য বনী ইসরাইলের যে নবীর নামই পেশ করা হোক, তাঁর ক্ষেত্রে এক বা একাধিক শর্ত অপূর্ণ থেকে যায়: নতুন কোনো শরিয়ত নেই, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব নেই, যুদ্ধও নেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মূসা ও মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যে মিলের দিকগুলোর অন্তর্ভুক্ত: মা-বাবার ঘরে স্বাভাবিক জন্ম, বিবাহিত জীবন ও সন্তান, **একটি পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত** যা ইবাদত, লেনদেন, বিচার ও দণ্ডবিধি পরিচালনা করে, একটি উম্মতের নেতৃত্ব, জিহাদ ও শাসন, নির্যাতনের দেশ থেকে প্রতিষ্ঠার দেশে **হিজরত**, নিজের জীবদ্দশাতেই শত্রুদের উপর বিজয়, এবং স্বাভাবিক মৃত্যু ও মাটিতে দাফন। মূসার পরে আর কোনো নবীর মধ্যে এ সবগুলো একত্র হয়নি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

তাওরাত নিজেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে: "**আর ইসরাইলে মূসার মতো আর কোনো নবী উত্থিত হননি**।" এটি স্পষ্ট সাক্ষ্য যে প্রতিশ্রুত সেই নবী **বনী ইসরাইলের কেউ নন** — নইলে বাক্যটি নিজেই নিজের বিরোধী হয়ে যেত। আর এর সঙ্গে যখন অধ্যায় 18-এর 18 নম্বর পদের কথাটি মেলানো হয় — "তাদের **ভাইদের** মধ্য থেকে" — তখন সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে: তাদের চাচাতো ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবী, অর্থাৎ ইসমাইলের বংশ থেকে। ইহুদিরা প্রাচীন কালে এটি বুঝত; সে কারণেই কুরআনে এসেছে: "**আর তারা আগে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত, অতঃপর তারা যা চিনত তা যখন তাদের কাছে এল, তখন তারা তা অস্বীকার করল**" — অর্থাৎ তারা তাঁর অপেক্ষায় থাকত ও তাঁর সুসংবাদ দিত, যতক্ষণ না তিনি তাদের নিজেদের বংশের বাইরে থেকে এলেন।

অধ্যায়ের সারকথা

111 তারা তাঁকে নিজেদের কাছে লিখিত পায়

যারা অনুসরণ করে সেই রাসুলের, উম্মি নবীর, যাঁকে তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইনজিলে লিখিত পায়

সূরা আল-আরাফ — আয়াত 157

যে পাঠ বিরোধীদের কিতাবেই পাঠায় আর মিথ্যা প্রমাণের চ্যালেঞ্জ দেয়

কুরআন আহলে কিতাবের নিজেদের হাতে থাকা কিতাবকেই সাক্ষী মানে, কেবল নিজেকে নয়

সহজ কথায়

কুরআন স্পষ্ট করেই বলছে, নবী ﷺ-এর পরিচয় **তাওরাত ও ইনজিলে লেখা আছে** — সেই কিতাবেই, যা আহলে কিতাবের হাতে রয়েছে। এটি তাদের প্রতি খোলা চ্যালেঞ্জ: তারা নিজেদের কিতাব খুলে দেখুক।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মদিনা, নাজরান ও ইয়েমেনের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে তাদের কিতাব ছিল এবং তারা তা পড়তও; তাদের মধ্যে এমন আলেমও ছিলেন, যাঁরা এসব শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। কাজেই নবী ﷺ-এর পরিচয় তাদের কিতাবে আছে — এ দাবির কোনো ভিত্তি না থাকলে **সেদিনই তা মিথ্যা প্রমাণ করা যেত**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

এইমাত্র যেসব শাস্ত্রবচন গেল — দ্বিতীয় বিবরণ 18 ও 33, হবক্কূক 3, যিশাইয় 21, 29 ও 42, পরমগীত 5, যোহন 14 ও 16, মথি 21, এবং আদিপুস্তক 17 ও 21 — **সবগুলোই আজকের প্রামাণ্য সংস্করণে বিদ্যমান**, যে কোনো পাঠক কিতাব খুলে সেগুলো পড়তে পারেন। আর আয়াতটি এ দাবি করেনি যে প্রতিটি জায়গায় নামটি স্পষ্ট উল্লেখ আছে; বরং বলেছে "**তারা তাঁকে পায়**" — অর্থাৎ তারা তাঁর পরিচয় ও নিদর্শনগুলো পায় এবং তা দিয়েই তাঁকে চিনে নেয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে শক্তিটা ভিন্ন ধরনের। কুরআন নিজের থেকে প্রমাণ আনছে না, বরং **প্রতিপক্ষের নিজের কিতাবের দিকেই ইঙ্গিত করছে**। এটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ধরনের যুক্তি এবং মিথ্যা প্রমাণ করা সবচেয়ে সহজ — তাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল যে নিজেদের কিতাব খুলে দেখিয়ে দিত, সেখানে কিছুই নেই। তবু তাদের যেসব আলেম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ঠিক এ কারণেই করেছেন — যেমন মদিনার ইহুদিদের পণ্ডিত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম। এরপর কুরআন সাহসে আরও এক ধাপ এগিয়েছে: "**তারা তাঁকে তেমনই চেনে, যেমন নিজেদের সন্তানদের চেনে**" — এমন তুলনা কেবল সে-ই করতে পারে, যে পুরোপুরি নিশ্চিত। আর চৌদ্দ শতাব্দী ধরে এসব বচন তাদের কিতাবে টিকে থাকা, যা গবেষকরা পড়ছেন ও আলোচনা করছেন, নিজেই আজ পর্যন্ত সেই চ্যালেঞ্জের চলমান থাকা।

চতুর্থ পর্ব

নবি ﷺ-এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুজিজাসমূহ

তাঁর সাহাবিগণ নিজেদের চোখে যা দেখেছেন এবং অবিচ্ছিন্ন সনদে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন: আঙুলের ফাঁক থেকে উৎসারিত পানি, তাঁর জন্য কেঁদে ওঠা খেজুরগাছের কাণ্ড, আর মক্কার আকাশে দ্বিখণ্ডিত চাঁদ।

16 প্রমাণ

112

আকাশে এক নিদর্শন

মক্কার আকাশে চাঁদ ফেটে গেল

কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, আর চাঁদ ফেটে গেছে। আর তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে: এ তো চলতি জাদু।

সূরা আল-কামার — আয়াত 1-2

এমন এক ঘটনা, যা মক্কার সবাই দেখেছিল — মুমিন আর অস্বীকারকারী উভয়েই

সহজ কথায়

আকাশে চাঁদ দুই টুকরো হয়ে গেল, এমনকি মানুষ দুই টুকরোর মাঝখানে হেরা পাহাড় দেখতে পেল। আর মুশরিকরা এ কথা অস্বীকার করেনি যে তারা দেখেছে — তারা বলেছিল: **"মুহাম্মদ আমাদের জাদু করেছে।"**

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কুরাইশ নবী ﷺ-এর কাছে তাঁর সত্যতা প্রমাণের জন্য চোখে দেখা যায় এমন একটি নিদর্শন দাবি করে আসছিল। যখন তা এল, তারা বলল না "আমরা কিছুই দেখিনি" — যা ছিল সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে নিরাপদ উত্তর — বরং যা দেখেছে তার ব্যাখ্যা দিল জাদু বলে। **আর এটিই নিজে প্রমাণ করে যে তারা তা চোখে দেখেছিল।**

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আয়াতটি নাজিল হয়েছে **সম্পন্ন অতীত কালে**: "চাঁদ ফেটে গেছে" — "ফাটবে" নয়। চাঁদ ফাটার হাদিস **সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে** একাধিক সনদে বেশ কয়েকজন সাহাবি থেকে বর্ণিত: ইবনে মাসউদ, আনাস, ইবনে আব্বাস, আর মুসলিমে ইবনে উমর। জুবাইর ইবনে মুতইমের হাদিসটি আহমাদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন, আর হাকিম তা শাইখাইনের শর্তে সহিহ বলেছেন। ইবনে মাসউদের হাদিসে তাঁরা যা দেখেছিলেন তার বর্ণনা আছে: "এমনকি তারা চাঁদের দুই টুকরোর মাঝখানে পাহাড়টি দেখতে পেল"। হাদিসবিদদের মতে এই সংবাদ তাওয়াতুরের স্তরে পৌঁছে গেছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

প্রমাণ এখানে কেবল ঘটনার মধ্যে নয়, বরং **বিরোধীদের প্রতিক্রিয়ায়**। আয়াতটি তাদেরই সামনে মক্কায় পড়ে শোনানো হয়েছে, তারা তখনো জীবিত; আর তাতে বলা হয়েছে, চাঁদ তাদের চোখের সামনেই ফেটেছে। যদি তা না ঘটত, তবে তাদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ কাজ ছিল বলা: "কখন? আমরা তো কিছুই দেখিনি।" অথচ তারাই ছিল তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব, আর তাঁর বিরুদ্ধে কবিতা, জাদু ও পাগলামির অভিযোগ আনতে তারা এতটুকু দ্বিধা করেনি। তবু তারা **অস্বীকার নয়, ব্যাখ্যা বেছে নিল** — আর এটিই সম্ভাব্য সবচেয়ে জোরালো সাক্ষ্য। আয়াতটি নিজেই তাদের জবাব লিখে রেখেছে: "**আর তারা বলে: এ তো চলতি জাদু**" — যুক্তি আর তার জবাব, দুটোই একসঙ্গে নথিভুক্ত।

113

তাঁর হাত থেকে পানি

তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফুটে ওঠা পানি

তিনি সেই পাত্রে নিজের হাত রাখলেন, আর পানি তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরনার মতো ফুটে উঠতে লাগল; আমরা পান করলাম আর অজু করলাম। আনাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন: প্রায় তিনশ।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

পাত্র থেকে নয়... ফুটেছে আঙুলের ফাঁক থেকে

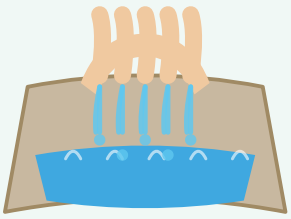

প্রায় তিনশ লোক এক পাত্র থেকে পান করল ও অজু করল

এমন এক দৃশ্য, যা আনাস ইবনে মালিক, জাবির, ইবনে মাসউদসহ অনেকে বর্ণনা করেছেন

সহজ কথায়

পানি ফুরিয়ে গিয়েছিল, মানুষ তৃষ্ণার্ত। নবী ﷺ একটি ছোট পাত্রে হাত রাখলেন, **আর তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরনার মতো পানি ফুটে বেরোতে লাগল** — এমনকি গোটা বাহিনী পান করল আর অজু করল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সেই জায়গায় না ছিল কোনো কূপ, না কোনো বৃষ্টি। মরুভূমিতে পানি জীবন-মরণের প্রশ্ন। শত শত মানুষের একই সময়ে পানি দরকার। আর ছোট একটি পাত্র তো একজন মানুষের অজু আর পানের জন্যও যথেষ্ট হতো না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঘটনাটি **উভয় সহিহ গ্রন্থে** আনাস ইবনে মালিক, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদসহ অনেকের সূত্রে বর্ণিত, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় — হুদাইবিয়ায়, তাবুকে ও অন্যত্র। এটি একাধিকবার ঘটেছে, আর হাজার হাজার মানুষ তার সাক্ষী। ইবনে মাসউদ বলেন: "আমরা নিদর্শনগুলোকে বরকত গণ্য করতাম, আর আপনারা সেগুলোকে ভয়ের বিষয় গণ্য করেন। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম, পানি কমে গেল; তিনি বললেন: অবশিষ্ট কিছু পানি খুঁজে দেখো..."

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

পার্থক্য গড়ে দেওয়া বিবরণটি হলো ফোয়ারার জায়গা: **"তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে"**, পাত্র থেকে নয়। কেউ যদি একটি সংবাদ বানাতে চাইত, তবে কাছের কথা হতো এই বলা যে পাত্রটি ভরে গেল — তা অনেক সহজ। কিন্তু মানুষের হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানি ফুটে ওঠা এমন এক অদ্ভুত ও সূক্ষ্ম বর্ণনা, যা চোখে না দেখে বলাই যায় না। আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ **সাক্ষীর সংখ্যা**: আনাসের বর্ণনায় "প্রায় তিনশ", আর হুদাইবিয়ার দিনে জাবিরের বর্ণনায় এক হাজার চারশ। এত মানুষের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া, তারপর বর্ণিত ও লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়া একটি সংবাদ, যাদের একজনও তা অস্বীকার করেননি — তা তাঁদের পরে বানানো হয়েছে, এমন হতেই পারে না।

114

খাবারে বরকত

এক সা' যব, যা হাজার মানুষকে পেট ভরে খাওয়াল

আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলাম ... তিনি বললেন: খন্দকের লোকদের ডাকো। আর তারা ছিল এক হাজার ... তিনি আল্লাহর কসম করে বললেন, তারা খেয়েছে, এমনকি তা রেখেই ফিরে গেছে, আর আমাদের হাঁড়ি তখনো তেমনই টগবগ করে ফুটছিল।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

খন্দকের দিন — যখন মানুষ ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে রাখত

সহজ কথায়

জাবির নবী ﷺ-কে সামান্য খাবারের দাওয়াত দিলেন, যা কয়েকজনের জন্যই কেবল যথেষ্ট ছিল; আর নবী ﷺ ডেকে আনলেন খন্দক খননরত এক হাজার মানুষকে। **সবাই পেট ভরে খেল, আর হাঁড়ি তখনো কানায় কানায় ভরা।**

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এ ছিল অবরোধের সবচেয়ে কঠিন দিনগুলোর কথা। মুসলিমরা ক্ষুধার্ত, এমনকি নবী ﷺ নিজেই ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। খাবার ছিল এক সা' যব আর একটি ছোট বকরির বাচ্চা — এক ঘরের জন্যই কেবল যথেষ্ট। আর জাবির নিজের কাজের জন্য স্ত্রীর কাছে গোপনে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পূর্ণ হাদিসটি **সহিহ বুখারিতে** আছে; জাবির ইবনে আবদুল্লাহ নিজের ও নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন, ঘরোয়া সূক্ষ্ম বিবরণসহ: স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, লজ্জায় পড়ার ভয়, হাঁড়ি আগুন থেকে না নামানোর ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিষেধ, আর তা থেকে তুলে তুলে বণ্টনের নির্দেশ — ঢাকনা না খোলারও নির্দেশ। শেষে জাবির কসম করে বলেন: "তিনি আল্লাহর কসম করে বললেন, তারা খেয়েছে, এমনকি তা রেখেই ফিরে গেছে, **আর আমাদের হাঁড়ি তখনো তেমনই টগবগ করে ফুটছিল**" — অর্থাৎ তখনো ভরা অবস্থায় ফুটছিল।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এমন ঘটনা বানানো যায় না, কারণ তা ঘটেছে এক জায়গায়, এক সময়ে, **এক হাজার সাক্ষীর** সামনে। এটি মিথ্যা হলে বাহিনীর শত শত মানুষ তা অস্বীকার করত, আর তাদের মধ্যে ওত পেতে থাকা মুনাফিকরাও ছিল। তার চেয়েও সূক্ষ্ম কথা: বর্ণনাকারী নিজেই **নিজের অস্বস্তির** কথা বলছেন, খাবার কম পড়ার ভয়ের কথা বলছেন — নিজের বড়ত্ব প্রচার করতে চাওয়া কোনো রচয়িতা এমন বিবরণ কখনোই জুড়ত না। আর সহিহ গ্রন্থগুলোতে এর অনুরূপ ঘটনা বহু: তাবুকের খাবার, ইবনুল জাররাহর খেজুর, আর জাবিরের পিতার সেই ঋণ, যা এমন খেজুর দিয়ে শোধ হয়েছিল যা তার দশ ভাগের এক ভাগও ঢাকত না।

115

জড়বস্তুর কান্না

যে খেজুরকাণ্ড তাঁর জন্য কেঁদে উঠেছিল

মসজিদের ছাদ ছিল খেজুরগাছের কাণ্ডের ওপর, আর নবী ﷺ যখন খুতবা দিতেন তখন সেগুলোরই একটি কাণ্ডের পাশে দাঁড়াতেন। যখন তাঁর জন্য মিম্বার তৈরি করা হলো ... তখন আমরা সেই কাণ্ড থেকে গর্ভবতী উটনীর কাতরানোর মতো একটি আওয়াজ শুনলাম, যতক্ষণ না নবী ﷺ এসে তার ওপর নিজের হাত রাখলেন, আর তা শান্ত হয়ে গেল।

বুখারি বর্ণনা করেছেন — সহিহ

একটি খেজুরকাণ্ড, যা দশম মাসের গর্ভবতী উটনীর মতো কাতরেছিল

সহজ কথায়

নবী ﷺ একটি খেজুরকাণ্ডে ঠেস দিয়ে খুতবা দিতেন। যখন তাঁর জন্য মিম্বার বানানো হলো, **কাণ্ডটি কেঁদে উঠল আর কাতরাল** — এমনকি মসজিদের প্রত্যেকেই তা শুনল; তখন তিনি ﷺ নেমে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আর তা শান্ত হলো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কাণ্ড তো শুকনো এক টুকরো কাঠ, তাতে কোনো অনুভূতি নেই। তার ভেতর থেকে দশম মাসের গর্ভবতী উটনীর মতো শোনা যায় এমন আওয়াজ বেরোনোর কোনো তুলনাই নেই। আর সেদিন মসজিদ ছিল মানুষে ভরা, আর দিনটি ছিল জুমার।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **সহিহ বুখারিতে** ও অন্যত্র আছে, আর বহু সনদে অনেক সাহাবি থেকে বর্ণিত: জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আনাস ইবনে মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, উবাই ইবনে কাব, সাহল ইবনে সাদ, বুরাইদা ও অন্যরা — এমনকি আলেমগণ একে **মুতাওয়াতির** বর্ণনার মধ্যে গণ্য করেছেন। হাসান বসরি এটি বর্ণনা করার সময় বলতেন: "হে মুসলিমগণ! এক টুকরো কাঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ভালোবাসায় কাতর হয়; আপনারা তো তাঁর জন্য কাতর হওয়ার অধিক হকদার।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

যুক্তির জোর এখানে এই যে, ঘটনাটি ঘটেছে **মদিনার মসজিদে জুমার দিনে** — অর্থাৎ শহরের সবচেয়ে বড় সাপ্তাহিক সমাবেশের সামনে, কোনো নির্জনে নয়, গুটিকয় মানুষের সামনেও নয়। বহু সাহাবি এটি বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেকে নিজের ভাষায়; আর আওয়াজটির বর্ণনা তাঁরা প্রায় একই রকম শব্দে দিয়েছেন — "গর্ভবতী উটনীর কাতরানোর মতো"। আর শেষ বিবরণটিই সংবাদটিকে কল্পনার ঊর্ধ্বে তুলে দেয়: **তিনি হাত রাখতেই তা শান্ত হয়ে গেল**; এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন: "আমি যদি তাকে জড়িয়ে না ধরতাম, তবে সে কিয়ামত পর্যন্ত কাতর হতেই থাকত।" এমন এক সংবাদ, যার সাক্ষী গোটা একটি মসজিদ, তারপর যা বর্ণনা করেছেন কয়েক ডজন সাহাবি, আর উপস্থিতদের কেউই তা অস্বীকার করেননি।

ইসরা ও মিরাজ

116 তিনি বাইতুল মাকদিসের বর্ণনা দিলেন, অথচ কখনো তা দেখেননি

পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশে আমরা বরকত রেখেছি।

সূরা আল-ইসরা — আয়াত 1

তিনি সকালে কুরাইশকে জানালেন, আর তারা মসজিদটির দরজা ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করল

সহজ কথায়

নবী ﷺ-কে রাতের বেলায় মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি কুরাইশকে জানালে তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল **আর তাঁর কাছে মসজিদটির বর্ণনা চাইল** — অথচ তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা তা দেখেছিল। তিনি তাদের বর্ণনা দিলেন, শেষে তারা বলল: "বর্ণনার কথা বলতে গেলে, তা তিনি ঠিকই বলেছেন।"

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মক্কা আর বাইতুল মাকদিসের দূরত্ব প্রায় 1,200 কিলোমিটার; কাফেলা এক দিকে যেতে এক মাস নেয়, ফিরতেও তেমনই। আর নবী ﷺ **জীবনে কখনো বাইতুল মাকদিস দেখেননি**। অথচ মক্কায় এমন বহু বণিক ছিল, যারা শামে গিয়েছে, মসজিদটি দেখেছে আর তার নিদর্শনগুলো চেনে। তাই চ্যালেঞ্জটি ছিল তার সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপে: **এমন এক জায়গার বর্ণনা দেওয়া, যা আপনার বিরোধীরা চেনে আর আপনি চেনেন না**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঘটনাটি **উভয় সহিহ গ্রন্থে** ও অন্যত্র আছে। বুখারি ও মুসলিম জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে নবী ﷺ বলেছেন: "কুরাইশ যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলল, আমি হিজরে দাঁড়ালাম; তখন আল্লাহ বাইতুল মাকদিস আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন, **আর আমি তা দেখতে দেখতেই তাদের কাছে তার নিদর্শনগুলোর বর্ণনা দিতে লাগলাম**।" আরেক বর্ণনায় আছে, তারা তাঁকে তার দরজার সংখ্যা জিজ্ঞাসা করল, আর তিনি গুনে গুনে বলে দিলেন। এরপর তিনি তাদের পথে থাকা তাদেরই একটি কাফেলার খবর দিলেন, তার বর্ণনা দিলেন আর পৌঁছানোর সময়ও বলে দিলেন — আর তা এল ঠিক যেমনটি তিনি বলেছিলেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এ এক **তাৎক্ষণিক, সরাসরি ও মিথ্যা প্রমাণযোগ্য পরীক্ষা**, তাও একই মজলিসে। তাঁকে অনুপস্থিত ও অজ্ঞেয় কোনো কিছুর বর্ণনা দিতে বলা হয়নি, বরং এমন এক জায়গার, **যা প্রশ্নকারীরা চেনে** আর তিনি চেনেন না। একটিমাত্র বিবরণে একটিমাত্র ভুলই সেদিনই গোটা দাওয়াতকে ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তারা বর্ণনার নির্ভুলতা স্বীকার করল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল — প্রতিটি নিদর্শনের বেলায় যা ছিল তাদের অভ্যাস। তবে সবচেয়ে জোরালো সাক্ষ্য **কাফেলার খবর**: তিনি তাদের নিজেদের কাফেলার খবর দিলেন — কোথায় আছে, কখন পৌঁছাবে; তারা অপেক্ষা করল, আর তাঁর কথামতোই, তিনি যেদিন বলেছিলেন সেদিনই তা পেল। এ এক স্বাধীন যাচাই, যা তাদের নিজেদের হাতেই সম্পন্ন হয়েছে, তাঁর হাতে নয়।

117

গায়েবের সংবাদ

নিহতেরা কোথায় পড়বে, যুদ্ধেরও আগে

রাসূলুল্লাহ ﷺ আগের দিনই আমাদের দেখাচ্ছিলেন, বদরের লোকেরা কোথায় লুটিয়ে পড়বে; তিনি বলছিলেন: আল্লাহ চাহে তো আগামীকাল অমুক এখানে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন: তাদের একজনও রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে হাত রেখেছিলেন সে জায়গা থেকে সরেনি।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

বালুতে আঁকা জায়গাগুলো... লাশগুলো সেখানেই পাওয়া গেল

সহজ কথায়

বদর যুদ্ধের একদিন আগে নবী ﷺ রণক্ষেত্রে হেঁটে বেড়ালেন, হাত দিয়ে মাটির জায়গাগুলোর দিকে ইশারা করে বলতে লাগলেন: **এখানে অমুক নিহত হবে, আর এখানে অমুক**। যুদ্ধ যখন হলো, তাদের একজনও তিনি যে জায়গা দেখিয়েছিলেন তা পেরিয়ে যায়নি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বদর ছিল প্রথম বড় মোকাবিলা: মুসলিম তিনশর কিছু বেশি, আর মুশরিক প্রায় এক হাজার। কে জিতবে তা-ই কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারত না, নিহতদের নাম আর তাদের লুটিয়ে পড়ার জায়গা নির্দিষ্ট করা তো দূরের কথা। যুদ্ধে মানুষ নড়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ে, পালায়; তাই **প্রত্যেক মানুষ মাটির ঠিক কোন টুকরোয় লুটিয়ে পড়বে** তা নির্ধারণ করে দেওয়ার কোনো তুলনাই নেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **সহিহ মুসলিমে** আনাস ইবনে মালিক ও উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। আনাসের বর্ণনায়: "তিনি বলতে লাগলেন: আগামীকাল অমুক এখানে পড়বে — আর তিনি এখানে-ওখানে মাটিতে হাত রাখলেন। বর্ণনাকারী বলেন: **তাদের একজনও রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে হাত রেখেছিলেন সে জায়গা থেকে সরেনি।**" আরও প্রমাণিত যে, যুদ্ধের পর তিনি কূপের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নাম ধরে ধরে ডাকছিলেন: "হে অমুকের পুত্র অমুক, তোমাদের রব তোমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তোমরা কি তা সত্য পেয়েছ?"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে ভবিষ্যদ্বাণীটি **ঘটার আগেই মাটিতে লিখে রাখা হয়েছে**, আর গোটা বাহিনী তা দেখেছে। আর সব সংবাদের মধ্যে এটিই সবচেয়ে সহজে মিথ্যা প্রমাণযোগ্য: একজন মানুষ অন্য কোথাও পড়ে গেলেই তিনশ সাক্ষীর সামনে গোটা ব্যাপারটি ভেঙে পড়ত। আর এতে তিনটি জিনিস একসঙ্গে ছিল: **ব্যক্তিদের নাম ধরে নির্দিষ্ট করা**, **তারা নিহত হবেই বলে দেওয়া** — অর্থাৎ ছোট দলটিই জিতবে — এবং **জায়গাটি বিঘতের মাপে ঠিক করে দেওয়া**। একটিমাত্র সংবাদে তিনটি শর্ত, আর পরদিনই দুই বাহিনীর চোখের সামনে সবগুলোই পূর্ণ হলো।

একটি পশুর অভিযোগ

118 যে উট কেঁদেছিল ও অভিযোগ করেছিল

যখন সে নবী ﷺ-কে দেখল, সে গোঙাল আর তার দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরল। তখন নবী ﷺ তার কাছে গিয়ে কানের পেছনে হাত বুলালেন, আর সে চুপ হয়ে গেল। তিনি বললেন: এই উটের মালিক কে? ... তুমি কি এই পশুটির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না, যাকে আল্লাহ তোমার মালিকানায় দিয়েছেন? সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখো আর খাটিয়ে ক্লান্ত করো।

আবু দাউদের বর্ণনা — আলবানি সহিহ বলেছেন

উটটি হেঁটে তাঁর কাছে এল আর তার দুই চোখ বেয়ে পানি ঝরছিল — সাহাবিদের চোখের সামনে

সহজ কথায়

নবী ﷺ আনসারের এক ব্যক্তির প্রাচীরঘেরা বাগানে প্রবেশ করলেন, আর একটি উট **কাঁদতে কাঁদতে** তাঁর কাছে এল। তিনি তার মাথায় হাত বুলালেন, তাতে সে শান্ত হলো। তারপর তিনি তার মালিককে ডেকে বললেন: **"সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখো আর খাটিয়ে ক্লান্ত করো।"**

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পশু অভিযোগ করে না, আর তার কথা কেউ বোঝেও না। আর কোনো মানুষের সঙ্গে তার উটের সম্পর্ক সে দুজনেরই ভেতরকার ব্যক্তিগত ব্যাপার; নির্জনে সে তার সঙ্গে কেমন আচরণ করে তা কেউ জানে না। তাই এই বর্ণনায় একসঙ্গে দুটি জিনিস রয়েছে: **একটি পশুর অভিযোগ বোঝা**, আর **এমন এক গোপন কথা জানা যা কেবল তার মালিকই জানে**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আর আলবানি ও অন্যরা একে সহিহ বলেছেন। সহিহ গ্রন্থগুলোতে এর প্রতিষ্ঠিত সমান্তরাল বর্ণনাও আছে: **খায়বারের বিষমাখা বকরির** হাদিস, যাতে আছে যে সামনের রানটি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল সেটি বিষাক্ত, তাই তিনি হাত তুলে নিলেন আর সঙ্গীদেরও হাত তুলে নিতে বললেন (আবু দাউদ ও দারিমি, আর ঘটনার মূল দুই সহিহ গ্রন্থে), এবং **যে নেকড়ে রাখালের সঙ্গে কথা বলেছিল** তার হাদিস, যেখানে সে নবী ﷺ-এর আগমনের সংবাদ দিয়েছিল (আহমদের বর্ণনা, সহিহ সাব্যস্ত)। আরবরা এ ধরনের কিছুই জানত না, বরং তারা একে অভাবনীয় মনে করত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ঘটনাটির ব্যবহারিক ফলই একে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। নবী ﷺ নিদর্শন দেখিয়েই থেমে যাননি, বরং তাকে **পশুর প্রতি দয়ার একটি বিধানে** রূপ দিয়েছেন: "তুমি কি এই পশুটির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না, যাকে আল্লাহ তোমার মালিকানায় দিয়েছেন?" আর এটি তাঁর আমলের একটি পূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গেই মেলে: পশুকে কষ্ট দেওয়া আর তাকে নিশানা বানানোর নিষেধ, যে নারী একটি বিড়াল আটকে রেখে আগুনে গিয়েছিল তার হাদিস, আর যে ব্যক্তি একটি কুকুরকে পানি পান করিয়ে ক্ষমা পেয়েছিল তার কথা। সপ্তম খ্রিস্টাব্দে, পশুর প্রতি উদাসীন এমন এক পরিবেশে এর আসা — আর পৃথিবীর প্রথম পশু-নিষ্ঠুরতা নিবারণী সংস্থার এক হাজার বছরেরও বেশি আগে — আরেকটি নিদর্শন।

119

প্রকাশ্য সুরক্ষা

যে বিষমাখা বকরি তাঁকে জানিয়ে দিল

খায়বারে এক ইহুদি নারী তাঁকে একটি ভুনা বকরি উপহার দিল, যাতে সে বিষ মিশিয়েছিল … তিনি তা থেকে এক গ্রাস নিলেন, কিন্তু গিললেন না আর বললেন: এই হাড়টি আমাকে জানাচ্ছে যে তা বিষাক্ত।

আবু দাউদ ও দারিমির বর্ণনা — সনদ হাসান, আর এর মূল দুই সহিহ গ্রন্থে

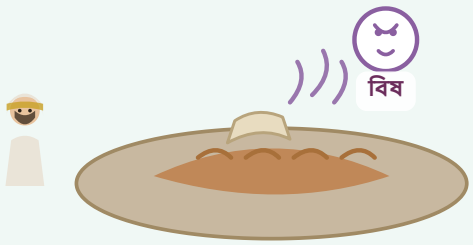

বিরত হলেন ও সঙ্গীদের সতর্ক করলেন — লোকমা গিলে ফেলা একজন ছাড়া সবাই বাঁচল

এক নারী তাঁকে পরখ করতে চেয়েছিল: নবী হলে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হবে, বাদশাহ হলে আমরা রেহাই পাব

সহজ কথায়

এক ইহুদি নারী নবী ﷺ-কে একটি ভুনা বকরি উপহার দিল, যাতে সে বিষ মিশিয়ে রেখেছিল। তিনি এক গ্রাস মুখে নিয়ে **তা গিললেন না**, আর বললেন: "এই সামনের রানটি আমাকে জানাচ্ছে যে তা বিষাক্ত।"

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এটি ছিল খায়বার বিজয়ের পরের ঘটনা, শত্রুতা তখন প্রকাশ্য ও সক্রিয়। আর ভুনা মাংসে মেশানো বিষ চোখে দেখে বা গন্ধ শুঁকে ধরা যায় না। আর সেই নারী নিজেই জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিল যে সে জানতে চেয়েছিল — **"তিনি নবী হলে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হবে, আর বাদশাহ হলে আমরা তাঁর হাত থেকে রেহাই পাব"**। অর্থাৎ সে বিষয়টিকে একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা হিসেবেই সাজিয়েছিল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঘটনাটি **সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে** এবং সুনানে আবু দাউদ ও দারিমিতে রয়েছে, আনাস, আবু হুরায়রা, জাবির, ইবনে আব্বাস ও অন্যদের সূত্রে। এর ভেতরেই সেই নারীর নিজের স্বীকারোক্তি ও এ কাজে তার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। আর বিশর ইবনুল বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা যান, কারণ সতর্কবাণীর আগেই তিনি নিজের গ্রাসটি গিলে ফেলেছিলেন — এমন বিবরণ কোনো জালিয়াত যোগ করত না, কেননা তা দেখায় যে নিদর্শনটি সব ক্ষতি ঠেকায়নি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, **পরীক্ষাটি সাজিয়েছিল প্রতিপক্ষ নিজেই**, আর আগেভাগেই সে তার শর্ত ঘোষণা করেছিল: নবুয়ত চেনা যাবে এভাবে যে তাঁকে বিষের সংবাদ দেওয়া হবে। তারপর শর্তটি হুবহু পূর্ণ হলো, আর সে নিজে লোকদের সামনে তা স্বীকার করল। এরপর বিষয়টি আরও ভারী হলো: **নবী ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন** — সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বর্ণনাগুলোতে — আর এ আচরণ নিশ্চিন্ত মানুষের, ভীত প্রতিশোধপরায়ণের নয়। আর যে শেষ বিবরণটি বর্ণনার সততা চূড়ান্ত করে দেয় তা হলো সেই বিষে **এক সাহাবির মৃত্যুর** উল্লেখ; বর্ণনা ঘটনাটিকে সাজিয়ে তোলেনি, একে পূর্ণ বিজয়ও বানায়নি, বরং তার মিষ্টির সঙ্গে তিক্ততাসহই তুলে ধরেছে।

কবুল হওয়া দোয়া

120 যে বৃষ্টি চাওয়ায় নামল, আবার চাওয়ায় থামল

তিনি দুই হাত তুলে বললেন: হে আল্লাহ, আমাদের বৃষ্টি দান করুন ... আল্লাহর কসম, আকাশে আমরা এক টুকরো মেঘও দেখছিলাম না ... আর তিনি হাত নামাতে না নামাতেই পাহাড়ের মতো মেঘ উঠে এল, আর তিনি নামতে না নামতেই বৃষ্টি তাঁর দাড়ি বেয়ে ঝরছিল।

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা — সর্বসম্মত

তারপর দোয়া করলেন, তা থামল — কেটে গেল কেবল মদিনা থেকেই

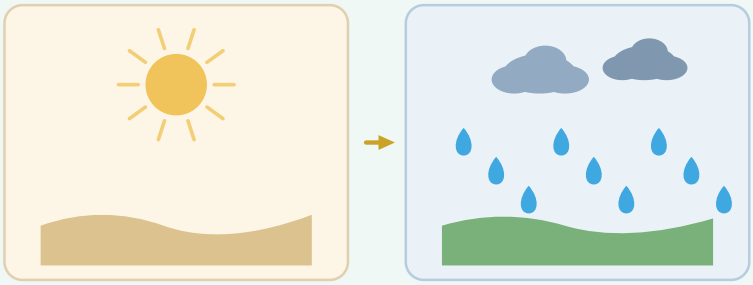

মেঘহীন পরিষ্কার আকাশ — পুরো এক সপ্তাহ বৃষ্টি

মদিনা রোদের নিচে, আর তার চারপাশে সবখানে বৃষ্টি — আনাস যেমন বর্ণনা করেছেন

সহজ কথায়

জুমার খুতবার সময় এক ব্যক্তি খরার অভিযোগ নিয়ে এল, তখন নবী ﷺ দুই হাত তুলে দোয়া করলেন — **আকাশ তখন পরিষ্কার, এক টুকরো মেঘও নেই**। তিনি হাত নামাতে না নামাতেই মেঘ উঠে এল, আর পুরো এক সপ্তাহ বৃষ্টি হলো, শেষে লোকেরা বেশি বৃষ্টির অভিযোগ করল; তিনি দোয়া করলেন, আর তা থেমে গেল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বৃষ্টির প্রার্থনা জাতিগুলোর ভেতর প্রাচীন এক রীতি, কিন্তু তা আশা-করা এক প্রার্থনা, পূর্ণ হওয়া কোনো প্রতিশ্রুতি নয়। আর পরিষ্কার আকাশ থেকে মুহূর্তের ভেতর বৃষ্টি নামে না। আর এটি **দুইবার, দুই বিপরীত দিকে** ঘটা — চাওয়ায় নামা, তারপর চাওয়ায় থেমে যাওয়া — কাকতালের সব সম্ভাবনার বাইরে চলে যায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **উভয় সহিহ গ্রন্থে** আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আনাস দৃশ্যটি বর্ণনা করেছেন বিস্ময়কর নিখুঁততায়: আকাশ ছিল সম্পূর্ণ পরিষ্কার, মেঘ উঠেছিল "পাহাড়ের মতো", আর বৃষ্টি চলেছিল পরের জুমা পর্যন্ত। তারপর যখন তিনি তা উঠে যাওয়ার দোয়া করলেন, আনাস বলেন: **"তা থেমে গেল, আর আমরা রোদে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলাম"**, আর অন্য এক বর্ণনায়: "কাপড় সরে যাওয়ার মতো তা মদিনা থেকে সরে গেল" — অর্থাৎ বৃষ্টি **কেবল** মদিনা থেকেই সরে গেল আর তার চারপাশে থেকে গেল।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

শেষ বিবরণটিই এই সংবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক। দোয়ার পর বৃষ্টি নামা নিয়ে বলা যেত: তা তার মৌসুমের সঙ্গেই মিলে গেছে। কিন্তু **কেবল মদিনা থেকেই তার সরে যাওয়া আর চারপাশে থেকে যাওয়া** এমন এক ঘটনা যা কাকতাল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, আর মদিনার সব মানুষ একই দিনে তা নিজের চোখে দেখেছে। আর দ্বিতীয় দোয়ার শব্দগুলো লক্ষ করুন, সেগুলো অত্যন্ত নিখুঁত: "**হে আল্লাহ, আমাদের চারপাশে, আমাদের উপরে নয়**" — তিনি বৃষ্টি একেবারে উঠে যাওয়ার কথা বলেননি, বরং তা মদিনা থেকে ফিরিয়ে তার চারপাশে দেওয়ার কথা বলেছেন, কারণ মানুষের তা প্রয়োজন ছিল। আর তা ঠিক সেই নিখুঁত রূপেই ঘটল যে রূপে তিনি চেয়েছিলেন।

121

আরোগ্য

আলির চোখ — আর কাতাদার চোখ

তিনি তাঁর দুই চোখে থুতু লাগিয়ে দোয়া করলেন, আর তিনি এমন সুস্থ হলেন যেন কোনো ব্যথাই ছিল না।

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা — সর্বসম্মত

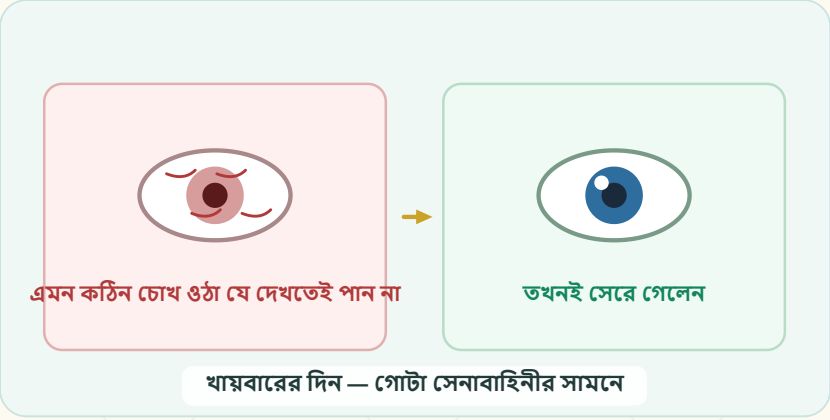

আলির চোখ এতটাই ফুলে ছিল যে তিনি প্রায় দেখতেই পাচ্ছিলেন না; কিছুক্ষণ পরেই পতাকা তাঁর হাতে

সহজ কথায়

খায়বারের দিনে নবী ﷺ বললেন: **আগামীকাল আমি পতাকা এমন একজনকে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে**। তিনি আলিকে ডাকলেন — যাঁর দুই চোখ এমন অসুস্থ ছিল যে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না — **আর তাঁর দুই চোখে থুতু লাগালেন, তাতে তিনি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে গেলেন**, এরপর তাঁরই হাতে খায়বার বিজিত হলো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

চোখ ওঠা সেই পরিবেশের এক পরিচিত রোগ ছিল, আর ধৈর্য ও সময় ছাড়া তার কোনো চিকিৎসা ছিল না। তা মুহূর্তের ভেতর সারে না। আর ঘটনাটি ঘটেছিল এক উত্তেজনাপূর্ণ সামরিক মুহূর্তে, সেনাদল অপেক্ষায় ছিল, পতাকা কে বহন করবে তা জানতে উন্মুখ — উমর বলেছেন: "সেদিন ছাড়া আমি কখনো নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করিনি।"

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **উভয় সহিহ গ্রন্থে** সাহল ইবনে সাদ, আবু হুরায়রা ও সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। আর এর সমান্তরাল হলো উহুদের দিনে **কাতাদা ইবনে নুমান** রাদিয়াল্লাহু আনহুর চোখ সম্পর্কে যা প্রতিষ্ঠিত — তাঁর চোখে এমন আঘাত লাগে যে তা গাল পর্যন্ত ঝুলে পড়ে, আর নবী ﷺ নিজ হাতে তা যথাস্থানে বসিয়ে দেন ও তাঁর জন্য দোয়া করেন, তাতে সেটিই তাঁর দুই চোখের ভেতর সুন্দরতর ও তীক্ষ্ণতর হয়ে যায়। এ কথা তাঁর বংশে জানা ছিল, এমনকি তাঁর নাতি খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের সামনে তা উল্লেখ করেছিলেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুটি বিষয় এই ঘটনাকে নিছক দাবির গণ্ডি থেকে বের করে আনে। প্রথমত, এটি ঘটেছিল **সৈন্য সমাবেশের মুহূর্তে একটি পূর্ণ সেনাদলের সামনে**, যখন প্রতিটি চোখ ছিল পতাকাবাহীর উপর। দ্বিতীয়ত — আর এটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ — আরোগ্য নিজেই কোনো লক্ষ্য ছিল না, বরং তা ছিল **একটি দায়িত্ব পালনের শর্ত**: পতাকা তাঁকে তখনই দেওয়া হলো, তিনি যুদ্ধে বেরিয়ে গেলেন, আর সেই দিনেই তাঁর হাতে দুর্গ জয় হলো। তিনি সত্যিই সুস্থ না হলে ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই তা ধরা পড়ত। আর কাতাদার চোখের চিহ্ন **কয়েক দশক ধরে দৃশ্যমান ছিল** — এমন এক নিদর্শন যা মানুষ সারা জীবন সেই ব্যক্তির মুখে দেখেছে, নিছক বর্ণিত কোনো সংবাদ নয়।

122

হিজরতে সুরক্ষা

সুরাকা আর তার ঘোড়া, যা মাটিতে ডেবে গেল

আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে চলছিলাম ... আমার ঘোড়া হোঁচট খেল আর আমি পড়ে গেলাম ... তারপর আবার সওয়ার হলাম, আর যখন তাঁরা দুজন নজরে এলেন তখন তার সামনের দুই পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে ডেবে গেল।

বুখারির বর্ণনা — সহিহ

একশ উটের লোভে বেরোনো এক পিছুধাওয়াকারী... ফিরল নিরাপত্তা চাইতে

সহজ কথায়

হিজরতের সময় সুরাকা নবী ﷺ ও আবু বকরের পিছু নিয়ে বেরোল। আর যতবারই সে তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছত, **তার ঘোড়ার পা শক্ত মাটিতে ডেবে যেত** হাঁটু পর্যন্ত। সে বুঝল যে তাকে ঠেকানো হচ্ছে, আর তাঁদের কাছে নিরাপত্তা চাইল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কুরাইশ ঘোষণা করেছিল, যে মুহাম্মদ ﷺ-কে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে তার জন্য একশ উট। আর সুরাকা ছিল বনু মুদলিজের এক দক্ষ, অভিজ্ঞ অশ্বারোহী — সেই গোত্র পদচিহ্ন পড়া ও খোঁজ লাগানোয় পারদর্শী। দৃশ্যটি ছিল খোলা মরুভূমিতে, পালানোর কোনো জায়গা নেই, আর দুজন মানুষের কোনো পাহারা নেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পূর্ণ বিবরণসহ কাহিনিটি **সহিহ বুখারিতে** আছে, আয়েশা ও আবু বকর থেকে আসা হিজরতের দীর্ঘ হাদিসের ভেতর, আর **সুরাকা নিজেই তা বর্ণনা করে** ইসলাম গ্রহণের পর। সে জানিয়েছে যে তার নিচে ঘোড়া একাধিকবার ডেবে গিয়েছিল, যে সে তির দিয়ে ভাগ্যগণনা করেছিল আর অপছন্দের ফলটিই এসেছিল, তবু সে তা অমান্য করেছিল — এরপর যখন সে নিরাশ হলো, তখন ডেকে নিরাপত্তার প্রস্তাব দিল আর তাঁদের পাথেয় ও সামগ্রী দিতে চাইল। নবী ﷺ তার জন্য নিরাপত্তার একটি পত্র লিখিয়ে দিলেন, যা সে মক্কা বিজয়ের দিনে নিয়ে এসেছিল। আর সেই মুহূর্তেই তিনি ﷺ তাকে বলেছিলেন: "তোমার কী অবস্থা হবে যখন তুমি কিসরার দুই বালা পরবে?" — যা সে পরে পরেছিল।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই সংবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো, **এর বর্ণনাকারী প্রতিপক্ষ নিজেই**। ঘটনার দিন সুরাকা মুসলিম ছিল না; সে ছিল পুরস্কারলোভী পিছুধাওয়াকারী। বছর কয়েক পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে আর তার সঙ্গে যা ঘটেছিল তা মানুষকে বলে। আর প্রতিপক্ষের নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য — নিজের ব্যর্থতা আর যা সে দেখেছে তা স্বীকার করা — বর্ণনাশাস্ত্রের পণ্ডিতদের কাছে প্রমাণের সর্বোচ্চ স্তরগুলোর একটি। আর সেই অদ্ভুত বিবরণটিও লক্ষ করুন যা কেউ বানায় না: ঘোড়া **একবার নয়, বারবার ডেবে গিয়েছিল**, আর প্রতিবারই সে আবার চেষ্টায় ফিরে গিয়েছিল, শেষে গিয়ে নিরাশ হয়েছিল। কোনো পিছুধাওয়াকারী কাহিনি বানালে হত্যাচেষ্টার এই বারবার একগুঁয়েমিসহ তা কখনো বর্ণনা করত না।

123

নবুয়তের নিদর্শন

সালমান ফারসি ও তিনটি নিদর্শন

আর সে আমাকে তাঁর বর্ণনা দিল: তিনি সদকা খান না, হাদিয়া গ্রহণ করেন, আর তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নবুয়তের মোহর আছে।

আহমদ ও ইবনে হিব্বানের বর্ণনা — সনদ হাসান

তিন নিদর্শন, যা তিনি নিজে যাচাই করেছেন

- তাঁকে সদকা দিলেন... তিনি খেলেন না
- তাঁকে হাদিয়া দিলেন... তিনি সঙ্গে খেলেন
- পিঠ দেখলেন, নবুয়তের মোহর পেলেন

সেই মজলিসেই মুসলিম হলেন

এক ব্যক্তি, যিনি এই তিন নিদর্শনের খোঁজে পারস্য ও শাম পেরিয়েছেন

নবুয়তের আগে এক খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর কাছে শোনা নিদর্শন... পরে তা মিলে গেল

সহজ কথায়

সালমান ফারসি নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম ছেড়ে সত্যের খোঁজে দেশে দেশে ঘুরেছেন, শেষে এক সন্ন্যাসী তাঁকে প্রতীক্ষিত নবীর তিনটি নিদর্শন বলে দেন। মদিনায় পৌঁছে **তিনি তিনটি নিদর্শনই নিজে পরখ করে মিলিয়ে নেন** — আর ইসলাম গ্রহণ করেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের আহলে কিতাব আরবের ভূমিতে প্রেরিত হতে যাওয়া এক নবীর অপেক্ষায় ছিল, আর তাঁর নিদর্শনগুলো তারা প্রজন্মে প্রজন্মে বয়ে নিচ্ছিল। সালমান পারস্য থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ বছর সন্ন্যাসীদের মাঝে ঘুরেছেন, শেষে দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে মদিনায় পৌঁছান — হিজরতের কয়েক বছর আগে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কাহিনিটি সালমান নিজেই বর্ণনা করেছেন মুসনাদে আহমদ, সহিহ ইবনে হিব্বান ও ইবনে ইসহাকের সিরাতে। তাতে আছে, তিনি কিছু খেজুর এনে বললেন: এটি সদকা। নবী ﷺ সঙ্গীদের বললেন: "খাও", আর নিজে খেলেন না। তারপর তিনি অন্য খেজুর এনে বললেন: এটি হাদিয়া। আর তিনি তাঁদের সঙ্গে খেলেন। এরপর সালমান দেখার জন্য তাঁর পেছন দিকে ঘুরলেন, আর নবী ﷺ বুঝে নিলেন তিনি কী চান, তাই পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন; সালমান মোহর দেখলেন আর তার উপর ঝুঁকে পড়ে চুমু খেতে ও কাঁদতে লাগলেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি কোনো মহাজাগতিক অলৌকিকতা নয়, বরং সব অর্থেই **একটি সুসংগঠিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা**: আগেভাগে নির্দিষ্ট করা অনুমান, প্রতিটির জন্য একটি পরীক্ষণ, আর একটি ফল যা গ্রহণ বা বর্জন করা যায়। সালমান কোনো যুক্তি বা আবেগে ইসলাম গ্রহণ করেননি, বরং **তিনটি শর্তই পূর্ণ হওয়ার** পরে করেছেন। আর এগুলোর ভেতর সূক্ষ্মতম হলো দ্বিতীয়টি: **সদকা ও হাদিয়ার** পার্থক্য — এটি নবী ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট একটি শরয়ি বিধান (সদকা তাঁর জন্য হারাম, হাদিয়া হালাল), আর অনুমান করে কারও পক্ষে এতে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কয়েকটি বর্ণনায় এসেছে যে সন্ন্যাসী, ইহুদি পণ্ডিত ও হানিফরা নবুয়তের আগেই এক প্রতীক্ষিত নবীর কথা বলতেন ও তাঁর নিদর্শন বর্ণনা করতেন — তাঁদের ভেতর বাহিরা সন্ন্যাসী, আর জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল, যিনি নবুয়তের আগেই ইবরাহিমের ধর্ম খুঁজতে খুঁজতে মারা যান। এরপর ইহুদি পণ্ডিত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মদিনায় তাঁর আগমনের প্রথম দিনেই তাঁকে চিনে ফেলেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন।

কবুল হওয়া দোয়া

124 আনাসের জন্য দোয়া... সম্পদে-সন্তানে আনসারদের শীর্ষে

হে আল্লাহ, তার সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন। আনাস বলেন: আল্লাহর কসম, আমার সম্পদ প্রচুর, আর আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান আজ প্রায় একশ গুনে পৌঁছেছে।

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা — সর্বসম্মত

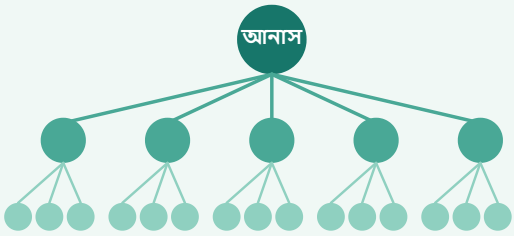

"আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান আজ প্রায় একশো"

আর বাঁচলেন প্রায় একশ বছর — বসরায় শেষ ইন্তেকাল করা সাহাবি

এক দরিদ্র ঘরে করা দোয়া... যাঁর জন্য করা হলো তিনিই সারা জীবন তার বাস্তবায়ন দেখলেন

সহজ কথায়

উম্মে সুলাইম নবী ﷺ-এর কাছে তাঁর ছেলে আনাসের জন্য দোয়া চাইলেন, তাই তিনি তাঁর জন্য **প্রচুর সম্পদ, বহু সন্তান ও বরকতের** দোয়া করলেন। আর আনাস বেঁচে থেকে তার সবটুকু নিজের চোখে দেখেছেন আর মানুষকে তা বলেছেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আনাস তখন দশ বছরের ছোট বালক, যিনি নবী ﷺ-এর খেদমত করেছেন দশ বছর। তাঁর পরিবার আনসারদের ভেতর সবচেয়ে ধনীও ছিল না, সংখ্যায় সবচেয়ে বেশিও নয়। আর দোয়াটিতে ছিল **তিনটি নির্দিষ্ট বিষয়**, যা এক জীবন পরে মেপে দেখা যায়: সম্পদ, সন্তান, আর দুটিতেই বরকত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **উভয় সহিহ গ্রন্থে**। আর কয়েক দশক পরে আনাস নিজেই তার বাস্তবায়ন বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কসম খেয়ে: "আমার সম্পদ প্রচুর, আর আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান আজ প্রায় একশ গুনে পৌঁছেছে।" এক বর্ণনায় এসেছে, বসরায় হাজ্জাজের আগমনের আগেই তাঁর প্রায় একশ বিশজন বংশধর দাফন হয়েছিল। তাঁর বাগানে বছরে দুবার ফল ধরত। আর তিনি প্রায় একশ বছর বেঁচেছেন, এবং **বসরায় সবশেষে ইন্তেকাল করা সাহাবি** তিনিই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি ভিন্ন ধরনের প্রমাণ: **এমন এক ভবিষ্যদ্বাণী, যাঁকে নিয়ে তা করা হয়েছে তিনি নিজেই তার বাস্তবায়ন দেখেন ও বর্ণনা করেন**। বর্ণনাকারী নিজেই উপকারভোগী, নিজেই সাক্ষী, আর তিনি তা বলছেন বসরায়, যেখানে তাঁর চারপাশে হাজারো মানুষ তাঁর অবস্থা জানে, তাঁর সন্তান, নাতি-নাতনি ও সম্পদ দেখে। তিনি বাড়িয়ে বললে নিজ শহরের লোকেরাই তাঁকে খণ্ডন করত। এর প্রতিষ্ঠিত সমান্তরাল আরও অনেক: ইবনে আব্বাসের জন্য বোধ ও কুরআনের ব্যাখ্যার দোয়া, তাতে তিনি হয়ে ওঠেন "উম্মতের পণ্ডিত"; সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের জন্য দোয়া কবুল হওয়ার দোয়া, তাতে মানুষ তাঁর দোয়াকে ভয় করত; আর যে ব্যক্তি অহংকারবশত বাঁ হাতে খেয়েছিল তার বিরুদ্ধে দোয়া, তাতে সে আর কখনো হাতটি মুখ পর্যন্ত তুলতে পারেনি। বিচ্ছিন্ন মানুষদের নিয়ে বিচ্ছিন্ন সংবাদ, যার প্রতিটিই আলাদাভাবে মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল।

125

জড়বস্তুর তাসবিহ

তাঁর সামনে খাবারের তাসবিহ

আমরা খাবার খাওয়ার সময় তার তাসবিহ শুনতাম।

বুখারির বর্ণনা — সহিহ

খাওয়ার সময় খাবার থেকে শোনা শব্দ

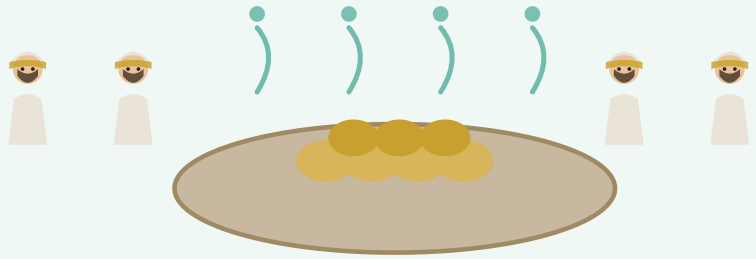

উপস্থিত সবাই শুনেছেন — ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা

তাঁরা এসব নিদর্শনকে বরকত গণ্য করতেন, ভীতির কারণ নয়

সহজ কথায়

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: **"আমরা খাবার খাওয়ার সময় তার তাসবিহ শুনতাম"** — অর্থাৎ নবী ﷺ-এর সামনে রাখা খাবার থেকে তাঁরা তাসবিহের একটি শব্দ শুনতে পেতেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জড়বস্তুর কোনো আওয়াজ নেই। খাবার খাওয়া হয় নীরবে। আর তা থেকে তাসবিহ শোনা যাওয়া এমন এক বিষয় যার নজির কারও অভিজ্ঞতায় নেই। আর নবী ﷺ ছাড়া অন্য কারও সম্পর্কে এমন কিছু বর্ণিতও হয়নি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বর্ণনাটি **সহিহ বুখারিতে** রয়েছে, "ইসলামে নবুয়তের নিদর্শন" অধ্যায়ে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তা বর্ণনা করেছেন বহুবচনে: "**আমরা শুনতাম**" — অর্থাৎ এটি বারবার ঘটা একটি সামষ্টিক পর্যবেক্ষণ, বিচ্ছিন্ন একটিমাত্র ঘটনা নয়। এর সমান্তরাল হলো তাঁর হাতের তালুতে **কঙ্করের তাসবিহ** সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত বর্ণনা, আর মক্কায় যে পাথর তাঁকে সালাম দিত তার কথা, যেমন সহিহ মুসলিমে জাবির ইবনে সামুরা থেকে এসেছে: "আমি মক্কার এমন একটি পাথর চিনি যা আমি প্রেরিত হওয়ার আগে আমাকে সালাম দিত; আমি এখনো তাকে চিনি।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

বহুবচন আর ধারাবাহিকতার রূপটিই শক্তির জায়গা: "**আমরা শুনতাম**"। একবার ঘটলে বলা হতো "আমরা শুনেছি"। কিন্তু ব্যবহৃত রূপটি বোঝায় পুনরাবৃত্তি ও অভ্যস্ততা — অর্থাৎ এটি তাঁদের কাছে পরিচিত একটি বিষয় ছিল, যা গোটা দল জানত। এমন কিছু শত শত জীবিত সাক্ষীর পরিবেশে বানানো যায় না। আর কুরআন এই গোটা বিষয়ের সাধারণ মূলনীতি ঘোষণা করে: "**আর এমন কিছুই নেই যা তাঁর প্রশংসায় তাসবিহ পাঠ করে না, কিন্তু আপনারা তাদের তাসবিহ বোঝেন না**" — তাসবিহ প্রতিটি বস্তুতেই চলমান, আর নবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে যা ঘটেছে তা হলো **তা শোনার পর্দা সরিয়ে দেওয়া**, নতুন কিছু সৃষ্টি করা নয়।

প্রতিশ্রুত নিরাপত্তা

126 এখন আমরা তাদের উপর অভিযান চালাব, তারা আমাদের উপর নয়

আল্লাহর কসম, আমার মৃত্যুর আগে তারা আপনার কাছে পৌঁছাতে পারবে না ... খন্দকের দিনে তিনি ﷺ বললেন: এখন আমরা তাদের উপর অভিযান চালাব, তারা আমাদের উপর নয়; আমরাই তাদের দিকে যাব।

বুখারির বর্ণনা — সহিহ

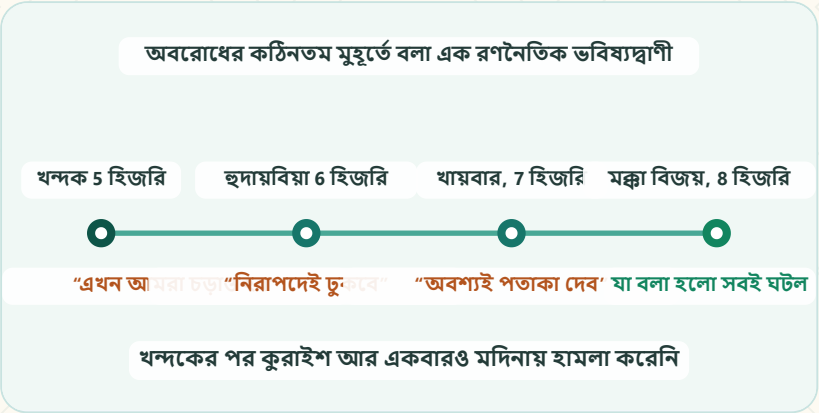

উদ্যোগের পূর্ণ উলটে যাওয়া... ঘোষিত হলো ঘটার আগেই

সহজ কথায়

আহজাবের বাহিনীগুলো মদিনা থেকে ফিরে যাওয়ার পর নবী ﷺ বললেন: **"এখন আমরা তাদের উপর অভিযান চালাব, তারা আমাদের উপর নয়; আমরাই তাদের দিকে যাব।"** আর সেদিন থেকে কুরাইশ আর কখনো মদিনায় হামলা করেনি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

খন্দকের অবরোধ ছিল মুসলিমদের উপর দিয়ে যাওয়া সবচেয়ে কঠিন সময়। মদিনার চারপাশে দশ হাজার যোদ্ধা, ভেতর থেকে বনু কুরাইজার ইহুদিরা চুক্তি ভেঙেছে, আর ক্ষুধা, শীত ও ভয়। কুরআন বলে: "**আর প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল, আর আপনারা আল্লাহ সম্পর্কে নানা ধারণা করছিলেন**"। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই উদ্যোগ উলটে যাওয়ার ঘোষণা আসে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **সহিহ বুখারিতে**। আর তা হুবহু তাঁর কথামতোই ঘটেছে: খন্দকের পর (5 হিজরি) কুরাইশ আর একবারও মদিনার দিকে অভিযানে বের হয়নি। বরং মুসলিমরাই হয়ে ওঠে উদ্যোগের অধিকারী: 6 হিজরিতে হুদাইবিয়া, তারপর 7 হিজরিতে খায়বার, তারপর 8 হিজরিতে মক্কা বিজয়, তারপর হুনাইন ও তাবুক। আর এটি সিরাত ও ইতিহাসের সব গ্রন্থে স্বীকৃত একটি সামরিক বাস্তবতা।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি **একটি কৌশলগত সংবাদ, আধ্যাত্মিক নয়**, আর সে কারণেই তা নিছক ঐতিহাসিক যাচাইয়ের আওতায় পড়ে। আর তা উচ্চারিত হয়েছে **সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তে** — যখন সব লক্ষণ বলছিল ঠিক উলটোটা। জানা নিয়ম হলো, শ্বাসরোধী অবরোধ থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তি নিজের অবস্থা মেরামতে ব্যস্ত হয়, আক্রমণে নয়। হাদিসের শব্দচয়ন লক্ষ করুন: তিনি বলেননি "আমরা জয়ী হব" — যা সাধারণ কথা, যেকোনো কিছুর সঙ্গেই খাপ খায় — বরং নির্দিষ্ট করেছেন **উদ্যোগের লাগাম হাতবদলের কথা**: "আমরাই তাদের দিকে যাব"। আর পরবর্তী তিন বছরে বাস্তবে যা ঘটেছে এটি তারই নিখুঁত বর্ণনা: এর পরের প্রতিটি অভিযান মদিনা থেকে বেরিয়েছে, মদিনার দিকে আসেনি।

127

সারকথা

আমরা কেন এই সংবাদে আস্থা রাখি?

হে ঈমানদারগণ, কোনো ফাসিক আপনাদের কাছে সংবাদ নিয়ে এলে তা যাচাই করে নিন, যেন অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বসেন, আর পরে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে না হয়।

সূরা আল-হুজুরাত — আয়াত 6

হাদিসবিদদের কাছে সংবাদ গ্রহণের মানদণ্ড

- অবিচ্ছিন্ন সনদ — প্রতিটি রাবির নাম ধরে উল্লেখ
- প্রতিটি রাবির সততা ও স্মৃতিশক্তি — আর তার লিখিত জীবনী
- খবরটি অস্বাভাবিকতা ও গোপন ত্রুটি থেকে মুক্ত
- নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের শব্দে ও অর্থে পরস্পর মিল

এমন এক বিদ্যা, যার নজির অন্য কোনো জাতিতে নেই

জারহ ও তাদিলের শাস্ত্র: লক্ষ লক্ষ বর্ণনাকারীর জীবনী লিপিবদ্ধ ও পরীক্ষিত

সহজ কথায়

এই সংবাদগুলো আমাদের কাছে মুখে মুখে ছড়ানো গল্প হিসেবে পৌঁছায়নি। পৌঁছেছে **একটি সুদৃঢ় নথিকরণ ব্যবস্থার** ভেতর দিয়ে: প্রতিটি সংবাদের রয়েছে নাম ধরে উল্লেখ করা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক সূত্র, আর প্রতিটি বর্ণনাকারীর রয়েছে লিখিত জীবনী, যাতে তাঁর সততা ও স্মৃতি যাচাই করা হয়েছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ইসলামের আগের জাতিগুলো তাদের নবিদের সংবাদ বহন করেছে কোনো সূত্র-পরম্পরা ছাড়াই। কে কার কাছ থেকে নিয়েছে তা জানা নেই, কখন তা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাও নয়, আর বাহক নির্ভরযোগ্য ছিলেন কি না তাও নয়। এ কারণেই সেসব জাতির গ্রন্থে সহিহর সঙ্গে জাল মিশে গেছে, আর ইতিহাসের সঙ্গে উপকথা।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মুসলিমরা উদ্ভাবন করেন **ইসনাদের শাস্ত্র** আর **জারহ ও তাদিলের শাস্ত্র**, আর লিপিবদ্ধ করেন লক্ষ লক্ষ বর্ণনাকারীর জীবনী: প্রত্যেকের জন্ম ও মৃত্যু, তাঁর শিক্ষক, তাঁর ছাত্র, তাঁর সফর, তাঁর স্মৃতিশক্তির অবস্থা, শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতি এলোমেলো হয়েছিল কি না, আর তিনি যা বর্ণনা করেছেন তাতে অন্যরা তাঁকে সমর্থন করেছে কি না। রিজাল-শাস্ত্রের গ্রন্থগুলো — যেমন তাহজিবুল কামাল ও মিজানুল ইতিদাল — এ বিষয়ের বিশাল বিশ্বকোষ। অস্ট্রিয়ান প্রাচ্যবিদ আলয়েস স্প্রেঙ্গার বলেছেন, মুসলিমরা এমন এক জীবনীশাস্ত্র তৈরি করেছেন যার সমকক্ষ অন্য জাতিগুলো জানত না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, এই অধ্যায়ের সংবাদগুলোতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য একত্র হয়েছে যা এড়ানো কঠিন: **বিপুলসংখ্যক সাক্ষীর সামনে সেগুলোর ঘটা** — খন্দকে এক হাজার, বদরে তিনশ, খেজুরকাণ্ডের হাদিসে একটি পূর্ণ মসজিদ; **একাধিক স্বতন্ত্র সূত্রে সেগুলোর বর্ণিত হওয়া**, এমন সাহাবিদের কাছ থেকে যাঁরা সেগুলো বানাতে একজোট হননি; **সেগুলোর ভেতর অপ্রীতিকর বিষয় থাকা** — বিষে এক সাহাবির মৃত্যু, খাবার কম পড়ার আশঙ্কায় জাবিরের ভয়; আর **সেগুলো মিথ্যা প্রমাণ করা নিয়ে প্রতিপক্ষের নীরবতা**, অথচ তারাই ছিল এ কাজে সবচেয়ে আগ্রহী। আর মানবেতিহাসে এমন কোনো মানুষ জানা নেই যাঁর সংবাদ, বাণী ও কর্ম এত নিখুঁতভাবে আর এত বিস্তারিতভাবে বাহিত হয়েছে।

সূত্র الخطيب البغدادي – «الكفاية في علم الرواية» · «ابن الصلاح – «مُقَدِّمَةُ ابنِ الصَّلاحِ»

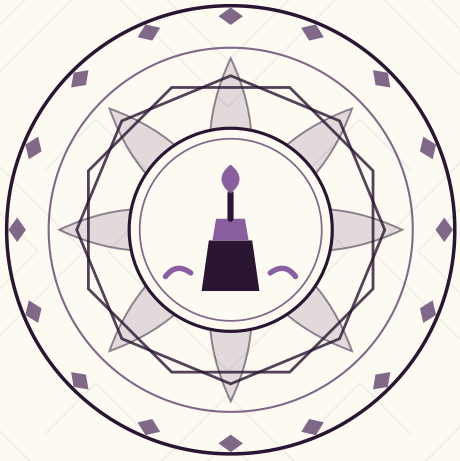

পঞ্চম পর্ব

জিন, জাদু ও গায়েবের জগৎ

একটি বাস্তব জগৎ, যার খবর আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, প্রতিটি জাতির ইতিহাস যার সাক্ষ্য দেয়, আর যার প্রমাণিত ঘটনাগুলো ঘটেছে নবি ﷺ-এর সঙ্গে, তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে, এবং আমাদের এ যুগ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গেও।

18 প্রমাণ

জিনের অস্তিত্ব

128 জিনদের একটি দল কুরআন শুনেছিল

বলুন, আমার কাছে ওহি পাঠানো হয়েছে যে জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনেছে, অতঃপর তারা বলেছে, আমরা এক আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথের দিশা দেয়, তাই আমরা তাতে ঈমান এনেছি।

সূরা জিন — আয়াত 1-2

জিন এমন এক সৃষ্টি যারা আদেশ-নিষেধের অধীন: তাদের মধ্যে মুসলিমও আছে, কাফিরও আছে

সহজ কথায়

জিন বাস্তব এক সৃষ্টি, আল্লাহ তাদের আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাদের দেখি না, তারা আমাদের দেখে। আর কুরআনে **তাদের নামেই একটি পূর্ণ সূরা** রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে তাদের একটি দল কুরআন শুনে তাতে ঈমান এনেছিল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবরা জিনদের চিনত এবং তাদের ভয় করত; বরং তাদের কেউ কেউ **জিনের আশ্রয় চাইত**, তাদের পূজা করত এবং সফরে তাদের কাছে নিরাপত্তা চাইত — এ কথা সূরাটি নিজেই উল্লেখ করেছে: "আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক জিনের মধ্যে কিছু লোকের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল।" তারা জিনের প্রতি গায়েবের জ্ঞান আরোপ করত এবং তাদের কাছ থেকেই গণকবিদ্যা নিত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ইসলাম **তাদের অস্তিত্ব অস্বীকারও করেনি, বাড়িয়েও বলেনি** — বরং বিষয়টিকে নিখুঁতভাবে সীমাবদ্ধ করেছে: তাদের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেছে এমন এক দায়বদ্ধ সৃষ্টি হিসেবে যাদের মধ্যে সৎ ও অসৎ দুই-ই আছে; গায়েবের জ্ঞান তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে ("আর আমরা ধারণা করতাম, মানুষ ও জিন আল্লাহর প্রতি কখনো মিথ্যা বলবে না", এবং "আর আমরা জানি না, পৃথিবীতে যারা আছে তাদের ব্যাপারে অমঙ্গল চাওয়া হয়েছে কি না"); **তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া হারাম করেছে** এবং তাকে শিরক গণ্য করেছে; আর গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। এভাবে সত্যটুকু রেখে দিয়েছে, আর কুসংস্কার ও দাসত্ব দুটোই সরিয়ে দিয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি **এমন এক ভারসাম্য যার তুলনা আশপাশে নেই**। ধর্ম ও সংস্কৃতিগুলো হয় আত্মার জগৎকে এতটা ফুলিয়ে তোলে যে তা জ্ঞান ও শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়, যাকে পূজা করতে হয় ও সন্তুষ্ট রাখতে হয়; নয়তো তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে কুসংস্কার বানিয়ে দেয়। কুরআন তৃতীয় একটি পথ নিয়েছে: **অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেছে, উপাসনা বাতিল করেছে, আর গায়েবের জ্ঞান অস্বীকার করেছে**। এই কিতাব যদি ওই পরিবেশের কোনো মানুষের রচনা হতো, তবে তার পক্ষে সহজ ছিল লোকে যা মেনে নিয়েছে তাতেই সায় দেওয়া আর তা নিজের কর্তৃত্বে কাজে লাগানো — তার আগের গণকরা যেমন করত। কিন্তু তা বরং গণকবিদ্যার গোটা ব্যবসাটিই ভেঙে দিল, যা ছিল উপদ্বীপের সবচেয়ে লাভজনক পেশাগুলোর একটি।

সৃষ্টির উপাদান

129 ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির মতো শুকনো মাটি থেকে, আর জিনকে ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে।

সূরা আর-রহমান — আয়াত 14-15

দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদান — আর এ কারণেই একে অপরকে দেখতে পায় না

সহজ কথায়

আমরা **মাটি** থেকে সৃষ্ট, আর জিন সৃষ্ট **বিশুদ্ধ, অস্থির আগুন** থেকে, যাতে কোনো ধোঁয়া নেই। আর উপাদান ভিন্ন বলেই আপনার চোখ তাদের ধরতে পারে না — অথচ তারা আপনাকে দেখে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জিন নিয়ে মানুষের ধারণা ছিল নিয়ন্ত্রণহীন লোককল্পনা: ভূত, প্রেত আর ভয়ংকর সব আকৃতি। তাদের সৃষ্টির উপাদান কী, তার কোনো সংজ্ঞা ছিল না; কেন তাদের দেখা যায় না, তারও কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। আর এখানে যে আরবি শব্দটি এসেছে, তা এক সূক্ষ্ম পারিভাষিক শব্দ, যার ব্যবহার খুবই কম।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আরবি অভিধানে **মারিজ** হলো সেই বিশুদ্ধ, মিশ্রিত, অস্থির শিখা যাতে কোনো ধোঁয়া নেই। এটি শক্তির একটি বিশেষ রূপের বর্ণনা, কোনো ঘন বস্তুপিণ্ডের নয়। আর বিজ্ঞান আজ বলে, **মানুষের চোখ যা দেখে তা তড়িৎ-চৌম্বক বর্ণালির অতি সামান্য একটি অংশমাত্র** (প্রায় 400-700 ন্যানোমিটার), আর মহাবিশ্বের বস্তু ও শক্তির প্রায় 95% "অন্ধকার", যা দেখা যায় না, কেবল তার প্রভাব দিয়েই শনাক্ত করা যায়। কাজেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাইরে কোনো জগৎ থাকা আজকের বৈজ্ঞানিক মনের কাছে অদ্ভুত কিছু নয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কুরআন তাদের না-দেখা যাওয়ার কারণ স্পষ্ট করে বলেছে, আর তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম: "**নিশ্চয়ই সে ও তার দলবল আপনাদের দেখে এমন জায়গা থেকে, যেখান থেকে আপনারা তাদের দেখেন না**।" দেখাটা চলে এক দিকে, দুই দিকে নয় — আর এর জন্য দরকার **উপলব্ধির প্রকৃতিতেই** পার্থক্য, নিছক লুকিয়ে থাকা বা আড়াল নেওয়া নয়। এরপর সৃষ্টির দুই উপাদানের পার্থক্য সামর্থ্যের পার্থক্যটিও ব্যাখ্যা করে: দ্রুততা, ভেদ করে যাওয়া আর আকৃতি বদলানো। এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত **অভ্যন্তরীণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ** একটি ব্যাখ্যা, জাতিগুলোর পুরাণের মতো ছড়ানো-ছিটানো কিছু চিত্র নয়।

130

জাদু বাস্তব

জাদু স্বয়ং নবী ﷺ-এর উপরেই হয়েছিল

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর জাদু করা হয়েছিল, এমনকি তাঁর মনে হতো তিনি কোনো কাজ করেছেন, অথচ তা করেননি ... একটি চিরুনি, চিরুনিতে ওঠা চুল আর খেজুরের পুরুষ মোচার খোলে, আর তা ছিল যারওয়ান কূপে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

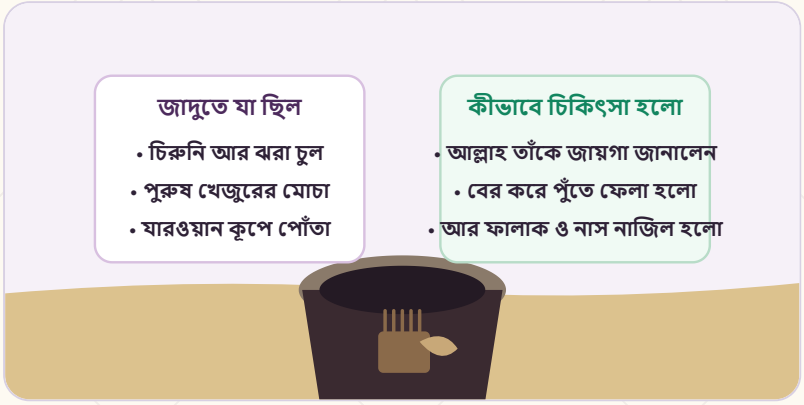

মদিনার যারওয়ান কূপ — যেখান থেকে জাদু বের করা হয়েছিল

সহজ কথায়

জাদু বাস্তব একটি জিনিস, যার প্রভাব আছে; কল্পনা বা ভ্রম নয়। এর সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ হলো, **তা স্বয়ং নবী ﷺ-এর উপরেই ঘটেছিল** — তাঁর মনে হতো তিনি কোনো কাজ করেছেন, অথচ করেননি; শেষে আল্লাহ তাঁকে তার জায়গা জানিয়ে দিলেন আর তা বের করা হলো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জাদু ছিল এ অঞ্চলের প্রতিটি সভ্যতায় পরিচিত ও রমরমা একটি পেশা: বাবিল, মিসর, ইয়েমেন আর আরব উপদ্বীপ। জাদুকর ছিল মর্যাদা, সম্পদ আর প্রভাবের অধিকারী। আর নবী ﷺ-এর পক্ষে তাঁর উপর যা ঘটেছিল তা গোপন করা সহজই ছিল — কারণ কোনো মানুষের দাওয়াতের জন্য এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর নেই যে বলা হবে, জাদু তাঁকে কাবু করেছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে** আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, খুঁটিনাটি সবিস্তারে: জাদুকরের নাম (লাবিদ ইবনুল আসাম), জাদুর উপকরণ (চিরুনি, চুল আর খেজুরের মোচার খোল), তার জায়গা (যারওয়ান কূপ), তার প্রভাবের বিবরণ, আর কীভাবে তা বের করা হলো। **আহলুস সুন্নাহ একমত যে জাদুর বাস্তবতা ও প্রভাব আছে**, আর সেই প্রভাব ওহি বা রিসালাত পৌঁছে দেওয়াকে স্পর্শ করেনি — কেবল তাঁর ব্যক্তিগত দুনিয়াবি বিষয়গুলোতেই সীমিত ছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, যা আলিমগণ স্পষ্ট করে বলেছেন, কারণ বাণী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সুরক্ষা অটুট।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানকার প্রমাণটি বিরল ধরনের: **এমন একটি বর্ণনা যার বাহ্যিক অর্থ দাওয়াতের বাহকেরই ক্ষতি করে, তবু তা বর্ণিত ও সংরক্ষিত হয়েছে**। নবী ﷺ তা গোপন করেননি, তাঁর সাহাবিগণ তা চেপে যাননি, হাদিসবিদগণ তা বাদ দেননি — বরং মুসলিমদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ দুই কিতাব তা লিপিবদ্ধ করেছে। আর যে ব্যক্তি ধর্ম বানায়, সে নিজের সম্পর্কে এ কথা বর্ণনা করে না যে এক ইহুদির জাদু তাকে কাবু করেছিল। ঐতিহাসিক সমালোচকরা একে বলেন **বিব্রতকরতার মানদণ্ড**: যে বর্ণনা বর্ণনাকারীর ক্ষতি করে, তা তার উপকার করা বর্ণনার চেয়ে সত্যের বেশি কাছাকাছি। আর ঘটনাটি স্থায়ী একটি ফলও দিয়েছে: **আশ্রয়ের দুই সূরা**, যা আজ পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিমের হাতে-কলমে প্রতিকার।

131

হাতে-কলমে প্রতিকার

আশ্রয়ের দুই সূরা — প্রত্যেক মুসলিমের দুর্গ

> বলুন, আমি আশ্রয় নিচ্ছি ভোরের প্রতিপালকের কাছে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে ... আর গিঁটে ফুঁ দেওয়া নারীদের অনিষ্ট থেকে, আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।
>
> **সূরা ফালাক — আয়াত 1-5**

দুটি সূরা, যা নাজিল হয়েছে জাদু আর হিংসার অনিষ্ট থেকে মানুষকে রক্ষা করতে

সহজ কথায়

যখন জাদু ঘটল, তখন মানুষকে প্রতিকারহীন রাখা হয়নি। দুটি ছোট সূরা নাজিল হলো — **ফালাক আর নাস** — যাতে রয়েছে জাদু, হিংসা আর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জাদুগ্রস্ত হলে মানুষ আরেক জাদুকরের কাছে যেত তা খোলানোর জন্য — অর্থাৎ তারা এক অনিষ্টের চিকিৎসা করত তেমনই আরেক অনিষ্ট দিয়ে, ফলে জাদুকরদের প্রতি আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়ত আর আরও টাকা ঢালত। এই চক্রই গণক আর জাদুকরদের রুজি জুগিয়ে যেত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নবী ﷺ প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে নিজের উপর আশ্রয়ের দুই সূরা পড়তেন, দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিতেন আর তা দিয়ে শরীর মুছে নিতেন; আর রোগীদের উপরও সেগুলো পড়তেন (বুখারি ও মুসলিম)। তিনি উকবা ইবনে আমিরকে **প্রতি নামাজের পর** সেগুলো পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন: "আশ্রয়প্রার্থীরা এ দুটির মতো কিছু দিয়ে কখনো আশ্রয় চায়নি।" আর সহিহ হাদিসে এসেছে: "যে ব্যক্তি বিছানায় যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসি পড়ে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক তার উপর থাকে আর সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান তার কাছে ঘেঁষে না।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, এই প্রতিকার গোটা সমাজকাঠামোর কী করল। এটি জাদু থেকে রক্ষাকে **সরাসরি প্রত্যেক মানুষের নিজের হাতে** তুলে দিল: ছোট কয়েকটি বাক্য, যা শিশুও মুখস্থ করে ফেলে; কোনো মধ্যস্থ নেই, ফি নেই, আচার-অনুষ্ঠান নেই। এভাবে জাদুকর আর গণকদের কর্তৃত্ব আর ব্যবসা গোড়াতেই ধসে গেল। যে মানুষের উপর কর্তৃত্ব চায়, সে এমন কাজ করে না — বরং তার উল্টোটা করে। আর সূরাটির সবচেয়ে সূক্ষ্ম কথাটি: "**গিঁটে ফুঁ দেওয়া নারীদের**" — এটি হাতে-কলমে জাদুর সবচেয়ে প্রচলিত রূপটিরই বর্ণনা: গিঁট বাঁধা আর তাতে ফুঁ দেওয়া। বাইহাকি তাঁর *দালাইলুন নুবুওয়াহ* গ্রন্থে — এমন এক দুর্বল সনদে যা দলিল হয় না — এগারোটি গিঁটওয়ালা একটি সুতার কথা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তা সহিহ বুখারি ও মুসলিমে প্রমাণিত নয়। সেখানে প্রমাণিত হলো: একটি চিরুনি, চিরুনিতে ওঠা চুল আর খেজুরের পুরুষ মোচার খোল।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য

132 বাবিল — আর ইতিহাসের প্রাচীনতম জাদুর ফলক

আর তারা অনুসরণ করত সেসব বিষয়, যা সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলাইমান কুফরি করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল; তারা মানুষকে জাদু শেখাত, আর তাও যা বাবিলে দুই ফেরেশতার উপর নাজিল করা হয়েছিল।

সূরা বাকারা — আয়াত 102

খ্রিষ্টপূর্ব হাজার বছরেরও আগে লেখা মন্ত্র ও তাবিজ

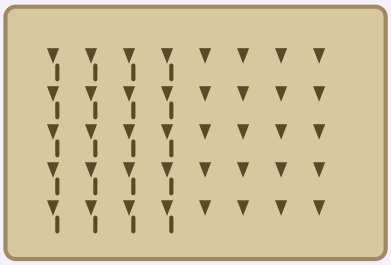

বাবিলের কীলকলিপির মাটির ফলক — জাদুঘরে সংরক্ষিত

ইরাকের মাটি থেকে বেরিয়েছে জাদুর পাঠের গোটা গোটা গ্রন্থাগার

সহজ কথায়

কুরআন জাদুকে একটি নির্দিষ্ট জায়গার সঙ্গে যুক্ত করেছে: **বাবিল**। আর প্রত্নতাত্ত্বিকরা ঠিক সেই মাটি থেকেই বের করেছেন **প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাদু-পাঠের সংগ্রহ**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কুরআন নাজিলের সময় বাবিল ছিল বিধ্বস্ত আর বিস্মৃত এক ধ্বংসস্তূপ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিত্যক্ত। আর কিউনিফর্ম লিপি তখন কেউ পড়তে পারত না — তা পুরোপুরি মরে গিয়েছিল। কাজেই দুনিয়ার সব রাজধানীর মধ্য থেকে জাদু শেখানোর কাজটিকে **বিশেষভাবে বাবিলের** সঙ্গে যুক্ত করা এমন এক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নির্দিষ্টকরণ, যা যাচাই করা যায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কিউনিফর্ম লিপির পাঠোদ্ধার হয় উনিশ শতকে। তখন বেরিয়ে এলো, মেসোপটেমিয়া — যার হৃৎপিণ্ড ছিল বাবিল — ছিল **প্রাচীন বিশ্বের জাদু, মন্ত্র আর তাবিজের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র**। সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কারগুলোর একটি হলো **মাকলু** নামের ফলক-ধারা, জাদু আর তা নষ্ট করা নিয়ে নয়টি পূর্ণ ফলক; আর শুরপু; আর মন্ত্র, জ্যোতিষ ও ভাগ্যগণনার হাজার হাজার ফলক। শুধু আশুরবানিপালের গ্রন্থাগারেই ছিল এমন শত শত ফলক। ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন, গোটা অঞ্চলে এসব বিদ্যা ছড়িয়ে পড়ার উৎস ছিল বাবিলই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ভৌগোলিক নির্দিষ্টকরণটিই যুক্তির মূল বিন্দু। কুরআন কেবল বলেনি "তারা জাদু শিখেছিল" — বরং **যে জন্মভূমি থেকে তা বেরিয়েছিল** তার নামও বলেছে। আর বারো শতাব্দী পরে দেখা গেল, সেই জন্মভূমিই জাদুর পাঠের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল। এর চেয়েও সূক্ষ্ম হলো **সুলাইমান আলাইহিস সালামের নির্দোষিতা**: "সুলাইমান কুফরি করেননি।" অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনিগুলো — আর পরবর্তী ইহুদি রচনাগুলোও — জাদুকে সুলাইমানের সঙ্গে জুড়ে দিত আর তাঁকে জাদুকরদের সর্দার বানাত। অথচ কুরআন এসে **একজন নবীকে সেই অপবাদ থেকে মুক্ত করল, যা আহলে কিতাব নিজেরাই তাঁর উপর চাপিয়েছিল** — যে তাদের কাছ থেকে ধার করে, সে ঠিক এর উল্টোটাই করে।

সূত্র Abusch – *The Magical Ceremony Maqlû* · Reiner – *Šurpu*

ইতিহাসে জাদু

133 ফেরাউনের জাদুকররা — আর ছুটে চলা রশির দৃশ্য

তিনি বললেন, বরং তোমরাই ছোঁড়ো। তখন হঠাৎ তাদের রশি আর লাঠিগুলো তাদের জাদুর প্রভাবে তাঁর মনে হলো যেন ছুটে চলছে।

সূরা ত্বা-হা — আয়াত 66

কুরআন জাদুকে বলছে চোখের উপর প্রভাব, নতুন কোনো সৃষ্টি নয়

সহজ কথায়

ফেরাউনের জাদুকররা রশি আর লাঠি নিয়ে এলো, আর তা মানুষের চোখে **ছুটে চলা সাপ** বলে মনে হলো। আর সূক্ষ্ম শব্দটি লক্ষ করুন: "**তাঁর মনে হলো**" — অর্থাৎ সেগুলো বদলে যায়নি; বদলেছিল দর্শকের উপলব্ধি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীন মিসরে জাদু ছিল তার গৌরবের চূড়ায়; তার নিজস্ব পুরোহিত, নিজস্ব পাঠশালা আর লিখিত গ্রন্থ ছিল। আর বিশ্বাস করা হতো, জাদুকর **সত্যিই বস্তুর রূপ পাল্টে দেয়**: লাঠিকে সাপ বানায়, মানুষকে পশু বানায়। এই বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সভ্যতাতেই প্রচলিত ছিল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কুরআন এই ধারণা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে আর জাদুর প্রভাবকে তিনটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করেছে: **উপলব্ধি ও ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব** ("তাঁর মনে হলো", "তারা মানুষের চোখে জাদু করল"), **অন্তর ও সম্পর্কের উপর প্রভাব** ("তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু শিখত, যা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত"), আর **শরীরে কষ্ট দেওয়ার প্রভাব**। কিন্তু **বস্তুর প্রকৃত রূপ পাল্টে দেওয়া** পুরোপুরি অস্বীকৃত। আর মনোবিজ্ঞান আজ পরামর্শ, সম্মোহন আর সমষ্টিগত দৃষ্টিভ্রম নিয়ে যা প্রতিষ্ঠা করেছে, এটি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"**উপলব্ধির উপর প্রভাব**" আর "**প্রকৃতি পাল্টে দেওয়া**" — এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, আর সেকালের সংস্কৃতি তা জানত না। জাদু নিয়ে ইসলামের অবস্থানকে আশপাশের সবকিছু থেকে এটিই আলাদা করে: এটি না এমন পূর্ণ অস্বীকার যা চোখে দেখা ঘটনাকে মিথ্যা বলে, না এমন স্বীকৃতি যে জাদুকর সৃষ্টি করে আর রূপ পাল্টে দেয়। আর মূসার নিজের মুজিজায় পার্থক্যটি লক্ষ করুন: তাঁর লাঠি তাদের বানানো জিনিসগুলো **গিলে ফেলেছিল** — সত্যিকারের গিলে ফেলা। কাজেই কুরআনে মুজিজা আর জাদুর পার্থক্য হলো: **প্রথমটি বাস্তবের বদল, দ্বিতীয়টি চোখের বদল**। আর এ কারণেই জাদুকররাই সবার আগে ঈমান এনেছিল — কারণ নিজেদের বিদ্যার সীমা তারাই সবচেয়ে ভালো জানত।

প্রমাণিত এক ঘটনা

134 যে শয়তান তিন রাত আবু হুরায়রার কাছে এসেছিল

সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কিছু বাক্য শেখাব যা দিয়ে আল্লাহ আপনার উপকার করবেন ... বিছানায় যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসি পড়বেন ... নবী ﷺ বললেন, সে আপনাকে সত্যই বলেছে, যদিও সে ভীষণ মিথ্যাবাদী। ওটা ছিল একটা শয়তান।

বুখারি বর্ণনা করেছেন — সহিহ

রমজানের সদকার গুদামে তিন রাত ধরে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা

সহজ কথায়

নবী ﷺ আবু হুরায়রাকে সদকার খাদ্য পাহারার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাতে একজন এসে তা থেকে চুরি করত, আর তিনি টানা তিন রাত তাকে ধরে ফেললেন। শেষ রাতে লোকটি তাঁকে **আয়াতুল কুরসি** শিখিয়ে দিয়ে বলল, এটি পড়লে কোনো শয়তান তাঁর কাছে ঘেঁষবে না। পরে নবী ﷺ তাঁকে জানালেন, ওটা ছিল একটা শয়তান।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

খাদ্যের গুদাম রাতে পাহারা দেওয়া সাধারণ ব্যাপার। আবু হুরায়রা প্রথমবার তাকে গরিব মানুষ ভেবে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর তা তিনবার ঘটল — আর প্রতিদিন সকালে তিনি নবী ﷺ-কে জানাতেন, আর তিনি বলতেন: "**সে আবার আসবে**" — আর সে আসত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঘটনাটি পূর্ণাঙ্গভাবে **সহিহ বুখারিতে** রয়েছে, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআনে "সূরা বাকারার ফজিলত" অধ্যায়ের অধীনে। এতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত আছে। প্রথমত, নবী ﷺ **প্রতিদিন সকালে আবু হুরায়রাকে বলে দিতেন যে লোকটি সেই রাতে আবার আসবে** — আর সে আসত। দ্বিতীয়ত, চূড়ান্ত রায়টি এসেছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি বাক্যে: "**সে আপনাকে সত্যই বলেছে, যদিও সে ভীষণ মিথ্যাবাদী**" — অর্থাৎ তথ্যটি সঠিক, যদিও বক্তা স্বভাবগতভাবেই মিথ্যাবাদী। তৃতীয়ত, ব্যবহারিক ফলটি দাঁড়াল **প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একটি অস্ত্র**: ঘুমের সময় আয়াতুল কুরসি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এ ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সেই **পদ্ধতি**, যা নবী ﷺ এই জগতের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে শিখিয়েছেন। তিনি ঘটনাটি অস্বীকারও করেননি, ভয়ংকর করেও তোলেননি; বরং **তথ্যটিকে তার নিজের বিচারেই যাচাই করেছেন, বক্তাকে দিয়ে নয়**। আর "সে সত্যই বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী" বাক্যটি সংবাদ-সমালোচনার একটি পূর্ণাঙ্গ নীতি। এরপর লক্ষ করুন, ফলাফল দাঁড়াল **কুরআনের একটি আয়াত, যা সবাই মুখস্থ করে** — কোনো আচার নয়, তাবিজ নয়, মানুষের মধ্যস্থতা নয়। গোটা ঘটনাটিই শেষ হয় সাধারণ মানুষকে নিজের রক্ষা নিজের হাতে তুলে দেওয়ায় — আর এই সুতোটিই এ অধ্যায়ের সবকিছু গেঁথে রেখেছে।

135

কারিন

প্রত্যেক মানুষের একজন কারিন আছে

আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই জিনদের মধ্য থেকে একজন কারিন নিযুক্ত আছে। তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গেও কি, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, আমার সঙ্গেও; তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন, ফলে সে আত্মসমর্পণ করেছে, সে আমাকে কেবল ভালোরই আদেশ দেয়।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

অন্তর্দ্বন্দ্বের এমন এক ব্যাখ্যা, যা খারাপ চিন্তাকে তার যথাস্থানে বসিয়ে দেয়

সহজ কথায়

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে **জিনদের মধ্য থেকে একজন কারিন** থাকে, যে তাকে মন্দের কুমন্ত্রণা দেয়। এতেই ব্যাখ্যা মেলে সেসব খারাপ চিন্তার, যা হঠাৎ আপনার মনে আসে অথচ আপনি চান না, পছন্দও করেন না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষ হয় প্রতিটি মনে-আসা চিন্তাকে নিজের বলে ধরে নিয়ে আত্মগ্লানিতে ডুবে যেত, নয়তো নিজের সব কাজ বাইরের কোনো শক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলত। চিন্তা আর কাজের মধ্যে পার্থক্য করে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নবী ﷺ এই সত্য সাব্যস্ত করে তারপর **অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্তে তাকে বেঁধে দিয়েছেন**: কারিন **কুমন্ত্রণা দেয়, বাধ্য করে না**; মানুষ **মনে-আসা চিন্তার জন্য পাকড়াও হয় না, যতক্ষণ না সে তা কাজে পরিণত করে** ("আল্লাহ আমার উম্মতের মনে যা আসে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তা করে বা বলে"); আর কুমন্ত্রণার তীব্রতা **ঈমানের আলামত, নষ্ট হয়ে যাওয়ার আলামত নয়** — সাহাবিগণ যখন তাঁদের মনে আসা কুমন্ত্রণার অভিযোগ করলেন, তিনি বললেন: "**এটাই খাঁটি ঈমান**", অর্থাৎ তা নিয়ে আপনাদের এই আঁতকে ওঠাই প্রমাণ করে আপনাদের অন্তর সুস্থ।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই ধারণার মানসিক প্রভাবটি দেখুন, আর আজকের অনেক মানুষের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিন। যার মনে কোনো বীভৎস চিন্তা আসে আর সে ভাবে তা তার নিজের গভীর সত্তা থেকেই উঠে এসেছে, সে নিজেকে নিয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে — আর ঠিক এটিই ঘটে **ধর্মীয় বিষয়কেন্দ্রিক অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারে**। এই ব্যাখ্যাটি **আপনার উপর যা চাপিয়ে দেওয়া হয়** আর **আপনি নিজে যা বেছে নেন** — এ দুটিকে আলাদা করে দেয়, আর রায় দেয় যে প্রথমটির জন্য আপনাকে হিসাব দিতে হবে না; বরং তার প্রতি আপনার ঘৃণাই আপনার সুস্থতার প্রমাণ। এরপর হাতে-কলমে প্রতিকারও দেয়: আশ্রয় চাওয়া আর থেমে যাওয়া, তর্ক চালিয়ে না যাওয়া। আর আধুনিক মনোচিকিৎসা অনুপ্রবেশকারী চিন্তার ব্যাপারে যা পরামর্শ দেয়, এটি তার খুব কাছাকাছি: তর্ক দিয়ে তার সঙ্গে লড়বেন না, আর নিজেকে তা দিয়ে চিনবেন না।

136

সে আদম-সন্তানের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে

নিশ্চয়ই শয়তান আদম-সন্তানের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

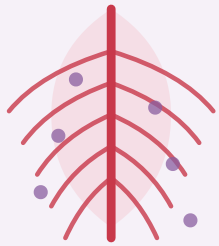

শরীরের কোনো জায়গাই তার নাগালের বাইরে নয়

"রক্তের চলাচল" — সম্ভাব্য সবচেয়ে ব্যাপক উপমা

শরীরে এমন কোনো জীবন্ত কলা নেই যা রক্ত ছাড়া চলে

সহজ কথায়

নবী ﷺ মানুষের ভেতরে শয়তানের নাগালকে বর্ণনা করেছেন **রক্তের চলাচলের মতো** বলে — অর্থাৎ তা আপনার প্রতিটি জায়গায় পৌঁছায়, কোনো অঙ্গই তা থেকে খালি নয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

রক্তসংবহন তখন জানা ছিল না। প্রচলিত ধারণা — গ্যালেনের মত, যা দেড় হাজার বছর ধরে চিকিৎসাশাস্ত্র শাসন করেছে — ছিল এই যে রক্ত যকৃতে তৈরি হয় আর হাত-পায়ে গিয়ে খরচ হয়ে যায়; এমন নয় যে তা **একটি পূর্ণ চক্র ঘুরে** শরীরের প্রতিটি অংশে পৌঁছায় আর আবার ফিরে আসে। এ কথা জানা যায়নি 1628 সালের আগে, উইলিয়াম হার্ভের হাতে; আর তা পূর্ণতা পায় 1661 সালে কৈশিক নালিকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সংবহনতন্ত্র **শরীরের প্রতিটি জীবন্ত কলাকে** পুষ্টি জোগায় কৈশিক নালিকার এমন এক জালের মধ্য দিয়ে, যার দৈর্ঘ্য আনুমানিক নয় হাজার থেকে উনিশ হাজার কিলোমিটার। আর যেখানে রক্তনালি ঢোকে না — যেমন চোখের কর্নিয়া আর অস্থিসন্ধির তরুণাস্থি — তা বেঁচে থাকে রক্ত থেকে যা চুইয়ে পৌঁছায় তার উপর ভর করে। শরীরের কোনো কিছুই তাকে ছাড়া চলে না। কাজেই পূর্ণ আর সর্বব্যাপী অনুপ্রবেশের উপমা হিসেবে "রক্তের চলাচল" বেছে নেওয়া **গোটা শরীরে সম্ভাব্য সবচেয়ে নিখুঁত উপমা** — আর এর নিখুঁত হওয়ার দিকটি ধরাই পড়ে না, যতক্ষণ না রক্তসংবহন জানা হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উপমাটি এলোমেলোভাবে বেছে নেওয়ার নয়। কেবল নৈকট্য বোঝানোই যদি উদ্দেশ্য হতো, তবে বলা হতো "ছায়ার মতো" কিংবা "নিঃশ্বাসের মতো" — দুটিই সেকালের ধারণার বেশি কাছাকাছি। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল **সর্বব্যাপিতা আর প্রতিটি অংশে ভেদ করে পৌঁছানো**, আর শরীরে এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র রক্তেই সত্য হয়ে ওঠে — এমন এক বৈশিষ্ট্য যা দশ শতাব্দী পরের আগে জানা যায়নি। আর নবী ﷺ এর উপর যে ব্যবহারিক শিক্ষা দাঁড় করিয়েছেন তা লক্ষ করুন: তিনি কথাটি বলেছিলেন যখন রাতে সফিয়্যাকে মসজিদ থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন; দুজন লোক পাশ দিয়ে গিয়ে দ্রুত হাঁটা ধরল, তিনি তাদের থামিয়ে বললেন: "আপনারা ধীরে চলুন; ইনি সফিয়্যা বিনতে হুয়াই।" অর্থাৎ তিনি নীতিটিকে **কুধারণা ওঠার আগেই নিজের থেকে তা সরিয়ে দেওয়ার** কারণ বানিয়েছেন — এটি ভয় দেখানোর নয়, স্বচ্ছতার শিক্ষা।

সূত্র Harvey – *De Motu Cordis*, 1628 · Malpighi – the capillaries, 1661

137 নজর সত্য — আর সাহাবিদের সামনেই ঘটে যাওয়া এক ঘটনা

নজর সত্য; কোনো কিছু যদি তাকদিরকে ছাড়িয়ে যেতে পারত, তবে নজরই তাকে ছাড়িয়ে যেত। আর আপনাদের কাছে গোসলের অনুরোধ করা হলে গোসল করুন।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

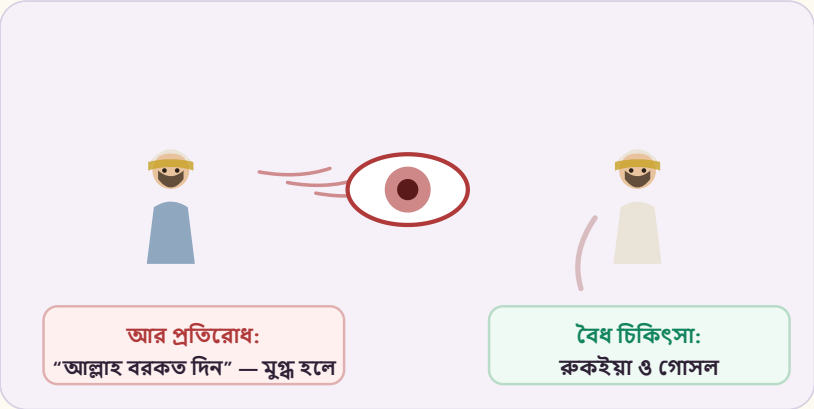

সাহল ইবনে হুনাইফ ও আমির ইবনে রাবিআর ঘটনা — বর্ণনা করেছেন মালিক, আহমাদ ও নাসায়ি

সহজ কথায়

"নজর সত্য" — অর্থাৎ মুগ্ধতা বা হিংসার দৃষ্টি সত্যিই ক্ষতি করতে পারে। আর বিষয়টি প্রতিকারহীন রাখা হয়নি: **রুকইয়া আর গোসল**; আর প্রতিরোধ এভাবে যে, কোনো কিছু ভালো লাগলে মুগ্ধ ব্যক্তি যেন বরকতের দোয়া করে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরব আর অন্যদের মধ্যে নজরকে ভয় করা হতো, আর তারা তা ঠেকাত তাবিজ, পুঁতি, কবচ, হাড় ঝোলানো আর পশুর চোখ দিয়ে। অর্থাৎ তারা এক বিশ্বাসের মোকাবিলা করত আরেক কুসংস্কার দিয়ে, আর তার জন্য দামও দিত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বিখ্যাত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন মালিক তাঁর মুয়াত্তায়, আর আহমাদ ও নাসায়ি: **সাহল ইবনে হুনাইফ** গোসল করছিলেন, **আমির ইবনে রাবিআ** তাঁকে দেখে বললেন: "আজকের মতো এমন কিছু আমি দেখিনি, আড়ালে রাখা কুমারীর গায়ের চামড়াও এমন নয়" — আর সাহল সেখানেই লুটিয়ে পড়লেন। নবী ﷺ-কে জানানো হলে তিনি বললেন: "**আপনাদের কেউ কেন তার ভাইকে হত্যা করে? সে বরকতের দোয়া করল না কেন?**" এরপর তিনি আমিরকে ওজু করার আদেশ দিলেন আর সেই পানি সাহলের উপর ঢেলে দেওয়া হলো — সাহল সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আর এ সবই ঘটেছিল **সফরে একদল সাহাবির চোখের সামনে**।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এ ঘটনার তিনটি দিকে থামা দরকার। প্রথম: **যার নজর লেগেছিল তিনি হিংসুক বা বিদ্বেষী ছিলেন না**, বরং ছিলেন মুগ্ধ ও স্নেহশীল — আর এতেই ভেঙে যায় সেই প্রচলিত ধারণা যে নজর কেবল শত্রুর কাছ থেকেই লাগে। দ্বিতীয়: প্রতিকারটি এসেছিল **যার নজর লেগেছে তার দিক থেকে, আক্রান্তের দিক থেকে নয়** — নজরদাতা গোসল করেন আর সেই পানি আক্রান্তের উপর ঢালা হয়। এটি সেসব আচারের ঠিক উল্টো, যা আক্রান্তের গায়ে তাবিজ বাঁধত। তৃতীয় — আর এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ —: নবী ﷺ **তাবিজকে কঠোরভাবে হারাম করেছেন** ("যে তাবিজ ঝোলাল, সে শিরক করল") আর তার বদলে দিয়েছেন সহজ, বিনামূল্যের, হাতে-কলমে একটি প্রতিকার। এভাবে তিনি একই সঙ্গে ঘটনাটি সাব্যস্তও করেছেন আর তার সঙ্গে জড়ানো কুসংস্কার বাতিলও করেছেন — গোটা অধ্যায়জুড়ে এটিই ধরন।

প্রমাণিত অধীনতা

138 সুলাইমান ও তাঁর অধীন জিনেরা

আর শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু ছিল যারা তাঁর জন্য ডুব দিত এবং এ ছাড়া অন্য কাজও করত; আর আমিই ছিলাম তাদের রক্ষক

সূরা আম্বিয়া — আয়াত 82

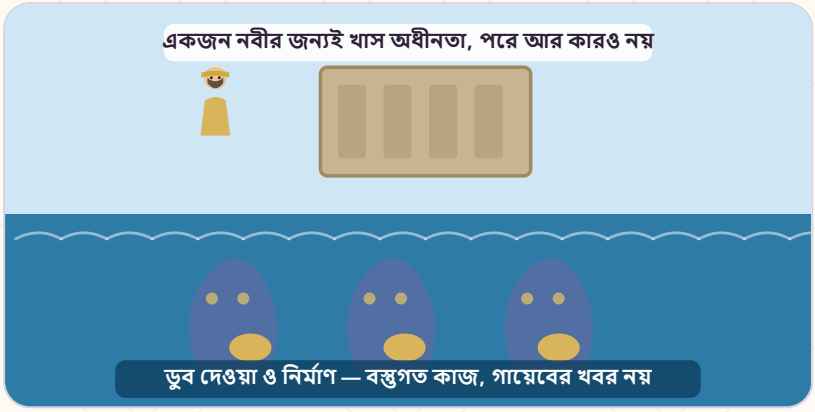

নির্দিষ্ট ও সীমিত কাজ: ডুব দেওয়া, মুক্তা তোলা এবং নির্মাণ

সহজ কথায়

আল্লাহ সুলাইমান আলাইহিস সালামের অধীন করে দিয়েছিলেন জিনের এক দল, যারা তাঁর জন্য কাজ করত: **সমুদ্রে ডুব দিত এবং ইমারত গড়ত**। এটি ছিল কেবল তাঁরই জন্য খাস মুজিযা; তিনি রবের কাছে দোয়া করেছিলেন, যেন তাঁর পরে আর কারও জন্য এটি না হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সেই অঞ্চলের প্রচলিত উপকথাগুলো সুলাইমানের দিকে জাদু এবং কালাম ও তাবিজের সাহায্যে রুহের উপর কর্তৃত্বের নিসবত করত — যা জাদুকরেরা বংশপরম্পরায় পেত। তাঁর নামে রচিত বইপত্রও এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে চলত — সবই বানানো ও মিথ্যা।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কুরআন বিষয়টিকে কঠোর শর্তে বেঁধে দিয়েছে। প্রথমত, এই অধীনতা ছিল **কেবল আল্লাহর অনুমতিতে**, কোনো জাদুবিদ্যায় নয়: "আর জিনদের মধ্যে কেউ কেউ **তার রবের অনুমতিক্রমে** তাঁর সামনে কাজ করত"। দ্বিতীয়ত, কাজগুলো ছিল **বস্তুগত ও সীমিত**: ডুব দেওয়া, নির্মাণ ও বহন — গায়েবের কোনো জ্ঞান নয়, তাকদিরে কোনো হস্তক্ষেপ নয়। তৃতীয়ত — এবং এটিই সবচেয়ে স্পষ্ট — কুরআন এই ঘটনার ভেতরেই **জিনদের গায়েব না-জানার কথা** ঘোষণা করেছে: সুলাইমান লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় ইন্তিকাল করার পরও তারা কাজ করে যাচ্ছিল, তাঁর মৃত্যুর খবরই তারা জানত না — "অতঃপর যখন তিনি পড়ে গেলেন, তখন জিনদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে তারা গায়েব জানলে এই লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে পড়ে থাকত না"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই বিস্ময়কর বৈপরীত্যটি লক্ষ করুন: যে কাহিনি জিন বশ করার সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন হতে পারত, সেটিকেই বানিয়ে দেওয়া হলো **তাদের গায়েব জানতে না পারার চূড়ান্ত প্রমাণ**। যে জিনেরা ডুব দিত আর ইমারত গড়ত, তারা নিজেদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির মৃত্যুর খবরই জানল না! গণকবৃত্তিকে মহিমান্বিত করা এক সমাজে গ্রন্থটি মানুষের রচনা হলে সে নিজের হাতে, একই আয়াতে, নিজের কিংবদন্তি ভেঙে দিত না। তারপর সুলাইমান দোয়া করলেন: "**আর আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমার পরে আর কারও জন্য শোভা পাবে না**" — এতে তাঁর পরে জিন বশ করার দাবিদার প্রত্যেকের সামনে দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। জাদুকরেরা যে কাহিনি দলিল হিসেবে পেশ করে, সেটিই আসলে তাদের দাবির সবচেয়ে বড় খণ্ডন।

আড়ি পেতে শোনা

139 নবুয়তের পর গণকবৃত্তি থেমে গেল কেন?

আর আমরা আকাশ স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম তা কঠোর প্রহরী ও জ্বলন্ত উল্কায় ভরা। আর আমরা তো সেখানে শোনার জন্য নানা ঘাঁটিতে বসতাম; কিন্তু এখন কেউ কান পাতলে সে তার জন্য ওঁত পেতে থাকা এক জ্বলন্ত উল্কা পাবে

সূরা আল-জিন — আয়াত ৪-৯

লক্ষণীয় এক সামাজিক ঘটনা: নবুয়তের সূচনায় গণকবৃত্তির পতন

সহজ কথায়

গণকেরা এমন কিছু খবর দিত যা কখনো কখনো সত্য হয়ে যেত, কারণ শয়তানেরা আকাশের সংবাদ থেকে কিছু শুনে এসে তাদের কানে ঢেলে দিত। নবী ﷺ প্রেরিত হওয়ার পর **তাদের সেই সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হলো**, ফলে উৎসই কেটে গেল এবং তাদের পেশা বাতিল হয়ে গেল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

গণকবৃত্তি ছিল আরব উপদ্বীপের একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান: গণকের ছিল মর্যাদা, অর্থ ও কর্তৃত্ব; বিবাদ মীমাংসায় তার কাছে যাওয়া হতো, গোপন বিষয় তাকে জিজ্ঞেস করা হতো। সবচেয়ে প্রসিদ্ধদের মধ্যে ছিল সাতিহ, শিক্ক ও সাওয়াদ। মাঝেমধ্যে তাদের কথা মিলে যাওয়াই তাদের মর্যাদা টিকিয়ে রাখত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঐতিহাসিক সূত্র ও সিরাতগ্রন্থগুলোতে আছে, নবী ﷺ-এর নবুয়তের সময় গণকেরা নিজেরাই **খবর কেটে যাওয়ার অভিযোগ করেছিল**, এবং তাদের অনেকে নিজের গোত্রকে তা জানিয়েছিল — বরং কারও কারও ইসলাম গ্রহণের কারণই ছিল এটি। ঐতিহাসিকভাবে লক্ষণীয়, সামাজিক জীবনের একটি স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের পর **পুরোনো অর্থে গণকবৃত্তি উপদ্বীপ থেকে প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়**। আর এর প্রক্রিয়াটি বুখারি ও মুসলিম উভয়েই বর্ণিত: "সে তা নিচের জনের কাছে ফেলে দেয়... তারপর তারা এর সঙ্গে একশত মিথ্যা মিশিয়ে দেয়"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

নবী ﷺ কেবল নিষেধ করেই থেমে যাননি, বরং **ঘটনার রহস্য এমনভাবে খুলে দিয়েছেন, যা একে ভেতর থেকেই বাতিল করে দেয়**। তাঁকে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: "ওরা কিছুই নয়"। তারা বলল: কিন্তু ওরা তো কখনো কখনো আমাদের এমন কথা বলে, যা সত্য হয়। তিনি ﷺ বললেন: "**সত্যের সেই একটি কথা জিন ছোঁ মেরে নিয়ে তার সঙ্গীর কানে ঢেলে দেয়, তারপর তারা এর সঙ্গে একশত মিথ্যা মিশিয়ে দেয়**"। আজ মনোবিজ্ঞান যাকে **"কনফার্মেশন বায়াস" তথা নিশ্চয়ন-পক্ষপাত** বলে, এ তারই অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা: মানুষ একটিমাত্র মিলে-যাওয়া কথা মনে রাখে আর একশত ব্যর্থতা ভুলে যায়। তিনি গণকবৃত্তিকে নিছক অস্বীকার করে নয়, বরং এর ভিত্তিতে থাকা সাংখ্যিক কৌশল উন্মোচন করে বাতিল করেছেন — আর ঠিক এই যুক্তিই আজ বিজ্ঞান জ্যোতিষ ও ভাগ্যগণনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

140 হে সারিয়া... পাহাড়!

উমর মিম্বরে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন: হে সারিয়া, পাহাড়! ... দূত বলল: আমরা উমরের আওয়াজ শুনতে পেলাম, তাই পাহাড়ের দিকে পিঠ ঠেকালাম, আর আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করলেন

বাইহাকি, ইবনে আসাকির ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন — একদল আলিম হাসান বলেছেন

আওয়াজ পৌঁছাল... ফিরে এসে সেনারা তা সত্য বলল

তাবিয়িদের বর্ণিত এক কারামত, আলিমগণ যা নিজেদের গ্রন্থে বহন করে এনেছেন

সহজ কথায়

উমর ইবনুল খাত্তাব মদিনায় জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ চিৎকার করে বললেন: **"হে সারিয়া... পাহাড়!"** সারিয়া তখন শত শত মাইল দূরে এক বাহিনীর সেনাপতি। বাহিনী ফিরে এসে বলল: আমরা উমরের আওয়াজ শুনেছি, তাই পাহাড়ের আশ্রয় নিয়েছি এবং জয়ী হয়েছি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মদিনা আর রণাঙ্গনের মধ্যে উটে চড়া দূত ছাড়া যোগাযোগের কোনো উপায় ছিল না, তাতে লাগত কয়েক সপ্তাহ। খুতবা হচ্ছিল মদিনার সব মানুষের সামনে। তারা ডাকটি শুনেছিল, অবাক হয়েছিল, কিন্তু তখন এর অর্থ বোঝেনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

খবরটি বাইহাকি তাঁর "দালাইলুন নুবুওয়াহ"-এ, ইবনে আসাকির "তারিখু দিমাশক"-এ, আর আবু নুআইম, ইবনুল আসির প্রমুখ একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সূত্রগুলোর সমষ্টির ভিত্তিতে একদল আলিম একে হাসান বলেছেন; ইবনে হাজার, ইবনে কাসির ও ইবনে তাইমিয়া একে উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত **সাহাবিদের কারামতের** মধ্যে এটি অন্যতম প্রসিদ্ধ। এর সমতুল্য ঘটনাও প্রমাণিত: **আলা ইবনুল হাদরামি** ও তাঁর বাহিনী পানির উপর দিয়ে উপসাগর পেরিয়ে দারিনে পৌঁছেছিলেন; **খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ** বিষ পান করেছিলেন, তা তাঁর ক্ষতি করেনি; আর **সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস** নবী ﷺ-এর দোয়ার বরকতে দোয়া-কবুল হওয়া ব্যক্তি ছিলেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

মুজিযা ও কারামতের পার্থক্য এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। মুজিযা ঘটে নবীর হাতে, চ্যালেঞ্জ হিসেবে এবং নবুয়তের প্রমাণ হিসেবে; আর কারামত ঘটে নেককারের হাতে, **কোনো চ্যালেঞ্জ ছাড়া, কোনো দাবি ছাড়া**। এ কারণেই কারামত চাওয়া হয় না, তা নিয়ে গর্বও করা হয় না, আর যাঁর হাতে তা ঘটে, তাঁর জন্য এর উপর কোনো দাবি দাঁড় করানো বৈধ নয়। যে একে চায় এবং একে উপার্জনের পথ বানায়, সে-ই এ থেকে সবচেয়ে দূরে। আজ "আধ্যাত্মিক শক্তি", "ফতহ" ও "কাশফ" নামে যা কেনাবেচা হয়, ইসলামকে তা থেকে আলাদা করে ঠিক এই মানদণ্ডটিই। উমরকে তাঁর সেই ডাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কোনো ব্যাখ্যা দেননি — কারামতের অধিকারীদের অবস্থান এটিই।

141

অপরিহার্য পার্থক্য

সব রোগ জিনের আছর নয়

হে আল্লাহর বান্দাগণ, চিকিৎসা গ্রহণ করুন; কারণ আল্লাহ এমন কোনো রোগ রাখেননি যার ওষুধ রাখেননি — কেবল একটি রোগ ছাড়া: বার্ধক্য

আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন — সহিহ

প্রথমে: চিকিৎসকের কাছে যান

- দেহগত মৃগীরোগ
- ভিটামিনের ঘাটতি
- গ্রন্থির ব্যাধি
- পরিচিত মানসিক রোগ
- ঘুমের অভাব ও ক্লান্তি

তারপর শরিয়তসম্মত রুকইয়াহ

- কুরআন পড়া হবে, চড়া ফি ছাড়া
- কোনো আচার নয়, ধূপও নয়
- নাম-মায়ের নাম জিজ্ঞাসা নয়
- নারীর সঙ্গে নির্জনতা নয়
- আর রোগী নিজেই পড়বে

এই নিয়ম যে ভাঙে, সে ভণ্ড — রুকইয়াকারী নয়

সঠিক ক্রম: আগে চিকিৎসা, তারপর শর্তসাপেক্ষে রুকইয়াহ

সহজ কথায়

ইসলাম জিনের আছর ও জাদুকে সত্য বলে মেনেছে, **কিন্তু প্রতিটি রোগকে সেগুলোর ফল বানায়নি**। বরং আগে চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে, আর রুকইয়াহকে বানিয়েছে এমন কুরআন পাঠ, যা রোগী নিজেই নিজের উপর পড়বে — কোনো মধ্যস্থ ছাড়া, কোনো ফি ছাড়া, কোনো আচার ছাড়া।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ইসলামের আগে জাতিগুলো অধিকাংশ রোগকে রুহ ও শয়তানের দিকে ফেরাত, ফলে রোগীর চিকিৎসা হতো নানা আচার, জিনের উদ্দেশে বলি আর তাবিজ দিয়ে। ইউরোপে এ ধারা চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, এমনকি সতেরো শতকে জাদুর অভিযোগে নারীদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে। মানসিক রোগীদের সঙ্গেও আচরণ করা হতো আছরগ্রস্তদের মতো।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নবী ﷺ স্পষ্ট ভাষায় চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: "**প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে**"; তিনি মধু, হিজামা ও কালোজিরা ব্যবহার করেছেন এবং সাহাবিদের জন্য নির্দিষ্ট ওষুধ বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "আরোগ্য তিনটিতে: মধুর শরবত, হিজামার ছুরি, আর আগুনের দাগ"। উবাই ইবনে কাবের কাছে তিনি **একজন চিকিৎসক** পাঠিয়েছিলেন, যিনি তাঁর একটি শিরা কেটে তারপর তাতে দাগ দিয়েছিলেন (মুসলিম)। আর রুকইয়াহর ব্যাপারে আলিমদের শর্ত তিনটি: তা হবে আল্লাহর কালাম বা তাঁর নামসমূহ দিয়ে; হবে আরবি ভাষায়, নয়তো এমন ভাষায় যার অর্থ জানা যায়; আর বিশ্বাস থাকতে হবে যে এটি উপায়মাত্র, নিজে থেকে কার্যকর কিছু নয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই মানদণ্ডই মানুষকে দুটি বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। প্রথমটি: দৈহিক রোগকে আছর মনে করে **চিকিৎসা ছেড়ে দেওয়া** — এতে বহু মানুষ মারা গেছে। দ্বিতীয়টি: **ভণ্ডদের হাতে পড়া**, যারা ভয়কে কাজে লাগিয়ে সম্পদ ও সম্ভ্রম লুটে নেয়। এ কারণেই নবী ﷺ এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর হয়েছেন: "**যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ রাত তার নামাজ কবুল হবে না**", এবং "**যে গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মদের উপর যা নাজিল হয়েছে তা অস্বীকার করল**"। বাস্তবতা প্রমাণের জন্য যে দরজা খোলা হয়েছিল, **শোষণের সামনে তা শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে**। আর যে রাকি আপনার নাম ও আপনার মায়ের নাম জানতে চায়, কিংবা বলির পশু, ব্যবহৃত জিনিস বা মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে — নবী ﷺ হুবহু তার সম্পর্কেই সতর্ক করেছেন।

সূত্র American Psychiatric Association – *DSM-5*

ইতিহাসের সাক্ষ্য

142 প্রতিটি জাতিই এই জগৎকে চিনেছে

যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন: হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা তো মানুষের অনেককে বশে এনেছ। মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে: হে আমাদের রব, আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি

সূরা আল-আনআম — আয়াত 128

সর্বজনীন এক মানবিক ঘটনা, যার পূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা নেই

বাবিল	মিসর	গ্রিস	ভারত	চীন
শেদু	আখু	দাইমোন	ভূত	কুয়েই

যেসব জাতিকে কাল, স্থান বা ভাষা এক করেনি... তবু একমত হলো

চোখে অদৃশ্য এক বুদ্ধিমান জগতের বিশ্বাস পরিচিত প্রতিটি সভ্যতাতেই আছে

সহজ কথায়

ইতিহাসের প্রতিটি জাতি — ব্যাবিলন, মিসর, গ্রিস, ভারত, চীন এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার জনগোষ্ঠী — **বুদ্ধিসম্পন্ন অদৃশ্য সৃষ্টির** অস্তিত্ব জেনেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে তাদের ডেকেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এই জনগোষ্ঠীগুলো ছিল পরস্পর থেকে বহু দূরে, একে অন্যকে চিনত না; তাদের ছিল না অভিন্ন ভাষা, ছিল না বাণিজ্য। তবু তাদের ধারণা মিলে গেছে বিস্ময়করভাবে: বুদ্ধিমান সত্তা, যারা বিরান ও প্রান্তরে থাকে, ক্ষতিও করে উপকারও করে, বলি দিয়ে যাদের তুষ্ট করা হয়, আর যাদের মধ্যে ভালোও আছে মন্দও আছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নৃতত্ত্ববিদেরা একে বলেন **"সাংস্কৃতিক সর্বজনীনতা"** (Cultural Universal): যা ব্যতিক্রমহীনভাবে পরিচিত সব সমাজেই দেখা যায়। বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মিক সত্তায় বিশ্বাস এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণগুলোর একটি, আর জর্জ মারডক তাঁর বিখ্যাত তালিকায় এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। নামগুলো: ব্যাবিলনে "শেদু", মিসরে "আখু", গ্রিকদের কাছে "ডাইমন", ভারতে "ভূত", আর আরবদের কাছে "জিন"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটিকে এখানে নিজে থেকেই চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হচ্ছে না — কেবল মতৈক্য দিয়ে সত্যতা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এটি **প্রচলিত ব্যাখ্যাটিকে খণ্ডন করে**: বলা হয়, জিন একটি আরব কুসংস্কার, কুরআন নিজের পরিবেশ থেকে তা তুলে নিয়েছে। অথচ এই বিশ্বাস আরবদের চেয়ে হাজার হাজার বছরের পুরোনো এবং তাদের সীমা ছাড়িয়ে গোটা মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। আরও সূক্ষ্মভাবে বললে, কুরআন **প্রচলিত ধারণাটি নকল করেনি, বরং সংশোধন করেছে**: সব জাতিই তাদের পূজা করত ও বলি দিত — কুরআন তা হারাম করেছে এবং শিরক নাম দিয়েছে; তারা তাদের দিকে গায়েবের জ্ঞান নিসবত করত — কুরআন তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে; তারা তাদের বানিয়েছিল আধা-দেবতা — কুরআন তাদের বানিয়েছে **দায়িত্বপ্রাপ্ত এক সৃষ্টি, যাদের হিসাব হবে যেমন আমাদের হবে**। অস্তিত্বের মূলে মিল, বিধানে পূর্ণ অমিল — এ তো সংশোধনকারীর কাজ, নকলকারীর নয়।

সূত্র Murdock (1945) – the common denominator of cultures · Donald E. Brown – *Human Universals*, 1991

143

গায়েবের সীমা

পাঁচ বিষয় জানেন কেবল আল্লাহ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান; তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জানেন গর্ভাশয়ে যা আছে। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, আর কেউ জানে না কোন ভূমিতে সে মারা যাবে

সূরা লুকমান — আয়াত 34

গায়েবের দরজা বন্ধ — দাবি আগেই খারিজ

- কিয়ামতের সময়
- বৃষ্টি নামা
- গর্ভাশয়ে যা আছে
- কালকের উপার্জন
- মৃত্যুর ভূমি

এর একটির জ্ঞান দাবি করলেই কুরআনের ভাষ্যে সে মিথ্যাবাদী
এতে নবি, ওলি বা জিন কেউই বাদ নয়

চূড়ান্ত এক সীমা, যা প্রত্যেক দাবিদারের পথ কেটে দেয়

সহজ কথায়

এই অধ্যায়ে যা কিছু গেল, তার পর কুরআন দরজাটি শক্ত করে বন্ধ করে দেয়: **পাঁচটি বিষয় আছে, যা একমাত্র আল্লাহই জানেন**। সুতরাং যে এগুলোর কোনো একটির জ্ঞান দাবি করে — সে যেই হোক — সে মিথ্যাবাদী।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

গণকবৃত্তি, ভবিষ্যদ্বাণী, জ্যোতিষ ও রাশিফল ছিল প্রতিটি সভ্যতার রমরমা পেশা। গণককে গায়েব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো, সে উত্তর দিত; কখনো মিলে যেত, তাতে তার মর্যাদা বাড়ত। এগুলো ছিল বিরাট উপার্জন ও প্রভাবের দরজা।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

এই পাঁচটি আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে, আর নবী ﷺ ইবনে উমরের হাদিসে (বুখারি) এগুলোর নাম দিয়েছেন "**গায়েবের পাঁচ চাবি**"; জিবরিলের হাদিসেও "পাঁচটি বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না" বলার সময় তিনি এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করেছেন। লক্ষ করুন, এগুলো ধোঁয়াটে অস্পষ্ট কোনো বিষয় নয়, বরং **যাচাইযোগ্য**: ইতিহাসে কেউ কিয়ামতের দিন নির্ধারণ করতে পারেনি, কেউ নিশ্চিতভাবে বৃষ্টি নামার কথা বলতে পারেনি (আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্ভাবনা দেয়, নিশ্চয়তা নয়), আর গর্ভাশয়ে যা আছে তার পরিণতি, রিজিক, আয়ু ও আমল **পুরোপুরি** কেউ জানতে পারেনি — আর আলট্রাসাউন্ডে লিঙ্গ জানা তো গঠিত হওয়ার পর যা প্রকাশ পেয়েছে তা দেখা, তার আগের গায়েব জানা নয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই সীমাটিই গোটা অধ্যায়ের **নিরাপত্তা-কপাট**। কারণ আগে যা কিছু গেল — জিন, জাদু, বদনজর ও কারামত সাব্যস্ত করা — তা প্রতারণা ও শোষণের বিশাল দরজা খুলে দিতে পারত। তাই এই আয়াত এল প্রত্যেক দাবিদারের পথ আগেভাগেই কেটে দিতে: **যে আপনাকে আপনার আগামীকালের খবর দেয়, সে মিথ্যাবাদী** — অন্য সব ব্যাপারে সে যতই সত্যবাদী মনে হোক। নবী ﷺ নিজেই আদিষ্ট হয়েছিলেন নিজের সম্পর্কে তা ঘোষণা করতে: "**বলুন, আল্লাহ যা চান তা ছাড়া নিজের কোনো উপকার বা ক্ষতির মালিক আমি নই; আমি যদি গায়েব জানতাম, তবে প্রচুর কল্যাণ জমা করে নিতাম**"। অর্থাৎ যিনি এই দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তাঁর যুগের গণকেরা যা দাবি করত, তিনি **সবার আগে নিজের থেকেই তা অস্বীকার করেছেন**। ক্ষমতালোভী কোনো দাবিদার এমন করে না।

144

বাস্তব সুরক্ষা

আপনার দৈনন্দিন দুর্গ... যে কথার কোনো দাম নেই

যে সন্ধ্যায় বলে: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে — সে রাতে কিছুই তার ক্ষতি করবে না

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

1	2	3	4
আয়াতুল কুরসি	আশ্রয়ের সূরা	সকালের জিকির	বিসমিল্লাহ
ঘুমানোর সময়	সকালে তিনবার	আর সন্ধ্যায়	ঢোকার সময়
সকাল পর্যন্ত একজন রক্ষক	এমন আশ্রয় আর নেই"	"কোনো ক্ষতি হবে না"	"তোমাদের ঠাঁই নেই"

মধ্যস্থ নেই, ফি নেই, আচার নেই — সবার নাগালে

সহিহ হাদিসে প্রমাণিত চারটি জিকির, যা বাকি সবকিছুর প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়

সহজ কথায়

এই জগতের মুখোমুখি মানুষকে নিরস্ত্র ছেড়ে দেওয়া হয়নি। নবী ﷺ তাকে দিয়েছেন **ছোট ছোট জিকির, যা শিশুও মুখস্থ করতে পারে** — যা সে নিজেই বলবে, কোনো মধ্যস্থ ছাড়া, অর্থ ছাড়া, আচার ছাড়া।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জিন ও হিংসা থেকে সুরক্ষার জন্য দরকার হতো **একজন মধ্যস্থের**: গণক, জাদুকর কিংবা তাবিজ-বিক্রেতা। মানুষ এর জন্য অর্থ ও বলি দিত, আর সন্তানদের ও পশুদের গলায় নানা জিনিস ঝুলিয়ে সেগুলোর সঙ্গে হৃদয় বেঁধে রাখত। এ ছিল এমন এক ব্যবস্থা, যা পরনির্ভরতা ও ভয় উৎপাদন করত আর কর্তাদের মুনাফা জোগাত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সহিহ হাদিসে প্রমাণিত জিকির অনেক; সবচেয়ে প্রসিদ্ধগুলো: ঘুমানোর সময় **আয়াতুল কুরসি** — "আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক আপনার উপর থাকবে, আর কোনো শয়তান আপনার কাছে আসবে না"; সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার **সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস** — "এগুলোই আপনার জন্য সবকিছুর বিরুদ্ধে যথেষ্ট"; **"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে"** — "সে রাতে কোনো কিছুই তার ক্ষতি করবে না"; **ঘরে প্রবেশের ও খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা** — "তোমাদের জন্য রাতযাপনও নেই, রাতের খাবারও নেই"; আর ঘরে **সূরা বাকারা** পড়া — "এতে শয়তান ঢোকে না"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই দ্বীন যে কাঠামোটি দাঁড় করিয়েছে, তা একবার দেখুন এবং আগে যা ছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে নিন। এটি সুরক্ষাকে **মধ্যস্থের একচেটিয়া দখল** থেকে সরিয়ে **প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ** বানিয়ে দিয়েছে। মুসলিমের কোনো রাকি লাগে না, গণক লাগে না, তাবিজ লাগে না, ফি লাগে না — কেবল কিছু কথা, যা সে মুখস্থ করে নিজেই বলে; আর তা গরিবের নাগালে যতটা, ধনীর নাগালেও ততটাই। এতে ভণ্ডামির অর্থনীতি গোড়া থেকেই ভেঙে পড়ে, আর তার জায়গায় বিকল্প কোনো কর্তৃত্বও বসানো হয় না। তারপর লক্ষ করুন, এই জিকিরগুলোর সবই **আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা, জিনের নয়, কোনো নামেরও নয়** — অর্থাৎ যে মুহূর্তে এগুলো রক্ষা করছে, সেই মুহূর্তেই তাওহিদ শেখাচ্ছে। শরিয়তসম্মত রুকইয়াহ আর বাকি সবকিছুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি এটিই।

অধ্যায়ের সারকথা

145

এ বিষয়ে ভারসাম্য

মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক জিনের কিছু লোকের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের পাপের বোঝা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল

সূরা আল-জিন — আয়াত 6

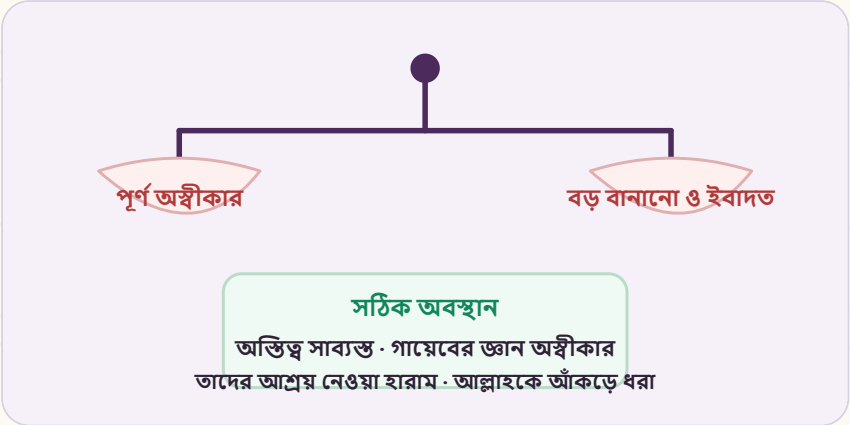

এক দিকে ওহিকে মিথ্যা বলা অস্বীকার, অন্য দিকে শিরকে পৌঁছে দেওয়া বাড়াবাড়ি

সহজ কথায়

গায়েবের জগৎ বাস্তব, তবে তার সঙ্গে আচরণের **সূক্ষ্ম ভারসাম্য** আছে: আমরা একে অস্বীকার করি না, করলে আল্লাহর দেওয়া খবরকেই মিথ্যা বলা হয়; আবার একে বড়ও বানাই না, বানালে শিরক, ভয় ও প্রতারণায় পড়তে হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীনকালে মানুষ এক প্রান্তে পড়েছিল: বড় বানানো, আশ্রয় চাওয়া, বলি দেওয়া আর গণকবৃত্তি। আর আজ বহু মানুষ পড়েছে অন্য প্রান্তে: চোখে যা দেখা যায় না তার সবই অস্বীকার। দুই প্রান্তই ভুল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কুরআন ও সুন্নাহ যে অবস্থান নির্ধারণ করেছে, তাতে পাঁচটি মূলনীতি একসঙ্গে আছে, একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না: **অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা** — এ তো গায়েবে ইমানেরই অংশ; **তাদের থেকে গায়েবের জ্ঞান অস্বীকার করা** — তাই কোনো গণকবৃত্তি নেই, জ্যোতিষও নেই; **তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া হারাম করা** এবং একে শিরক গণ্য করা; **চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া** এবং অনুমানের আগে ওষুধকে স্থান দেওয়া; **আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে সুরক্ষা** — কোনো মধ্যস্থ ছাড়া, কোনো ফি ছাড়া, কোনো আচার ছাড়া।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সব মিলিয়ে এই পুরো ব্যবস্থাটিই দলিল। এই দ্বীন যদি সেই পরিবেশের কোনো মানুষের বানানো হতো, তবে তার জন্য সবচেয়ে সহজ — এবং সবচেয়ে লাভজনক — কাজ হতো প্রচলিত গণকবৃত্তির ঢেউয়ে চড়ে বসা: নিজের জন্য গায়েবের জ্ঞান দাবি করা, অনুসারীদের জন্য উপার্জনের একটি মধ্যস্থ বানিয়ে দেওয়া, আর অজানার ভয়ের উপর একটি আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব গড়ে তোলা। বহু জাতির ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঠিক এটিই করেছে। কিন্তু যিনি এই দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তিনি করেছেন হুবহু উল্টোটা: **নিজের থেকে গায়েবের জ্ঞান অস্বীকার করেছেন**, **গণকবৃত্তি ও তাবিজ বাতিল করেছেন**, **প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে বিনামূল্যে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন**, আর **রাকির আগে চিকিৎসকের নির্দেশ দিয়েছেন**। যে এমন করে, সে নিজের জন্য কর্তৃত্ব গড়ে না — সে তো তার উপর অর্পিত একটি বার্তা পৌঁছে দেয়।

ষষ্ঠ পর্ব

ভাষার মুজিজা ও খোলা চ্যালেঞ্জ

সবচেয়ে বড় মুজিজা আকাশেও নেই, পৃথিবীতেও নেই — তা রয়েছে স্বয়ং এই কিতাবেই: এমন এক চ্যালেঞ্জ যা চৌদ্দশ বছর ধরে খোলা পড়ে আছে, আর যা গ্রহণ করার সাহস আজ পর্যন্ত কেউ করেনি।

12 প্রমাণ

চ্যালেঞ্জ

146 তিন ধাপে নেমে আসা এক চ্যালেঞ্জ — যা আজও কেউ নেয়নি

আর তোমরা যদি সন্দেহে থাক আমার বান্দার প্রতি আমি যা নাজিল করেছি তা নিয়ে, তবে এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত 23

1. **কুরআনের মতো কিছু দিয়ে** — পুরোটা
2. **দশটি সূরা দিয়ে** — মনগড়া
3. **একটিমাত্র সূরা দিয়ে** — তা ছোট হলেও

আর একটিও আনা হয়নি... চৌদ্দ শতাব্দী ধরে

চ্যালেঞ্জ ধাপে ধাপে নামতে থাকে, যতক্ষণ না তা সম্ভাব্য সর্বনিম্নে পৌঁছায়

সহজ কথায়

কুরআন আরবদের চ্যালেঞ্জ দিল এর অনুরূপ কিছু আনতে। তারা ব্যর্থ হলে সীমা নামিয়ে দেওয়া হল: দশটি সূরা। তাতেও ব্যর্থ হলে আরও নামানো হল: **মাত্র একটি সূরা**, তা তিনটি ছোট আয়াতের হলেও চলবে। আজ পর্যন্ত কেউ তা আনতে পারেনি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবরা ছিল **অবিসংবাদিতভাবে বাগ্মিতার জাতি**। কবিতা ছিল তাদের দলিল ও গর্ব; উকাজ ও জুল-মাজাজে এর জন্য মেলা বসত, আর তাদের শ্রেষ্ঠ কাসিদাগুলোর মর্যাদা এত উঁচু ছিল যে সেগুলোর নামই হয়ে গেল মুআল্লাকাত। তাদের মধ্যে ছিলেন ইমরুল কায়েস, জুহাইর, লাবিদ ও তারাফা। আর এই দাওয়াতকে সহজতম পথে ভেঙে দেওয়ার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল তাদেরই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

চৌদ্দ শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, মানুষ চেষ্টা করেছে, কিছুই টেকেনি। মুসাইলামা কাজ্জাব, ইবনুল মুকাফফা ও অন্যদের নামে যা চালানো হয়েছে তা পড়লে যে কেউ দেখবেন, সেগুলো **প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, উপহাসের বস্তু**। চ্যালেঞ্জ আজও দাঁড়িয়ে আছে, আর আজকের উপকরণ অনেক বড়: ভাষা-একাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয়, ডিজিটাল অভিধান, শৈলী বিশ্লেষণকারী কম্পিউটার। তবু একটি লেখাও আসেনি যা দেখে ভাষার পণ্ডিতরা বলেছেন: এটি এর অনুরূপ।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুটি জিনিস এই চ্যালেঞ্জকে অনন্য করে তোলে। প্রথমত, **ধাপে ধাপে নিচে নামা** — চ্যালেঞ্জকারী সাধারণত যা করে তার ঠিক উল্টো। যে বাড়িয়ে বলে সে সীমা উঁচু করে রাখে, যেন তা নাগালের বাইরে থাকে; আর এটি সীমা নামাতে নামাতে সম্ভাব্য সর্বনিম্নে নিয়ে এল: **একটিমাত্র সূরা, তা কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা হলেও**। দ্বিতীয়ত, এটি **যে কারও সাহায্য নেওয়ার অনুমতি দিল**: "আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদের ডাক" — অর্থাৎ সবাই মিলে এস, যাকে ইচ্ছা ডাক। তারপর আরেক আয়াতে আগেভাগেই ফলাফল ঘোষণা করে দিল: "**যদি না পার — আর কখনোই পারবে না**" — ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন নিশ্চিত ঘোষণা কোনো জুয়াড়ি করার সাহস পায় না।

147

উম্মি হওয়া

এর আগে আপনি কোনো কিতাব পাঠ করেননি

আর এর আগে আপনি কোনো কিতাব পাঠ করতেন না, নিজ ডান হাতে তা লিখতেনও না; তা হলে মিথ্যাশ্রয়ীরা অবশ্যই সন্দেহ করত।

সূরা আল-আনকাবুত — আয়াত 48

তিনি পড়তে-লিখতে জানলে অস্বীকারকারীর দলিল থাকত

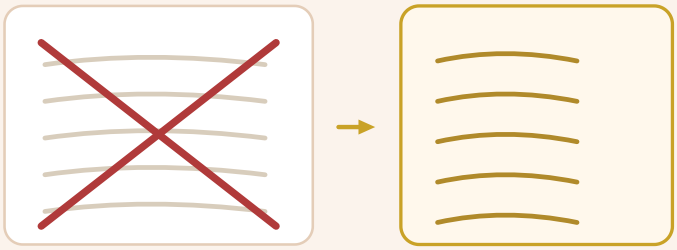

পড়েন না, লেখেন না → **আরবির শ্রেষ্ঠ অলংকারময় কিতাব**

এখানে নিরক্ষরতা কোনো ঘাটতি নয়... বরং তা-ই প্রমাণ

সহজ কথায়

নবী ﷺ **পড়তেও জানতেন না, লিখতেও জানতেন না**, কারও কাছে পড়াশোনাও করেননি। আয়াতটি তা উল্লেখ করে এবং কারণও বলে দেয়: তিনি যদি পড়তে ও লিখতে জানতেন, **তবে মানুষ সন্দেহ করত** এবং বলত, কিতাব থেকে নকল করেছেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মক্কায় লেখার চল ছিল দুর্লভ, নিরক্ষরতাই ছিল স্বাভাবিক। তবু মক্কায় এমন লোক ছিল যারা পড়ত ও লিখত, আর উপদ্বীপে ছিল ইহুদি ও খ্রিস্টান, যাদের কিতাব ও পণ্ডিত দুই-ই ছিল। কাজেই নবী ﷺ যদি পাঠক ও লেখক হতেন, অভিযোগটি হাতের কাছেই তৈরি থাকত এবং তার কোনো জবাব থাকত না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নবী ﷺ-এর উম্মি হওয়া তাঁর জীবনীর সবচেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্যগুলোর একটি; তাঁর সমকালীন বিরোধীরাও এ নিয়ে বিতর্ক করেনি — অথচ দোষ খোঁজায় তারাই ছিল সবচেয়ে আগ্রহী। তারা **এটি ছাড়া আর সব অভিযোগই করেছে**: কবি, জাদুকর, গণক, পাগল — আর বলেছে "এক মানুষই তো তাকে শেখায়"। কুরআন জবাব দিল: "তারা যার প্রতি ইঙ্গিত করছে তার ভাষা তো আরবি নয়, আর এ তো স্পষ্ট আরবি ভাষা।" অর্থাৎ যার দিকে তারা ইঙ্গিত করেছিল, সে আরবিই ভালো জানত না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কুরআন এখানে **তার বিরুদ্ধে যে যুক্তিটি দেওয়া যেত তা নিজেই তুলে ধরে, তারপর তা ভেঙে দেয়**। এই পথ কেবল আত্মবিশ্বাসী বক্তাই নেন। আয়াতটি বলছে: বিস্ময় এই নয় যে কিতাবটি মহান, বরং বিস্ময় এই যে তা এসেছে **এমন একজনের মুখে যিনি পড়তেও জানেন না, লিখতেও জানেন না**। তারপর বিষয়টিকে আরও গুরুতর করে তোলে এই যে, এই গ্রন্থে রয়েছে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর সংবাদ ও সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বিবরণ, উত্তরাধিকার, বিচার ও যুদ্ধ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিধান, এবং তখনও অজানা মহাজাগতিক বিষয়ের বর্ণনা। এ সবই এমন একজনের কাছ থেকে, যিনি এক লাইনও পড়তে পারতেন না। আর এটাই "**তা হলে মিথ্যাশ্রয়ীরা অবশ্যই সন্দেহ করত**" কথাটির অর্থ — তাঁর উম্মি হওয়াই সন্দেহের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

148

স্ববিরোধহীনতা

তেইশ বছর — একটিও স্ববিরোধ ছাড়া

তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে ভাবে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে আসত, তবে তারা এতে বহু অসঙ্গতি পেত।

সূরা আন-নিসা — আয়াত 82

ঘটনার সঙ্গে খণ্ড খণ্ড নাজিল — এক বৈঠকের রচনা নয়

মক্কা — 23 বছর — মদিনা

যুদ্ধে ও শান্তিতে · দারিদ্র্যে ও ঐশ্বর্যে · দুর্বলতায় ও শক্তিতে

আনন্দে, শোকে, হিজরতে, অবরোধে... এক অক্ষরেও স্ববিরোধ নেই

এমন এক কিতাব যা এক বৈঠকে লেখা হয়নি, পর্যালোচনাও হয়নি, সংশোধনও হয়নি

সহজ কথায়

কুরআন নাজিল হয়েছে **তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড আকারে** — ঘটনার প্রয়োজনে এক আয়াত, কয়েক আয়াত; যুদ্ধে ও শান্তিতে, কষ্টে ও স্বাচ্ছন্দ্যে। তবু এতে আপনি কোনো স্ববিরোধ পাবেন না, পদ্ধতির কোনো বদল পাবেন না, আগের কোনো কথা থেকে ফিরে আসাও পাবেন না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বই এক বৈঠকে রচিত হয়, তারপর প্রকাশের আগে পর্যালোচনা ও সংশোধন হয়, ফলে তার অসঙ্গতিগুলো মুছে ফেলা যায়। কুরআন তার বিপরীত: **নাজিল হওয়ামাত্রই** তা মানুষের সামনে পড়া হত; তারা মুখস্থ করত, লিখে রাখত, তারপর যা গত হয়েছে তা বদলানোর আর কোনো পথ থাকত না। আর মক্কায় যা নাজিল হয়েছিল তার সবই হিজরতের বহু বছর আগেই বিরোধীদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আজ যে কেউ নিজেই এটি পরখ করে দেখতে পারেন: বিশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড করে একটি লেখা লিখুন, যাতে থাকবে আকিদা, বিধান, ইতিহাস, নৈতিকতা, মহাবিশ্ব ও আত্মা; তারপর শেষে তা পর্যালোচনা করে দেখুন তাতে কোনো স্ববিরোধ পাওয়া যায় কি না। গবেষকরা — মুসলিম ও অমুসলিম — চৌদ্দ শতাব্দী ধরে কুরআনে স্ববিরোধ খুঁজেছেন; "মুশকিলুল কুরআন" ও "তাবিলু মুখতালিফিল আয়াত" নিয়ে আস্ত আস্ত কিতাব লেখা হয়েছে, আর সবই শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, যা ভিন্ন বলে মনে হয় তা **বৈচিত্র্যের ভিন্নতা, বিরোধের নয়**।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি এখানে কোনো দাবি নয়, **একটি বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগযোগ্য মানদণ্ড** পেশ করছে। বলছে: এটি মানুষের রচনা হলে **তোমরা এতে বহু অসঙ্গতি পেতে**। যুক্তির দিক থেকেও কথাটি ঠিক: বদলে যেতে থাকা পরিস্থিতিতে বিশ বছর ধরে বিস্তৃত কোনো লেখা তার রচয়িতার বদলে যাওয়া অবস্থার ছাপ বহন করবেই। আরও বিস্ময়কর হল, পরিস্থিতি বদলালেও সুর বদলায়নি: ক্ষমা ও দয়ার আয়াত নাজিল হয়েছে **বিজয়ের পরে**, আগে নয়; আর অবিচলতা ও প্রতিশ্রুতির আয়াত নাজিল হয়েছে **পরাজয় ও অবরোধের সময়**। লেখাটি যদি তার রচয়িতার অবস্থার প্রতিফলন হত, তবে উল্টোটাই প্রত্যাশিত ছিল।

149

বিরোধীর সাক্ষ্য

ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরার সাক্ষ্য

আল্লাহর কসম, এর মধ্যে রয়েছে মাধুর্য, এর উপরে রয়েছে সৌন্দর্য; এর নিচের অংশ সুজলা, উপরের অংশ ফলবতী; আর এ কথা কোনো মানুষের কথা নয়।

হাকিম ও বায়হাকি দালাইলে বর্ণনা করেছেন — সিরাতের কিতাবে প্রসিদ্ধ

বলেছিল কুরাইশের সবচেয়ে বিচক্ষণ ও কট্টর শত্রু

"এতে আছে মাধুর্য... আর এর উপরে আছে লাবণ্য"

"এর নিচ পানিতে ভরা, আর এর উপর ফলবান"

"এ কথা কোনো মানুষের কথা নয়"

তারপর ফিরে বলল: "এ তো চলে আসা এক জাদু বৈ কিছু নয়"

তিনি সত্যটি স্বীকার করলেন... তারপর বেছে নিলেন এমন রায় যা নিজ গোত্রকে খুশি করে

সহজ কথায়

ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা ছিলেন কুরাইশের সবচেয়ে বিচক্ষণ ও বাক্য-বিশারদদের একজন, আর ছিলেন এই দাওয়াতের কঠিনতম শত্রুদের একজন। কুরআন শুনে তিনি তার সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা দিলেন এবং বললেন: **"এ কথা কোনো মানুষের কথা নয়।"** এরপর তাঁর গোত্র চাপ দিল, আর তিনি বললেন: "এ তো চিরাচরিত জাদু ছাড়া কিছু নয়।"

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মৌসুমের আগে হাজিদের কাছে মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে কী বলা হবে, কুরাইশ তার একটি শব্দ খুঁজছিল। তাই তারা ওয়ালিদের কাছে জড়ো হল, কারণ তিনিই ছিলেন তাদের সবচেয়ে বিবেচক এবং কবিতা ও বাগ্মিতায় সবচেয়ে জ্ঞানী। তারা তাঁর সামনে রাখল: গণক? পাগল? কবি? জাদুকর? — আর তিনি বাক্যশিল্পের ভেতর থেকেই যুক্তি এনে **প্রতিটিই খারিজ করে দিলেন**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঘটনাটি সিরাত ও তাফসিরের কিতাবে প্রসিদ্ধ, আর তাঁর সম্পর্কে যা নাজিল হয়েছে তা সূরা আল-মুদ্দাসসিরে: "**সে চিন্তা করল ও পরিমাপ করল। ধ্বংস হোক সে, কীভাবে সে পরিমাপ করল। আবার ধ্বংস হোক সে, কীভাবে সে পরিমাপ করল। তারপর সে তাকাল। তারপর ভ্রু কুঁচকাল ও মুখ বিকৃত করল। তারপর পিঠ ফিরাল ও অহংকার করল, আর বলল: এ তো চিরাচরিত জাদু ছাড়া কিছু নয়**।" আয়াতগুলো তার মনের অবস্থা নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে: চিন্তা, তারপর পরিমাপ, তারপর দৃষ্টি, তারপর ভ্রুকুটি, তারপর অহংকারভরে মুখ ফিরানো, তারপর সেই রায় যা দিয়ে সে নিজ গোত্রকে খুশি করল। আর গণকতা ও কবিতা খারিজ করার ক্ষেত্রে তার যুক্তিগুলো বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত আছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

বিরোধীর সাক্ষ্য সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য, বিশেষত যখন সে **যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে সেই বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ**। ওয়ালিদ ছিলেন কবিতার বিচারক, যাঁর সামনে কাসিদা পেশ করা হত। তিনি কুরআন আর বাইরে থেকে তার মতো দেখায় এমন সব কিছুর মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্প-বিভাজন টেনেছেন: কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তো সমস্ত কবিতা জানি... এ কবিতা নয়"; আর গণকতা সম্পর্কে, "এ গণকের গুনগুনানিও নয়, তার ছন্দও নয়"। তারপর এর গড়নের বর্ণনা দিয়েছেন: "**এর নিচের অংশ সুজলা, উপরের অংশ ফলবতী**" — অর্থাৎ বাইরেটা সুন্দর, ভেতরটা অর্থে ভরপুর। এটি কোনো ভক্তের প্রশংসা নয়, এক শত্রু-বিশেষজ্ঞের কারিগরি বর্ণনা। আর **নিজ গোত্রের চাপে** তাঁর কথা থেকে ফিরে আসা — যা কুরআনেই লিপিবদ্ধ — প্রকাশ করে দেয় যে অস্বীকারটি ছিল একটি সামাজিক অবস্থান, বুদ্ধিগত প্রত্যয় নয়।

সূত্র ابن هشام – «السِّيرةُ النَّبويّة» · البيهقي – «دَلائلُ النُّبُوّة»

150

স্বতন্ত্র শ্রেণি

কবিতা নয়, গদ্য নয়, গণকের ছন্দও নয়

আর এ কোনো কবির কথা নয় — তোমরা খুব কমই ঈমান আন। কোনো গণকের কথাও নয় — তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

সূরা আল-হাক্কাহ — আয়াত 41-42

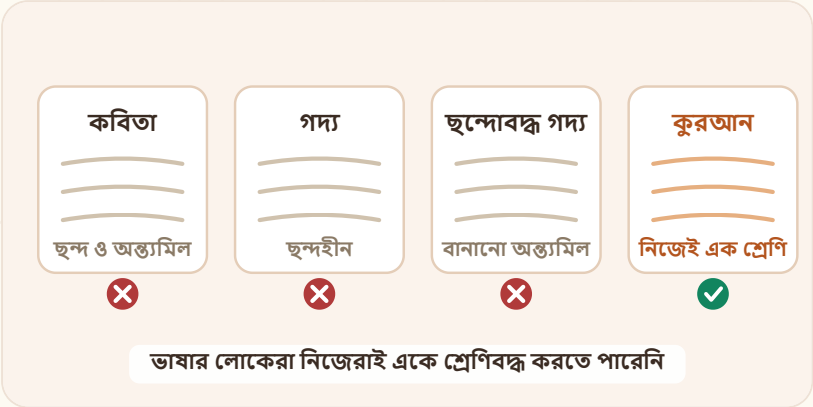

এমন এক লেখা যা আরবির পরিচিত কোনো ছাঁচেই আঁটে না

সহজ কথায়

আরবিতে উঁচু মানের কথার তিনটি রূপ ছিল: ছন্দসহ **কবিতা**, মুক্ত **গদ্য**, আর **গণকদের ছন্দোবদ্ধ বাক্য**। কুরআন এর কোনোটিই নয় — বরং নিজেই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কবিতার ছন্দ, বহর ও অন্ত্যমিলে আরবরা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বিশেষজ্ঞ জাতি; সহজাত বোধেই তারা ভাঙা চরণ ধরে ফেলত। গণকদের ছন্দোবদ্ধ বাক্যও তারা চিনত এবং তার কৃত্রিমতা নিয়ে উপহাস করত। তবু **কুরআন সম্পর্কে তাদের রায় ভীষণভাবে টলমল করেছে**: বলল কবিতা, তারপর জাদু, তারপর গণকতা, তারপর পূর্বপুরুষদের উপকথা — প্রতিটি মতই আগেরটিকে বাতিল করে দিয়েছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কুরআন কবিতা থেকে আলাদা, কারণ তা **কোনো ছন্দ বা নির্দিষ্ট অন্ত্যমিল মেনে চলে না**; গদ্য থেকে আলাদা, কারণ তাতে রয়েছে **ভেতরের একটি তাল ও নিয়মিত ফাসিলা**; আর ছন্দোবদ্ধ বাক্য থেকে আলাদা, কারণ গণকের ছন্দে **ছন্দ রক্ষার জন্য শব্দকে জোর করে বসানো হয়**, অথচ কুরআনে ফাসিলা অর্থকে অনুসরণ করে, অর্থের ওপর শাসন করে না। ফাসিলা আর গণকের ছন্দের এই পার্থক্য আরবি অলংকারশাস্ত্রের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আলোচনা। প্রাচ্যবিদ আরবেরি বলেছেন, কুরআনের বাগ্মিতা ও তাল এতটাই শক্তিশালী ও হৃদয়স্পর্শী যে প্রতিটি অনুবাদই মূলের দীপ্তির এক ম্লান অনুলিপি হয়ে থাকে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

শ্রেণিবিন্যাসে বিরোধীদের এই টলমল অবস্থাই প্রমাণ। কোনো শিল্পের বিশেষজ্ঞরা যখন একটি লেখাকে নিজেদের শিল্পের কোনো শাখাতেই ফেলতে পারেন না, আর এক বৈঠক থেকে আরেক বৈঠকে তাঁদের রায় নিজেই নিজের সঙ্গে বিরোধ বাধায়, তখন সেটিই ইঙ্গিত যে লেখাটি তাঁদের জানা শ্রেণির বাইরে। আর কুরআন তাদের এই টলমল অবস্থাটিই তাদের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ করেছে: "**দেখুন, তারা আপনার জন্য কেমন উপমা দিচ্ছে, ফলে তারা পথ হারিয়েছে**।" এরপর তাদেরই আয়ত্ত করা মানদণ্ডে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে: তরবারি দিয়ে নয়, ধন দিয়ে নয়, বরং **যে শিল্পে তারা পৃথিবীর সব জাতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেই শিল্প দিয়েই**। আর যে কিতাব বানিয়ে আনে, সে বিরোধীদের ঠিক সেই ময়দানেই চ্যালেঞ্জ দেওয়ার জুয়া খেলে না যে ময়দানে তারা শ্রেষ্ঠ।

সূত্র Arberry – *The Koran Interpreted*

151

তিরস্কার

যে কিতাব তার বাহককেই তিরস্কার করে

তিনি ভ্রু কুঁচকালেন ও মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তাঁর কাছে অন্ধ লোকটি এসেছিল। আর আপনি কী জানেন, হয়তো সে পরিশুদ্ধ হত?

সূরা আবাসা — আয়াত 1-3

এমন আয়াত, যাতে নবি ﷺ-কে স্পষ্ট তিরস্কার

"ভ্রুকুটি করে মুখ ফেরালেন" · "আল্লাহ ক্ষমা করুন, কেন অনুমতি দিলেন"

"কোনো নবির জন্য বন্দি রাখা সংগত নয়" · "আর আপনি মনে গোপন রাখছিলেন"

তারপর নামাজে মানুষের সামনে উচ্চস্বরে পড়া হয়

আর মুখস্থ হয়, লেখা হয়, কখনো মোছা হয় না

যে কিতাব বানিয়ে আনে, সে তাতে নিজের নিন্দা রাখে না

সহজ কথায়

কুরআনে এমন আয়াত আছে যা **স্বয়ং নবী ﷺ-কে তিরস্কার করে** এবং তাঁর একটি অবস্থান সংশোধন করে দেয়। এই আয়াতগুলো নামাজে মানুষের সামনে উচ্চস্বরে পড়া হয়, ছোট-বড় সবাই মুখস্থ করে, আর কখনো সেগুলো মুছে ফেলাও হয়নি, হালকাও করা হয়নি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

যে নবুওয়াতের দাবি করে তার দরকার **ত্রুটিহীন একটি পূর্ণ ভাবমূর্তি**, আর তার শত্রুরা যেকোনো স্খলনের জন্য ওত পেতে থাকে। কাজেই এমন এক বাণী নাজিল হওয়া যা তাঁকে তিরস্কার করে ও তাঁর সিদ্ধান্তকে ভুল বলে, তারপর তা মসজিদে সবার সামনে পাঠ করা — এ প্রতিটি রাজনৈতিক ও মানসিক হিসাবের বিরুদ্ধে যায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উদাহরণ অনেক এবং স্পষ্ট: **গোটা সূরা আবাসা** তাঁর তিরস্কারে, যখন তিনি এক অন্ধ লোকের কাছ থেকে কুরাইশ-নেতাদের দিকে ফিরেছিলেন; তাবুক থেকে পিছিয়ে থাকাদের অনুমতি দেওয়ার প্রসঙ্গে "**আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অনুমতি দিলেন?**"; বদরের বন্দিদের প্রসঙ্গে "**কোনো নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে তার কাছে বন্দি থাকবে, যতক্ষণ না সে জমিনে যুদ্ধে প্রবল হয়**"; "**আর আপনি নিজের মনে তা গোপন করছিলেন যা আল্লাহ প্রকাশ করতে যাচ্ছেন, আর আপনি মানুষকে ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহই অধিক হকদার যে আপনি তাঁকে ভয় করবেন**"; আর "**আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি কেন হারাম করছেন?**" আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন: নবী ﷺ যদি ওহির কিছু গোপন করতেন, তবে এই আয়াতটিই গোপন করতেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি এই অধ্যায়ের সবচেয়ে শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিগুলোর একটি, যাকে ঐতিহাসিকরা বলেন **"বিব্রতকরতার মানদণ্ড"**: যে বাণী তার বাহকের স্বার্থের ক্ষতি করে, তা সত্যের বেশি কাছাকাছি। আর লক্ষ করুন, তিরস্কার কোনো গৌণ বিষয়ে আসেনি, এসেছে **বড় বড় রাজনৈতিক ও সামরিক সিদ্ধান্তে**: বন্দিদের সঙ্গে আচরণ, মুনাফিকদের অনুমতি দেওয়া, এবং তাঁর নিজ ঘরের একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। এর সঙ্গে আরেকটি বিষয় যোগ করুন: কুরআন **কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, কিছুর দেয়নি**; বরং ইফকের ঘটনায় নবী ﷺ-এর কাছে ওহি পুরো এক মাস আসেনি, অথচ তখন তাঁর স্ত্রীই অভিযুক্ত, আর মানুষ যা বলার বলে যাচ্ছে। বিষয়টি যদি তাঁর নিজের হাতে থাকত, তবে তা একদিনও দেরি হত না।

শৈলীর পার্থক্য

152 তাঁর নিজের কথা ﷺ কখনোই কুরআনের মতো নয়

আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো কেবল ওহি, যা পাঠানো হয়।

সূরা আন-নাজম — আয়াত 3-4

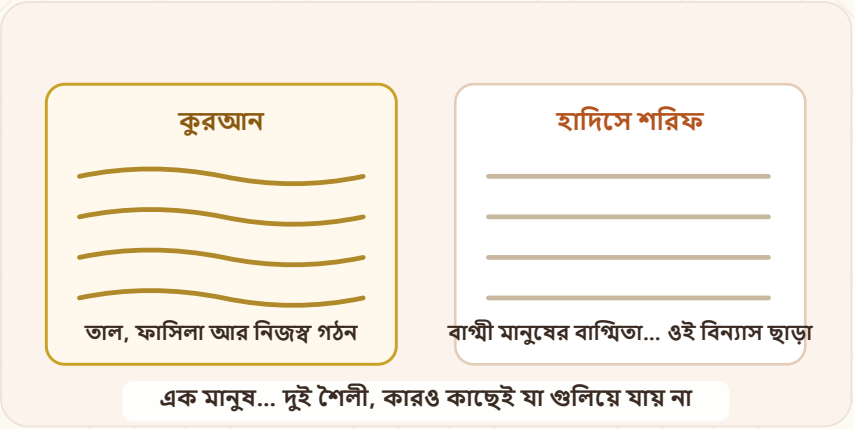

শৈলী-বিশ্লেষণ বিনা কষ্টেই দুটির মধ্যে পার্থক্য করে দেয়

সহজ কথায়

নবী ﷺ ছিলেন আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বাকপটু, আর তাঁর হাদিসগুলো বাগ্মিতার চূড়ায়। তবু **তাঁর কথা কারও কাছে কখনো কুরআনের সঙ্গে গুলিয়ে যায়নি** — দুটি শৈলী স্পষ্টভাবেই আলাদা, আর একটিবারও কোনো হাদিসকে ভুল করে কুরআন বলে চালানো হয়নি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কুরআন যদি তাঁরই ﷺ রচনা হত, তবে তাঁর সমস্ত কথায় একটিই শৈলী থাকত — কারণ মানুষ এমন এক শৈলীগত ছাপ বহন করে যা থেকে সে মুক্ত হতে পারে না, বিশেষত বিশ বছরের ব্যাপ্তিতে। আর তাঁর সাহাবিরা প্রতিদিনই দুটোই শুনতেন, অথচ একটি মুহূর্তের জন্যও দুটি তাঁদের কাছে মিলেমিশে যায়নি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

শৈলী-পরিমাপ (Stylometry) আজ একটি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা, যা শব্দের বিন্যাস, বাক্যের দৈর্ঘ্য ও গঠনের ধরন মেপে লেখাকে তার রচয়িতার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। কুরআন ও হাদিসের ওপর তা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং দুটির পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গঠনের সবচেয়ে স্পষ্ট পার্থক্য: কুরআন দাঁড়িয়ে আছে **নিয়মিত ফাসিলার** ওপর, সম্বোধনের পালাবদল ও সর্বনামের চলাচলের ওপর; হাদিস এই গড়নে চলে না। তারপর কুরআন **স্বয়ং নবী ﷺ-কেই আদেশ, নিষেধ ও তিরস্কারের ভঙ্গিতে সম্বোধন করে** এবং তাঁকে "বলুন" বলতে নির্দেশ দেয় — তিনশোরও বেশি বার।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এর সঙ্গে তৃতীয় একটি শ্রেণি যোগ করুন: **হাদিসে কুদসি** — যা নবী ﷺ তাঁর রবের কাছ থেকে অর্থের দিক দিয়ে বর্ণনা করেন, তবু তা **কুরআন গণ্য হয় না এবং নামাজে পড়া হয় না**। অর্থাৎ একজন মানুষের মুখে উচ্চারিত তিনটি স্তরের কথা আমাদের সামনে আছে, আর বিধান ও আচরণে সেগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য করা হয়: কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত হয়, চ্যালেঞ্জ তাকে নিয়েই, আর তা বর্ণিত হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে মুতাওয়াতির সূত্রে; হাদিসে কুদসির অর্থ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত, আর বর্ণনা হয় নবী ﷺ-এর নিজ ভাষায়; আর নববি হাদিস তাঁরই কথা। এই **সূক্ষ্ম ত্রিমুখী পার্থক্য** প্রথম দিন থেকেই দাঁড়িয়ে আছে এবং কখনো ঝাপসা হয়নি। সবটাই যদি একই মানবিক উৎস থেকে আসত, তবে বিশ বছর ধরে এই বিভাজন ধরে রাখা সম্ভব হত না।

সূত্র Burrows (2002) – *"Delta": a Measure of Stylistic Difference* · Stylometry

153

সংক্ষিপ্ততা

আর কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন

আর হে বুদ্ধিমানগণ, কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত 179

আরবের বলা শ্রেষ্ঠতম কথা

"হত্যাই হত্যা বেশি ঠেকায়"

14 অক্ষর

→

আর কুরআন বলল

"কিসাসে তোমাদের জীবন"

অক্ষরে কম... অর্থে অনেক বেশি

তাতে জীবন আছে, শুধু হত্যার নিষেধ নয় · লক্ষ্য বলা হয়েছে, উপায় নয়
আর তা বাঁধল ন্যায্য কিসাসে, খোলা হত্যায় নয়

অলংকারশাস্ত্রের পণ্ডিতদের পড়া শত শত উদাহরণের একটি

সহজ কথায়

এই অর্থে আরবরা যে কথাটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি গর্ব করত তা হল: **"হত্যাই হত্যাকে সবচেয়ে বেশি ঠেকায়।"** তারপর কুরআন এল **কম অক্ষরে অনেক বেশি অর্থ** ভরা একটি বাক্য নিয়ে: "আর কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন।"

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

"হত্যাই হত্যাকে সবচেয়ে বেশি ঠেকায়" আরবদের কাছে সংক্ষিপ্ততার শিখর বলে গণ্য হত এবং প্রবাদ হিসেবে উদ্ধৃত হত। বড় বড় অর্থকে অল্প কথায় গুছিয়ে আনতে তারা প্রতিযোগিতা করত এবং সেটিকেই ভাষার শ্রেষ্ঠ স্তর মনে করত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

অলংকারশাস্ত্রের পণ্ডিতরা দুটির পার্থক্য বিশ্লেষণ করে সাতটিরও বেশি দিক পেয়েছেন। সবচেয়ে স্পষ্টগুলোর মধ্যে: কুরআন উল্লেখ করেছে **জীবন**, যা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, আর প্রবাদটি উল্লেখ করেছে হত্যা, যা অপছন্দনীয়; কুরআন তাকে **"কিসাস"** দিয়ে নির্দিষ্ট করেছে, অর্থাৎ ন্যায়সংগত ও বৈধ হত্যা, আর প্রবাদটি হত্যাকে অনির্দিষ্ট রেখেছে, ফলে তাতে অন্যায়ও ঢুকে পড়েছে; কুরআন প্রমাণ করেছে **গোটা সমাজের জন্য চলমান এক জীবন**, কেবল একটি ঘটনার নিষেধ নয়; কুরআন "হত্যা" শব্দটি দুবার বলা এড়িয়ে গেছে; আর শেষ করেছে নৈতিক লক্ষ্যে: "যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"। এ সবই কম অক্ষরে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে গুরুত্বপূর্ণ কেবল এই একটি উদাহরণ নয়, বরং **এটি যে কোনো ব্যতিক্রম নয়** সেটিই। আরবি অলংকারশাস্ত্রের গোটা বিদ্যা — মাআনি, বায়ান ও বাদি — মূলত এই লেখাটির অনতিক্রম্যতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা থেকেই জন্ম নিয়েছে, আর তাতে শত শত কিতাব রচিত হয়েছে: বাকিল্লানির "ইজাজুল কুরআন" থেকে আবদুল কাহির জুরজানির "দালাইলুল ইজাজ" ও "আসরারুল বালাগা" পর্যন্ত। অর্থাৎ **একটিমাত্র কিতাব বিশ্লেষণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক বিদ্যা দাঁড়িয়ে গেছে** — পৃথিবীর কোনো ভাষার ইতিহাসে এর দ্বিতীয় নজির নেই। আর গবেষকরা আজও তা থেকে এমন কিছু বের করে আনছেন যা তাঁদের পূর্বসূরিরা বের করতে পারেননি।

সূত্র «الباقلاني – «إعجاز القرآن» · عبد القاهر الجرجاني – «دلائل الإعجاز»

154

জাওয়ামিউল কালিম

আমাকে দেওয়া হয়েছে জাওয়ামিউল কালিম

আমাকে জাওয়ামিউল কালিম দিয়ে পাঠানো হয়েছে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

- **“দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা”**
- **“ক্ষতি নয়, ক্ষতির বদলাও নয়”**
- **“কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল”**
- **“মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ”**

গোনা কয়েকটি শব্দ… তার ওপর ফিকহের আস্ত অধ্যায়

সার্বিক কিছু নীতি, যা হাজার হাজার মাসআলাকে সাজিয়ে দেয়

সহজ কথায়

নবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি ছিল, তিনি বলতেন **অল্প কথা, যা বহু অর্থ বহন করে** — এটিই জাওয়ামিউল কালিম। কয়েকটি শব্দের হাদিসের ওপর ফিকহ ও আইনের আস্ত আস্ত অধ্যায় গড়ে উঠেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সংক্ষিপ্ত প্রজ্ঞাবাণী সব জাতির মধ্যেই পরিচিত: আরবদের প্রবাদ, ভারতের নীতিবচন, গ্রিকদের উপদেশ। কিন্তু সেগুলো **সাধারণ নৈতিক উপদেশ**, এমন নীতি নয় যার ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ আইনব্যবস্থা দাঁড় করানো যায়। আর প্রজ্ঞাবাণী ও ফিকহি নীতির মধ্যে পার্থক্যটি মৌলিক।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

একটি উদাহরণ নিন: “**ক্ষতি করা যাবে না, ক্ষতির বদলে ক্ষতিও নয়**” — আরবিতে চারটি শব্দ। এর ওপর ইসলামি ফিকহের একটি পূর্ণ অধ্যায় গড়ে উঠেছে, যার আওতায় এসেছে প্রতিবেশীর অধিকার, নির্মাণ, তালাক, বেচাকেনা, শুফআ, জবরদখল, মালিকানা এবং মালিকের অধিকারের সীমা। এটি সেই **পাঁচটি বড় নীতির** একটিতে পরিণত হয়েছে যেগুলোর ওপর সব ফিকহি মাজহাব ঘোরে। এমনই আরেকটি হল “কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল”, যাকে ইমামগণ জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ গণ্য করেছেন, আর ইমাম শাফিয়ি বলেছেন এটি ফিকহের সত্তরটি অধ্যায়ে প্রবেশ করে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এমন একটি সার্বিক নীতি গড়ে তোলা, যা একই সঙ্গে সবটুকু ধারণ করে ও বাইরের সবকিছু বাদ দেয় — দীর্ঘ কোনো লেখা লেখার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। নীতিটিকে তার আওতায় পড়া সবকিছু ধারণ করতে হবে, আওতার বাইরের সবকিছু বাদ দিতে হবে, আর রচয়িতার মাথায় কখনো আসেনি এমন পরিস্থিতির সামনেও টিকে থাকতে হবে। আইনপ্রণেতারা আজ এই কাজটিই করেন, ফলে তাঁদের আইন খণ্ডে খণ্ডে বের হয় আর প্রতি বছর সংশোধিত হয়। অথচ চার শব্দের একটি বাক্য চৌদ্দ শতাব্দী টিকে থাকবে এবং এমন সব ঘটনাও ধারণ করবে যেগুলোর অস্তিত্বই তখন ছিল না — শিল্প-দূষণ, ডিজিটাল ক্ষতি — এ এমন এক বিষয় যার সামনে থামা উচিত। আর লক্ষ করুন, হাদিসটি নিজেই এটিকে অর্জনের নয়, দানের দিকে সম্পৃক্ত করছে: “**আমাকে পাঠানো হয়েছে** জাওয়ামিউল কালিম দিয়ে।”

সূত্র ابن رجب – «جامعُ العُلوم والحِكَم» · السيوطي – «الأشباهُ والنَّظائر»

হিফজ

155 লক্ষ লক্ষ বুকে ধরে রাখা এক কিতাব

> বরং তা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের বুকের ভেতরে।
>
> **সূরা আল-আনকাবুত — আয়াত 49**

মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মুখস্থ করা কিতাব

প্রতি মহাদেশে প্রতি প্রজন্মে লক্ষ লক্ষ হাফেজ

প্রতিটি বুকে একটি জীবন্ত অনুলিপি — পোড়ানোও যায় না, বদলানোও যায় না

সহজ কথায়

কুরআন কেবল কিতাবে সংরক্ষিত হয়নি — হয়েছে **মানুষের বুকে**। চৌদ্দ শতাব্দী ধরে প্রতিটি প্রজন্মে লক্ষ লক্ষ মানুষ তা মুখস্থ করে আসছে, যাদের মধ্যে আছে এমন শিশুরাও যারা আরবি ভাষাই বলে না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীন কিতাবগুলো হাতেগোনা কয়েকটি অনুলিপিতে পুরোহিত ও পণ্ডিতদের কাছে রক্ষিত থাকত। গ্রন্থাগার পুড়ে গেলে বা অনুলিপি হারিয়ে গেলে কিতাবটিই হারিয়ে যেত — বহু কিতাবের বেলায় তা-ই ঘটেছে, যেগুলোর কেবল নামটুকুই আজ জানা যায়। আর নিরক্ষরতা ছিল যেকোনো লেখার বিস্তারের পথে বাধা।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আজ কুরআনের হাফেজের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ বলে ধরা হয় — ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, তুরস্ক, পাকিস্তান, আরব দেশগুলো, ইউরোপ ও আমেরিকায়। তাঁদের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হয়, যেখানে তাঁরা হরকত ও তাজবিদসহ অক্ষরে অক্ষরে তিলাওয়াতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আর **তাঁদের অধিকাংশই অনারব** — অর্থাৎ তাঁরা এমন এক ভাষার লেখা মুখস্থ করেন যা তাঁদের মাতৃভাষা নয়। মানব-ইতিহাসে আর কোনো কিতাব এত বিপুল সংখ্যায় ও এমন নিখুঁতভাবে মুখস্থ হয়েছে বলে জানা যায় না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

বিকৃতির অসম্ভবতার ওপর এর প্রভাবই হল তাৎপর্যের জায়গা। কেবল কিতাবে সংরক্ষিত কোনো লেখা অনুলিপিগুলোর ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে বদলে ফেলা যায়। কিন্তু যে লেখা দূর দূর মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখস্থ, যাদের এক করে রাখে না কোনো কর্তৃপক্ষ, না কোনো ভাষা, না কোনো রাষ্ট্র, আর যা প্রতিদিন পাঁচ বার নামাজে পড়া হয় — তার একটি অক্ষর বদলানো **বাস্তবে অসম্ভব**, কারণ প্রথম জামাতের নামাজেই তা ধরা পড়ে যাবে। আয়াতটি ঠিক এদিকেই সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করছে: "সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ **বুকের ভেতরে**" — "পাতায়" নয়। আর এটিই "আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক" কথাটির বাস্তব রূপায়ণ, এমন এক মানবিক প্রক্রিয়ায় যা পর্যবেক্ষণ ও গণনা করা যায়।

আয়াতের সমাপ্তি

156 প্রতিটি আয়াত শেষ হয় তার উপযুক্ত কথা দিয়ে

আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ◌ আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ◌ আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ

কুরআনের নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা সমাপ্তি-বাক্য

সমাপ্তি-বাক্য বদলে দিলে অর্থ ভেঙে যায়

শাস্তি ও ক্ষমতার প্রসঙ্গ
"পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" ✓

তাওবা ও ক্ষমার প্রসঙ্গ
"ক্ষমাশীল, দয়ালু" ✓

দোয়া ও অভিযোগের প্রসঙ্গ
"সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" ✓

ছয় হাজারের বেশি আয়াত... প্রতিটি সমাপ্তি নিজ জায়গায়

আয়াতের বিষয়বস্তু আর যে নামে তা শেষ হয়, এ দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম সঙ্গতি

সহজ কথায়

কুরআনের অধিকাংশ আয়াত শেষ হয় আল্লাহর আসমাউল হুসনার দুটি নাম দিয়ে। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো, **প্রতিটি সমাপ্তি তার আয়াতের বিষয়ের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানায়** — একটি সমাপ্তি বদলে অন্যটি বসিয়ে দিলে আপনি সঙ্গে সঙ্গেই টের পাবেন, কিছু একটা বেঠিক হয়ে গেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবি কবিতা একটি কাসিদায় একই অন্ত্যমিল ধরে রাখে, আর প্রায়ই **সেই অন্ত্যমিলের খাতিরে শব্দকে টেনে আনা হয়**, এমনকি অপ্রয়োজনীয় শব্দ দিয়ে চরণ ভরাট করা হয়। সমালোচকেরা একে দোষ বলেই জানেন। আর গণকদের ছন্দোবদ্ধ গদ্য ছিল আরও বেশি কৃত্রিম। কাজেই ছন্দময় সমাপ্তিওয়ালা যেকোনো লেখায় এমন কৃত্রিমতা আশা করাই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কুরআনে ঠিক এর উল্টোটা: **সমাপ্তি-বাক্য অর্থের অনুগামী, অর্থের শাসক নয়**। শাস্তি ও প্রতিশোধের আয়াত শেষ হয় "পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী" দিয়ে; তাওবার আয়াত "ক্ষমাশীল, দয়ালু" দিয়ে; আর দোয়ার আয়াত "সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" দিয়ে — কারণ যে দোয়া করে, তার প্রয়োজন হলো তার কথা শোনা হোক আর তার অবস্থা জানা হোক। এই সূক্ষ্মতার সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ: চুরির আয়াত শেষ হয় "**পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়**" দিয়ে — শাস্তি কার্যকর করায় পরাক্রম আর তা বিধিবদ্ধ করায় প্রজ্ঞা; আর এর পরেই তাওবার আয়াত এলে তা শেষ হয় "**ক্ষমাশীল, দয়ালু**" দিয়ে। এ বিষয়ে "ইলমুল ফাওয়াসিল" নামে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থই রচিত হয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

নিজেই একবার পরখ করে দেখুন: যেকোনো ভাষার যেকোনো দীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ লেখা নিন, আর যাচাই করুন প্রতিটি অন্ত্যমিল তার বাক্যের বিষয়ের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানায় কি না। আপনি নিশ্চিতভাবেই এমন জায়গা পাবেন যা ছন্দ বা মিলের খাতিরে ভরাট করা — মানুষের কাজে এটাই স্বাভাবিক। অথচ কুরআনে ছয় হাজারেরও বেশি আয়াত, যার অধিকাংশই এমন সমাপ্তি-বাক্যে শেষ, আর তা নেমেছে **তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড হয়ে** — কোনো খসড়া নেই, কোনো সংশোধন নেই। এত বিপুল সংখ্যায়, আর অবতরণের এই ধরনে, এই সঙ্গতি অটুট থাকা ভাষাগত দক্ষতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না — সে দক্ষতা যত বড়ই হোক।

সূত্র «الزركشي – «البُرهانُ في عُلوم القرآن» · فخر الدين الرازي – «مَفاتيحُ الغَيب»

157

বইয়ের সমাপ্তি

আর এখন — এই সবকিছু নিয়ে আপনি কী করবেন?

আমি অচিরেই তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে আপনার রব সব কিছুর সাক্ষী?

সূরা ফুসসিলাত — আয়াত 53

15	16	22	24	18
আকাশ	পৃথিবী	জীবন	ইতিহাস	গায়েব

অনেক স্বতন্ত্র সুতো... সবই একই দিকে ইশারা করে

কাকতালীয়ভাবে এক হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য

আপনাকে একটিমাত্র প্রমাণ মেনে নিতে বলা হচ্ছে না... বলা হচ্ছে সবগুলো একসঙ্গে দেখতে

সহজ কথায়

আপনি বইয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। যে প্রমাণগুলো আপনার সামনে দিয়ে গেল, তার প্রতিটি নিয়ে আলাদাভাবে তর্ক করা যায়। কিন্তু আসল প্রশ্নটি হলো: **এগুলো সব একজন মানুষের মধ্যে কাকতালীয়ভাবে একত্র হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?**

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ইতিহাসের প্রতিটি জাতির কাছেই এমন কিছু ছিল, যাকে সে মহান বলে মানত। কিন্তু যে প্রশ্নটি তাদের আলাদা করে দেয় তা হলো: তাদের কাছে কি এমন কিছু ছিল **যা যাচাই করা যায় ও মিথ্যা প্রমাণ করা যায়**? উপকথা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া কোনো ভবিষ্যদ্বাণী দেয় না, নিজের যুগের জ্ঞানের বিরুদ্ধে যাওয়া কোনো মহাজাগতিক বর্ণনা দেয় না, আর চৌদ্দ শতাব্দী ধরে টিকে থাকা কোনো খোলা চ্যালেঞ্জও দেয় না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আপনি এখানে যা পড়লেন তা পাঁচটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সূত্র, একটি আরেকটির উপর নির্ভর করে না: **একটি মহাজাগতিক বর্ণনা**, যা নিজ যুগের জ্ঞানের বিরোধী ছিল আর শতাব্দী পরে বিজ্ঞান যাকে সত্য বলেছে; **প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য**, যা অস্বীকৃত হওয়ার পর মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে; **সময়সীমা-নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী**, যা বলা মতোই ঘটেছে; **খোদ প্রতিপক্ষের কিতাবের ভেতরের বক্তব্য**, যা এখনো তাদেরই হাতে আছে; আর **একটি খোলা ভাষাগত চ্যালেঞ্জ**, যা আজও কেউ গ্রহণ করেনি। একটি সূত্র ভেঙে পড়লেও বাকি চারটি দাঁড়িয়েই থাকবে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানকার যুক্তি হলো **স্বাধীন প্রমাণের সঞ্চয়ের** যুক্তি, আর আদালতে ও বিজ্ঞানে দুই জায়গাতেই এটিই কাজে লাগানো হয়। একটি প্রমাণ সম্ভাবনা হতে পারে, দুটি প্রমাণ কাকতালীয় হতে পারে; কিন্তু পরস্পর সম্পর্কহীন নানা ক্ষেত্র থেকে আসা — জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, চিকিৎসা, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও ভাষা — কয়েক ডজন প্রমাণ যখন সবাই এক দিকেই ইঙ্গিত করে, তখন তা আর কাকতালীয়তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আর কুরআন আপনার কাছে অন্ধ আনুগত্য চায় না; সাতশোরও বেশি জায়গায় সে আপনাকে দেখতে ও ভাবতে ডাকে: "তারা কি দেখে না?", "তারা কি চিন্তা করে না?", "তারা কি বোঝে না?", "বলুন, তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো।" আর যা সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা আপনার সামনে রেখেই দিয়েছে: **"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে।"** আর আপনি দেখেছেন। বাকিটা কেবল আপনার উপরেই ছাড়া।

সমাপ্তি

আপনি পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। আর শেষবেলায় বলার মতো সবচেয়ে বড় কথাটি হয়তো সেটিই যা বলা হয় না: এই বই আপনাকে কোনো কিছুতে বাধ্য করতে চায় না, বরং যা নিয়ে ভাবা উচিত কেবল তা-ই আপনার সামনে রাখতে চায়।

আপনি যদি এগিয়ে যেতে চান, তবে তিনটি পরামর্শ

- **আপনার ঈমান একটিমাত্র প্রমাণের ওপর দাঁড় করাবেন না।** যেকোনো একটি প্রমাণ নিয়ে আলাদাভাবে তর্ক করা যায় ও তাকে দুর্বল করা যায়। শক্তি রয়েছে **সবগুলোর সমষ্টিতে**, আলাদা আলাদা অংশে নয় — অনেক সুতো পাকিয়ে বানানো দড়ির মতো: প্রতিটি সুতো একা ছিঁড়ে যায়, আর সব মিলে পাহাড় ধরে রাখে।
- **আর বিজ্ঞানকে ওহির বিচারক বানাবেন না।** বিজ্ঞান বদলায় ও তার তত্ত্বগুলো ভেঙে পড়ে, আর এ তার সম্মান, দোষ নয়। নির্ণায়ক কোনো পাঠ যদি প্রতিষ্ঠিত কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে মিলে যায়, তবে তা উল্লেখযোগ্য এক সাক্ষ্য; আর না মিললে দেখুন: এটি কি প্রমাণিত সত্য, নাকি পুনর্বিবেচনাধীন কোনো তত্ত্ব? আর এটি কি নির্ণায়ক অর্থের পাঠ, নাকি সম্ভাবনাময় আমাদেরই নিজস্ব বোঝাপড়া?
- **আর স্বয়ং কুরআন পড়ুন।** এই বইয়ের সবকিছুই মূল উৎসের দিকে ইঙ্গিত মাত্র। যে ওষুধের প্রভাব জানতে চায় তার সেটি পান করা চাই, কেবল গায়ের নির্দেশিকা পড়ে সন্তুষ্ট হওয়া নয়।

“বলুন: আমি আপনাদের কেবল একটি বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি — আপনারা আল্লাহর জন্য দাঁড়ান, দুজন দুজন করে আর একা একা, তারপর চিন্তা করুন।”

আর আমাদের শেষ কথা এই যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক; আর আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মদের ওপর, তাঁর পরিবার ও তাঁর সব সাহাবির ওপর।

এই বর্ণনাগুলো কোথা থেকে এলো?

এই বইয়ের প্রতিটি পাঠ তার নিজের পৃষ্ঠাতেই তার উৎসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আর এটি সেসব মূল উৎসের সারসংক্ষেপ যেগুলোর ওপর নির্ভর করা হয়েছে, যাতে পাঠক নিজেই তা যাচাই করে নিতে পারেন।

প্রথমত: শরিয়তের পাঠসমূহ

- **কুরআন মাজিদ** — প্রতিটি জায়গায় সূরার নাম ও আয়াতের নম্বর উল্লেখ করে।
- **সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম** — আল্লাহর কিতাবের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ দুটি গ্রন্থ, আর এই বইয়ের অধিকাংশ হাদিসই এ দুটি থেকে নেওয়া, কিংবা দুটিতেই একসঙ্গে বর্ণিত।
- **সুনান ও মুসনাদ সংকলনসমূহ** — আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, মুয়াত্তা মালিক ও সহিহ ইবনে হিব্বান — সঙ্গে প্রতিটি হাদিসের মান হাদিসবিশারদগণ যেমন নির্ধারণ করেছেন ঠিক তেমনই উল্লেখ করে।

দ্বিতীয়ত: প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ব

- **জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান** — মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, স্পন্দনশীল নক্ষত্র (পালসার), মহাজাগতিক জাল, কৃষ্ণগহ্বর, আর মহাবিশ্বের ধ্রুবকগুলোর সূক্ষ্ম সমন্বয়।
- **ভূতত্ত্ব ও সমুদ্রবিজ্ঞান** — টেকটনিক পাত, পর্বতের শিকড়, মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরা, উষ্ণ জলীয় ছিদ্রমুখ, অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ, আর পানিতে আলোর শোষণ।
- **চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ভ্রূণবিদ্যা** — স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ্যে যেভাবে এসেছে সেভাবে ভ্রূণ গঠনের স্তরসমূহ, প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের কাজ, ত্বকের ব্যথার গ্রাহক, আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ।
- **প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস** — কায়রো জাদুঘরের রাজকীয় মমি, প্রাচীন মিসরের শিলালিপি, মাদাইন সালিহ, শিসর (উবার) প্রত্নস্থল, মারিব বাঁধ, নাজরানের হিমইয়ারি শিলালিপি, আর বার্মিংহাম পাণ্ডুলিপি।

তৃতীয়ত: আহলে কিতাবের গ্রন্থসমূহ

এই বইয়ে তাওরাত ও ইনজিলের যেসব পাঠ এসেছে, সেগুলো **স্বীকৃত আরবি অনুবাদ (ভ্যান ডাইক)** থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সঙ্গে পুস্তক, অধ্যায় ও আয়াতের নম্বর উল্লেখ করে, আর যেখানে তার প্রয়োজন ছিল সেখানে হিব্রু বা গ্রিক মূল পাঠের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠক নিজেই সেগুলো যাচাই করে নিতে পারেন।